বাঙলায়ন

সভ্যতার জন্ম

উইল ডুরান্ট

সভ্যতার জন্ম

সভ্যতার স্বভাব ও ভিত্তি প্রসঙ্গে ভূমিকা

উইল ডুরান্ট

ভাষান্তর : কিউ. এন. জামান
ভূমিকা : জাভেদ হুসেন

বাঙলায়ন

ISBN 984 70085 33

প্রকাশক অস্ট্রিক আর্যু, বাঙলায়ন
৬৯ প্যারিদাস রোড বাঙলাবাজার ঢাকা
মুদ্রণ শফিক মনজু, টোটেম একাডেমী
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৯। ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

Introduction to Story of Civilization :
Our Oriental Heritage by Will Durrant
Translated by Q. N. Zaman
Published by Austrik Aarzu BANGLAYAN
69 Pyaridas Road, Banglabazar Dhaka 1100
Printed by Shafik Monzu of Totem Academy
Contact : cell. 01197143570, 01815001752
e-mail : banglayan@gmail.com

মূল্য : ২০০ টাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সভ্যতার উপকরণ ৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : সভ্যতার অর্থনৈতিক উপাদান ১২
তৃতীয় অধ্যায় : সভ্যতার রাজনৈতিক উপাদান ২৮
চতুর্থ অধ্যায় : সভ্যতার মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান ৪৩
পঞ্চম অধ্যায় : সভ্যতার মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান ৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায় : সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক সূচনা ৯৬

বাংলা পাঠের অবতরণিকা

মানুষ নিজেরই সৃষ্টির দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মিশরীয়রা জানেনা কেন পিরামিড তৈরী করেছিল তারা। কি লিখেছিল আবু সিম্বেলের মন্দিরের গায়ে যা আজ তারা নিজেরাই পড়তে পারে না? কীভাবে এই বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয়? কেমন করে নিজেরই ইতিহাস নিজের কাছে অচেনা হয়ে যায়, কেন সে কখনো বা নিজেরই অতীত অস্বীকার করতে চায়?

এমন ব্যাপার শুধু পিরামিড বা শালবন বিহারের ক্ষেত্রে ঘটে, তা নয়। ধরা যাক সমাজের কথা। এই সমাজ কেমন করে তৈরী হল? কে বানালো আইন, রাষ্ট্র, প্রথা? এগুলো যদি মানুষেরই তৈরী হয় তাহলে মানুষ কেন নিজেরই সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে, কেমন করে এমন হয়?

প্রশ্নগুলো এমন সব বিষয় নিয়ে যেগুলো মানুষ চোখ মেলেই তার চার পাশে বহাল অবস্থায় পায়। ফলে আলো-হাওয়ার মতই এসব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এগুলো নিয়ে যে প্রশ্ন চলতে পারে তাই মাথায় আসেনা। এই প্রশ্ন উইল ডুরান্টের মাথায় এসেছিলো। তিনি বলেছিলেন যা নিয়ে প্রশ্ন করার কথা মাথায় আসেনা, সেই রকম প্রশ্ন দিয়েই দর্শন শুরু হয়।

দর্শন কেন? ডুরান্টকে কখনো ইতিহাসবিদ, কখনো দার্শনিক বলা হয়। তবে কম লোকই জানে যে তিনি এই দুইয়ের মাঝে কোন তফাৎ করতেন না। গৎবাধা দর্শন বিষয়ে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছিলেন। তারপর এই ডিগ্রী তিনি তালাক দিয়ে দেন। কারন এই দর্শন চর্চা বাস্তব দুনিয়ার কোন খবর রাখে না, তাঁর মতে জীবনের মূল প্রশ্ন হল-মানুষের স্বভাব বোঝা, দুর্গতি কমিয়ে জীবনের আনন্দ বাড়ানো। আর এই লক্ষ্যে ইতিহাস হল "উদাহরণ দিয়ে দর্শন শেখানো।" এই কাজে সে চোখ বুজে ভবিষ্যৎ খোঁজে না, বাস্তব, হয়তো বা নির্মম বাস্তব হতে পথ খোজে। আর সেই জন্যই আমরা যা করি, কেন অন্য কিছু না করে তেমনি করি—এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার। আর এই হচ্ছে সভ্যতার জন্ম বৃত্তান্ত পাঠের প্রবেশিকা।

অতীত কি মৃত? না, অতীতে যা কিছু যেখানেই ঘটেছে আজকের এই মুহূর্ত সেই সবের প্রভাব এড়াতে পারে না। বর্তমান আসলে ঠিক এই সময়ে চলমান অতীত। আমি আমারই অতীত, আমার চেহারা আমার আত্ম-জীবনী। আমি যেমন ছিলাম, তেমন ছিলাম বলেই এখন এমন আছি। সেই থাকা, ব্যক্তি 'আমি' কে ছাড়িয়ে যত দূর সম্ভব অতীতে যায়। আমার চারপাশের যা কিছু আমাতে প্রভাব

রেখেছে, যত মানুষের সঙ্গে এখন পর্যন্ত আমার দেখা হয়েছে, যত বই আমি পড়েছি, যত গান শুনেছি, বন্ধুদের সঙ্গে যত আড্ডা মেরেছি, আমার যত অভিজ্ঞতা সব আমার স্মৃতিতে, দেহে, মনে স্বভাবে জমা হয়ে আছে। একই কথা দেশ, জাতি'র ক্ষেত্রেও সত্য। সেই অতীত ছাড়া এদের বোঝা যায় না।

এখন সভ্যতার কোন ইতিহাস পাঠ করবো? ব্রেখট বলেছিলেন—ফারাও কি নিজ কাঁধে পাথর বয়ে পিরামিড বানিয়েছেন, শাহজাহান কি নিজে পাথর খোদাই করে তাজমহল বানিয়েছেন? না, এমন তো নয়। তাহলে কোথায় গেল সভ্যতার আসল কারিগর সব? তাহলে সভ্যতা কি রাজা-বাদশা'র লড়াই, ধর্মের সংঘাত, রক্তপাতের জমাট রূপ। ডুরান্ট বলছেন- এসবের দিকেই ইতিহাসবিদের চোখ যায়, তবে ঘৃণায় উত্তপ্ত, জমাট রক্তে কালো এই নদীর স্রোত থেকে যদি চোখ তুলে পারের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো-মায়েরা সন্তানদের স্নেহে পালন করছে, পুরুষেরা ঘর বানাচ্ছে, কৃষক জমির বুকে ফসল ফলাচ্ছে, কারিগর নিত্য পণ্য বানাচ্ছে, শিক্ষক বর্বরকে নাগরিকে রূপান্তরিত করছে, গায়ক সুরের দোলায় আমাদের অবাধ্য হৃদয়কে শান্ত করছে, বিজ্ঞানীরা কী ধৈর্য্যে জ্ঞান সঞ্চয় করছে, দার্শনিক সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইতিহাসের ছবি আঁকা হয় এই রক্ত নদীর রঙে। সভ্যতার ইতিহাস হল সেই রক্ত নদীর তীরে যা ঘটে তার বৃত্তান্ত।

উইল ডুরান্ট ১৮৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিয়ে ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাস লিখে গেছেন এগার খন্ডে। প্রতি খন্ড দেড় থেকে দুই হাজার পৃষ্ঠা। ছয় নম্বর খন্ড থেকে তাঁর সহলেখক ছিলেন স্ত্রী এরিয়েল। প্রথম খন্ড ছাপে ১৯৩৫ সালে, শেষ খন্ড ১৯৭৫-এ। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো পন্ডিতদের, বিশেষজ্ঞদের হাত থেকে সভ্যতার ইতিহাসকে রক্ষা করা। ডুরান্ট তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো বই Story of Philosophy বইয়ে বলছেন যে—আমাদের কালে দুই ধরনের বিশেষজ্ঞ আছেন, এক- যারা 'কিছু না' নিয়ে অনেক কিছু জানেন, আর দুই- যারা 'অনেক কিছু' সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ডুরান্টদের লক্ষ্য ছিলো সভ্যতার একটা 'জীবনী' লেখা। এই জীবনীর বড় অংশ জুড়ে আছে সাধারণ মানুষের প্রত্যহিক জীবন যাপনের গল্প।

লক্ষণীয়, এই ইতিহাসের প্রথম খন্ডের নাম 'Our Oriental Heritage'- আমাদের প্রাচ্য ঐতিহ্য। ডুরান্ট খুব সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের ইতিহাসের অনুল্লেখিত ঋণ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য হচ্ছে প্রাচ্যের বখে যাওয়া বংশধর। পশ্চিমা যে কোন পন্ডিতের জন্য নিতান্ত অস্বাভাবিক ধরনে শ্রদ্ধাবনত তিনি প্রাচ্যের বহিরাঙ্গ ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করবার ক্ষমতা উপলব্ধি করে।

সভ্যতার ইতিহাস লেখার প্রস্তুতি হিসেবে তিনি ভারতে আসেন ১৯৩০ সনে। কিন্তু শুধু অতীত নয়, পাঠ আর বাস্তবের ভারতবর্ষের ফারাক দেখে তিনি বেশ বড় একটা বই লেখেন The Case of India বইয়ের মুখবন্ধের শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে ডুরান্ট বলছেন—

এই বইখানি লিখতে গিয়ে কোন ভারতীয় ব্যক্তি বা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল কারোর সহযোগীতা নেয়া হয়নি। আমি ভারতবর্ষ নিয়ে লিখছি। কারণ কেবল এই নয় আমি একে গভীরভাবে অনুভব করি, প্রস্তুতি ছাড়াই লেখছি কারণ জ্ঞান কবে পূর্ণ হবে, জীবন তার জন্য থেমে থাকে না। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন পক্ষে যাবো।... আমি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি মহান এক জনগোষ্ঠি অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে। শাসকদের দাবি এর কারণ অধিক জনসংখ্যা আর কুসংস্কার। কিন্তু এর আসল কারণ ইতিহাসের সর্বোচ্চ নির্মম, দুর্বৃত্তের মত শোষণ। এই শোষণ এক জাতির আরেক জাতির ওপরে।... ইংরেজরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক, ব্রিটিশরা পৃথিবীর সব চাইতে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদি। ইংরেজ পৃথিবীকে মুক্তি পেতে শিখিয়েছে, ব্রিটিশ'রা তা ধ্বংস করছে। স্বীকার করি আমি মুক্তির পক্ষ্যে।... বহু অর্থেই, ভারত মাতা আমাদের সবার মাতা।"

এই বইখানি পড়ে মুগ্ধ হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩১ সালের The Modern Review-র মার্চ সংখ্যায় তিনি পাঠ অনুভূতি লিখে জানান:

ব্রিটিশদের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বাধীন হবে, ভারত এই স্বপ্ন দেখলেও বিরক্ত হন এমন বেশ কিছু মার্কিন আমি দেখেছি। একদিন মানুষের যে অধিকার অর্জন করতে তারা নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, আমরাও যে সেই লড়াইয়ের কথা ভাবছি- এটা তাদের অসহ্য ঠেকে।... উইল ডুরান্ট আমাদের দেশের দুর্দশা নিজ চোখে দেখেছেন। তবে আর কেউ যে কাজটি করেনি তিনি তা করেছেন। তিনি আমাদের দুর্দশার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন। মানুষ হিসেবে যে সম্মান প্রাপ্য, ডুরান্ট আমাদের সেই সম্মান দিয়েছেন।... নিজেদের ঘৃণ্য করবার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের প্রতি এই বিরল সৌজন্য দেখে আমি অবাক হয়েছি।

উইল ডুরান্ট মানুষের এই অর্জনকে বড় করে দেখতেন কোন গোষ্ঠী বা পদ্ধতি'র আধিপত্যের চাইতে। তিনি বলতেন এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরী করার কথা যা প্রাণের অধীন থাকবে। মানুষের ইতিহাসের সহস্র বছর দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান করে তিনি এর প্রতি গভীর বাস্তব নির্ভর আস্থা রেখেছেন মানুষের স্বভাব না পাল্টে সরকার সংস্কারের আশা করে লাভ নেই।

তাঁর জগৎদৃষ্টিতে এক মহাজাগতিক বিশালতা ছিল। এই বিশালত্ব জীবনের ক্ষুদ্র, কিন্তু সেই বিশালত্বের সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, আঘাত-সজ্ঘাত ধারণ করে। এমন অকম্প নিবাত প্রদীপের মত দৃষ্টি তিনি শিক্ষা করেছিলেন স্পিনোজা'র কাছ হতে।

... আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখে ভয় পেওনা, এটা স্বাভাবিক... শান্তিও আরেক ধরণের যুদ্ধ। আমার বিশ্বাস বুদ্ধিমত্তা বা ভয় আমাদের ধ্বংস হতে বাঁচিয়ে রাখবে। শয়তানি সাধারণত বাড়াবাড়ি করেই তার প্রতিকার জন্ম দেয়।

মানুষের সমস্ত মহৎ অর্জনের প্রতি ডুরান্টের ছিল সীমাহীন ভালবাসা। সেই ভালবাসার থেকেই তিনি বলতে পারেন— জীবনের হয়তো কোন অর্থ নেই,

আমরা হয়তো এই জীবনে অর্থ আরোপ করি। অর্থ যে আমরা তৈরি করতে পারি এটাই তো এতাই তো সবচে' বড় অর্থ।

নিজেকে টুকরো টুকরো কোরোনা। তোমার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ হলে সভ্যতার শতরং ফুল বাগানে ভ্রমনের জন্য সপ্তাহে অন্তঃত দুই ঘন্টা সময় করে নিয়ো। বড় কবি, বড় শিল্প, বড় দার্শনিকদের, বড় গদ্য লেখকদের, সন্তদের তোমার বন্ধু বানাও। এই সব বড় মানুষেরা যদি তোমার বন্ধু না হন তাহলে আমি অন্তঃত তোমাকে শিক্ষিত বলে মেনে নেবোনা। সাধু সঙ্গ কর, যাদের সঙ্গে থাকবে তাদের মতই হবে তুমি।

মানুষের ইতিহাসে খুব কম সময়ই গেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া। তবে সেই সময়ের মাঝ দিয়েই মানুষ যা অর্জন করেছে সেই সব জ্ঞানের, প্রযুক্তির, নৈতিকতার, সাহিত্যের, দর্শনের, শিল্পের জগত আমাদের উত্তরাধিকার। বহু শত বছরে গড়ে ওঠা এই অতুল ঐশ্বর্য একা কেউ কোন দিন ছাপিয়ে যেতে পারবেনা। মানবজাতি সর্বদাই একজন মানুষের চাইতে জ্ঞানী।

তিনি জানতেন এই তাঁর তৈরি করা জীবনের বিশাল ক্যানভাসে বর্তমানের বিচারে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে:

আমি স্বাধীনতার অন্ধ সমর্থক নই। স্বাধীনতা বুদ্ধিমত্তা ছাপিয়ে গেলে বিশৃংখলা ডেকে আনে, বিশৃংখলা আনে স্বৈরতন্ত্র। ক্রমবৃদ্ধিমান প্রাচুর্য আর ক্রমহ্রাসমান বিশ্বাস নিয়ে আসেছে অতিরিক্ত নৈতিক স্বাধীনতা। বাইরের বিপদের চাপে স্বাধীনতার যুগ শেষ হয়ে আসছে। অংশের স্বাধীনতা সমগ্রের নিরাপত্তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেনা।

সমগ্র আর অংশের এই সজ্ঘাতে সমগ্রের প্রতি তাঁর সমর্থন তিনি জানিয়েছিলেন দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে সভ্যতার ইতিহাস রচনা করে। এই বই সেই গ্রন্থমালার ভূমিকা। আর আমরা তো প্রত্যেকে, প্রতি দিন আমাদের এই সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যে দিয়েই কালকের ইতিহাস তৈরি করছি। তবে সেই ইতিহাস যদি নিজের মত করে তৈরি করতে চাই, তাহলে যা কিছু প্রশ্নাতিত বলে মনে হয় তাকে প্রশ্ন করা শুরু করতে হবে। উইল ডুরান্ট এই উদ্দেশ্যে লিখতেন, আমরাও এই সে লক্ষেই এই বই ছাপলাম।

জাভেদ হুসেন
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রথম অধ্যায়
সভ্যতার উপকরণ

সভ্যতা হচ্ছে সামাজিক সচলাবস্থা যা সাংস্কৃতিক বিকাশকে উদ্বুদ্ধ করে। এর জন্য চারটি উপাদান আবশ্যকীয়— অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিক উত্তরন, জ্ঞান এবং শিল্প সাধনা। অনিয়ম এবং অনিশ্চয়তার যেখানে শেষ, সভ্যতার সেখানে শুরু; কারণ, ভয়কে পেছনে ফেলে আসতে না পারলে কৌতূহল এবং সৃষ্টিশীল মনের উন্মুক্ত বিরাজ সম্ভব নয়। জীবনকে বোঝা বা সুন্দর করে সাজানো সম্ভব নয়।

মানব সভ্যতার যে উপাদানগুলো আছে, যাদের ওপর সভ্যতার তৈরি হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভূ-তাত্ত্বিক উপাদান। ইতিহাসে দেখা যায়, মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন বরফ-যুগের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে। প্রত্যেক বরফ যুগের শেষে যখন গ্লাসিয়ারগুলো সমতলে ধেয়ে এসেছে, মানব সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন মুছে গেছে। থমকে পড়েছে তার অগ্রযাত্রা। ভূমিকম্পের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে চলেছে নগরায়ণ।

সভ্যতার দ্বিতীয় উপাদানটি ভৌগোলিক। গ্রীষ্মমন্ডলীয় তাপ; এই অঞ্চলের রোগ-ব্যাধি, অকাল-পরিপক্কতা এবং বার্ধক্য হচ্ছে সভ্যতার পথে অন্তরায়। খাদ্যার্জনে বিপুল পরিশ্রমের ফলে শিল্প বা মনের চর্চার জন্য হাতে সময় থাকে কম। বৃষ্টির মূল্য সূর্যালোকের চেয়েও বেশি। পানির অপর নাম জীবন। বিস্তারমুখী নদীপথের অভাবে নিনেভ এবং ব্যবিলনের মত অতি উন্নত সভ্যতাও খুব একটা ছড়াতে পারেনি। আবার প্রান্তদেশীয় সভ্যতা ব্রিটেনের বিকাশ ঘটে এই নদীর কারণেই। মাটি যার উর্বর বা খনিজে পূর্ণ, নদী যাকে দেয় ব্যবসার সুব্যবস্থা, যার উপকূলে আছে প্রকৃতির বন্দর, কিংবা পৃথিবীর মূল বাণিজ্য— পথে যার অবস্থান, যেমন— এথেন্স, কার্থেজ, ভেনিস কিংবা ফ্লোরেন্স ভৌগোলিক কারণেই সে সভ্যতা উতরে যায়। যদিও ভূগোল কখনো সভ্যতার সৃষ্টি করে না।

অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততার গুরুত্ব আরো বেশি। সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক অবকাঠামো শক্ত হতে পারে, কিছুটা শিল্পের ছোঁয়াও থাকতে পারে, যেমনটা রেড ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে, কিন্তু সেসব শিকার গোষ্ঠী কখনোই বর্বরতা ছেড়ে সভ্যতার সিঁড়িতে উঠে আসতে পারেনি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অপর্যাপ্ততা বা অনিশ্চয়তার

কারণে। সম্পদের পুঁজি ছাড়া সভ্যতা অসম্ভব। আরবের বেদুইনেরা বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং মহানুভব। কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা না থাকার কারণে শিকারের ঝুঁকি আর ব্যবসার মারপ্যাঁচেই তার জীবন ব্যয় হয়েছে। শিল্প, সভ্যতা বা শান্তির জন্য সময় না তার। কৃষ্টির শুরু কৃষিতে; প্রথম অর্থবহ কাজই হচ্ছে কৃষিকাজ। মানুষ যখন প্রথমবারের মত চাষাবাদে নামলো এবং অনিশ্চিত আগামির জন্য কিছু উদ্বৃত্ত শস্যদানা জমাতে পারলো, তখনই আসলে সে সভ্যতার পেছনে ব্যয় করার মত কিছুটা সময় হাতে পেল। নিশ্চয়তার সামান্য সে বিন্দুকে ঘিরে তখন সে তার ঘরবাড়ি, মন্দির, বিদ্যালয় বানাতে শুরু করলো। চাষাবাদে ব্যবহার্য ছোটখাট যন্ত্রপাতি বানাতে পারলো। পোষ মানালো গরু, গাধা, শুকোর বা কুকুর এবং সর্বোপরি নিজেকে। ছকবাধা জীবন শুরু হলো এবং তাতে শিকারের ঝুঁকিটুকু কমে যাওয়ায় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেল। বুদ্ধি এবং মনুষ্যত্ব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়াতে পারলো।

সভ্যতার শুরুতেই আছে শহর। একভাবে বলা যায়, সভ্যতা হচ্ছে সভ্যদের অভ্যাস। শহরে মানুষদের মার্জিত কিছু আচরণ-বিধি যা শুধুমাত্র শহরেই লালন করা সম্ভব, সেটাই সভ্যতা। কোন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক সব ধনসম্পদ বা বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এসে জড়ো হন শহরে। আবিষ্কার এবং শিল্পের সাথে যোগ হয় আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা বা অবসর। ব্যবসায়িরা করেন পণ্যের আদান-প্রদান, বিদ্বানরা করেন ভাবের। মনের এ মিথস্ক্রিয়ায় বুদ্ধি আর সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। নগরায়ণের সুবিধা হচ্ছে যে, কিছু মানুষ সেখানে জীবিকানির্ভর কার্যকলাপ থেকে বিরত থেকে দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের জন্য সময় ব্যয় করে। সভ্যতার শুরুটা যদিও হয় ছোট্ট কুটিরে, কিন্তু এর সমৃদ্ধি ঘটে শহরে।

সভ্যতার উন্মেষ ঘটার জন্যে জাতিভেদের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। চীন বা ভারত, ইরাক বা ব্রিটেন, পেরু বা মেক্সিকো- যে-কোন মহাদেশে, যে কোন বর্ণেই এর বিকাশ সম্ভব। উন্নত জাতিরা সভ্যতার স্রষ্টা নয়, বরং সভ্যতাই উন্নত জাতির স্রষ্টা। একটি অঞ্চলের সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা একটি বিশেষ সংস্কৃতির জন্ম দেয়, এবং সে সংস্কৃতির পরিচয়েই একটি বিশেষ জাতির উদ্ভব হয়। ইংরেজের পরিচয়ে ব্রিটিশ সভ্যতা পরিচিত নয়, বরং ব্রিটিশ সভ্যতার নামেই একজন ইংরেজ পরিচিত। তাকে সভ্যতার বাহক বলা চলে। একজন ইংরেজের ইংরেজি সাজসজ্জা তার অস্তিত্বের উপর এ সভ্যতার কর্তৃত্বের প্রমাণ, এমনটা কখনোই ভাবা উচিত নয় তার এ সজ্জার কারণেই এ সংস্কৃতি টিকে আছে। একই রকম উপাদান পেলে আরেক জাতির পক্ষেও একই ফলাফল পাওয়া সম্ভব। বিংশ শতাব্দীতে জাপানের জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ জাগরণের প্রতিরূপ। সভ্যতার সৃষ্টিতে জাতিগত বিশেষ কোন সুবিধা বা অসুবিধা দেখা যায় না। সভ্যতার সঙ্গে জাতির সামান্য যে সম্পর্কটুকু টানা যায় তা হচ্ছে প্রায়শই দেখা যায়, যখন দুটি ভিন্ন জাতির মিলন হয় এবং ধীরে ধীরে আর একটি সামাজিক গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়, সেখানেই একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে।

তবে দ্বিজাতিক গোষ্ঠী মাত্রই সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারবে তা নয়। তার আরো কিছু মনোজাগতিক উপাদানের প্রয়োজন পড়ে। এর জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হোক সে রেনেসাঁর ফ্লোরেন্স বা রোমের মত প্রায় অস্থিতিশীল। নাগরিক যেন নিরন্তর না মরে করারোপ বা শাস্তির ভয়ে। মনস্তাত্ত্বিক আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন এক ভাষার ব্যবহার। পরিবার, উপসনালয়, বিদ্যালয় বা যে ভাবেই হোক, সবার ভেতর নীতিবোধের জাগরণ ঘটানো প্রয়োজন, এমনকি যে মানবে না তাকেও সে নীতির আওতায় আনতে হবে, যাতে একটি নিয়ম বা নির্দেশনার দেখা পাওয়া যায়। সভ্যতার জন্য নীতির পাশাপাশি উদ্দীপনারও প্রয়োজন পড়ে। সর্বজন গৃহিত সাধারণ একটি বিশ্বাসের মঞ্চ থাকা দরকার, হোক তা ধর্মীয় বা একান্ত কল্পনা প্রসূত। এতে নাগরিকের মনোসংযোগ হিসাব ভিত্তিক না হয়ে বিশ্বাসের উপর ভর করে ঘটে থাকে, যা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী। এবং সর্বোপরি প্রয়োজন শিক্ষা-সংস্কৃতির সঞ্চারনের। আজকের জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার নামই সভ্যতা। ঘর-বাহির বা মন্দিরের দেয়া জ্ঞানে বা অনুকরণে জাতিগত প্রজ্ঞা ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী সময়ে, আর এভাবেই মানুষ ভিন্ন হয়ে ওঠে পশু থেকে।

এসব উপাদানের একটিরও ব্যাত্যয় ঘটলে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাও ভেঙ্গে পড়ে। আকস্মিক ভূ-তাত্ত্বিক বা আবহাওয়াজনিত পরিবর্তন কিংবা কোন মহামারী, যেমনটি ঘটে অ্যান্টোনিসের রোমান সাম্রাজ্যে যা তার জনসমষ্টিকে অর্দ্ধেকে নামিয়ে এনে, অথবা ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথ যা সামন্ত-যুগের অবসান ঘটিয়ে, নগরায়ণের ফলে চাষাবাদের জমি ফুরিয়ে যাওয়া এবং বৈদেশিক খাদ্যের উপর নির্ভশীল হয়ে পড়া, প্রাকৃতিক সম্পদ বিলীন হয়ে যাওয়া, বিশ্ব-বাণিজ্যের মূল পথের পরিবর্তন, নৈতিক বা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অযাচিত যৌনাচারে ধীরে ধীরে জাতিগত অবক্ষয়, ভোগবাদী বা নৈরাশ্যবাদী কোন দর্শনের উদ্ভব, যোগ্যদের আকাল এবং তার ফলে নেতৃত্বের পতন, সংস্কৃতির ধারক-বাহক পরিবার সমূহের সংখ্যা হ্রাস, সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার কারণে উদ্বুদ্ধ শ্রেণীভেদ এবং শ্রেণীযুদ্ধ, ভয়ংকর বিদ্রোহ বা অর্থনৈতিক মন্দা এগুলোই হচ্ছে একটি সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ। সভ্যতা কখনোই চিরস্থায়ী নয়, প্রতি প্রজন্মে এর নবায়ন প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা বা সঞ্চারণের ক্ষেত্রে হোঁচট খেলে এটি পুরোপরি থেমে যেতে পারে। সভ্যতা অংকিত হয় শিক্ষায়, বিদ্যায়, মনুষ্যত্বে।

মানব জাতির দৃষ্টিকোণে বিচার করলে, সকল সভ্যতাই মানব-সভ্যতা। প্রত্যেক সভ্যতাই আসলে সিঁড়ির একটি ধাপ। প্রথমে গোত্রবদ্ধ হওয়া, তারপর বলতে শেখা, লেখনি আবিষ্কারের ফলে সকল প্রজন্ম এক হতে পেরেছে। ছাপাঘরে মিডিয়ায় কিংবা বিনিময় ব্যাবসায় এক হতে শিখিয়েছে ভিন্ন সভ্যতার মানুষকে। প্রবীনের জ্ঞানে শিক্ষিত নবীন এখন জন্মেই মানুষ। আমাদের উচিত ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত জ্ঞান এক করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সভ্যতার অর্থনৈতিক উপাদান

এক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে, আদিম মানুষেরা মোটেও অসভ্য না। তারাও সভ্যতার চর্চা করেছে। গোত্রের পরম্পরায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং স্বভাবগত যত প্রথা বা নিয়মনীতি, যা সে এ পৃথিবীতে টিকে থাকবার জন্য রপ্ত করেছে তারই শিখা সে জ্বালিয়ে এসেছে তার সন্তানদের মাঝে। অন্য কাউকে বর্বর নামে আখ্যায়িত করাটা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। এতে এতটুকুই প্রমাণ করা হয় যে, আমরা নিজেদের বড্ড বেশি ভালবাসি এবং যা নিজের নয় এরকম সমস্ত কিছুতেই আমাদের সংকোচ। সন্দেহ নেই যে, আদিম এসব জনগোষ্ঠীকে আমরা বরাবরই অবমূল্যায়ণ করে আসছি। আতিথেয়তা বা নৈতিকতার দিক বিচার করলে তাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। আমরা যদি সভ্যতার উপাদান বা ভিত্তিগুলোর কথা চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে, অর্ধ-নগ্ন মানুষেরা শুধু লেখার আবিষ্কার ছাড়া বাকি সবকিছুই করে ফেলেছে আমরা সেগুলোকে কিছুটা অলংকৃত করেছি মাত্র। এদের কেউ কেউ হয়তো এক সময় সভ্য এবং পরে তা হারিয়ে ফেলেছে। সমকালীন এসব পূর্বসূরিদের ক্ষেত্রে বর্বর বা অসভ্য শব্দগুলোর ব্যবহার কমানো উচিৎ। আমরা তাদের আদিম নামে ডাকবো যারা অসময়ের জন্য খাদ্য মজুদ রাখতে এবং লিখতে শেখেনি। বিপরীতে, সভ্য তারাই যারা শিক্ষিত এবং দুঃসময়ের জন্য মজুত রাখতে শিখেছে।

১. শিকার থেকে চাষাবাদ

তিনবেলা খাবার অভ্যাসটাও অতি উন্নত এক বিধান। আদিম মানুষেরা কখনও গলা পর্যন্ত খেতো, আবার কখনও অভুক্ত থাকতো। কিন্তু বন্য আমেরিকান ইন্ডিয়ান পরের দিনের জন্য খাবার জমিয়ে রাখাটাকে দুর্বলতা বলে মনে করত। আদিবাসী অস্ট্রেলিয়রা তেমন কোন কাজ করতে অনাগ্রহী যার প্রতিদান সেই মুহূর্তেই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক হটেন্টট ভয়ানক অবকাশ প্রিয়। আফ্রিকার বুশম্যানদের সবসময়ই উৎসব, নয়তো উপোস। আদিমদের বিভিন্ন অদ্ভুত বিচক্ষণতার মধ্যে এটা অন্যতম। যে মুহূর্তে মানুষ পরের দিনের কথা ভাবতে

শিখলো সে মুহূর্তেই দুশ্চিন্তার শুরু, শান্তির শেষ। সংশয়ের সূত্রপাত্র, লোভের জাগরণ, সম্পত্তির শুরু, আর তার সাথেই বিদায় নিল শেষ ভাবনাহীন মন। আমেরিকান নিগ্রোরা আজ এ ধরনের একটি পর্যায় পার করছে। "কি ভাবছো?" প্যারী জিজ্ঞেস করলো তার এক এস্কিমো গাইডকে। "আমার তো ভাবার দরকার নেই", উত্তর এলো "আমার কাছে এখন প্রচুর মাংস আছে।" একেবারে বাধ্য না হলে ভাবার কি দরকার-আদিমদের এ ধরনের প্রজ্ঞায় ভাবনার বিষয় আছে বটে!

তবে, ভাবনাহীনতারও সমস্যা। যারা পক্ষান্তরে ভাবতে লাগলো, অস্তিত্বের যুদ্ধে তারাই এগুতে পারলো। হাড় চিবানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে যে কুকুরটি একটি হাড় মাটিতে গুঁজে রাখলো, পরে খাবে বলে যে কাঠবিড়ালি একটি বাদাম গুঁজে রাখলো, মধু জমাতে লাগলো যে মৌমাছিটি কিংবা যে পিঁপড়াটি বর্ষার জন্য খাবার তুলে রাখলো— তারাই আসলে সভ্যতার প্রথম স্রষ্টা। এসব তুচ্ছ প্রাণীরাই আমাদের পূর্বজদের ভাবতে শিখিয়েছে কিভাবে আজকের উদ্বৃত্তকে কালকের জন্য সঞ্চয় করতে হয়, শীতের প্রস্তুতি গ্রীষ্মেই নিতে হয়।

'কোন দক্ষতায় আমাদের পূর্বজনরা সাগর সেঁচে বা মাটি খুঁড়ে খাদ্য আহরণ শুরু করলো, যা সে-সময়কার সরল সমাজের ভিত্তি? হাতের জোরে মাটি খুঁড়ে উপড়ে আনল খাবার যোগ্য মূল, কখনো ব্যবহার করলো প্রাণীর নখর বা দীর্ঘ দাঁত, হাঁড়ে বা প্রস্তরে বানালো ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, পশুর ফাঁদ আর মাছ ধরার জাল বুনলো বেত বা গাছের আঁশে। পলিনেশীয়দের এক হাজার এ্যাল লম্বা জাল যা সামলাতে নিদেন পক্ষে শ'খানেক লোকের প্রয়োজন। খাদ্যান্বেষণে এ ধরনের বড় গোষ্ঠীর সংগঠনেই ধীরে ধীরে রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং রাজ্যের সৃষ্টি হয়। লিংগিট জেলেরা মাথায় সীলের মাথার মুকুট পড়ে পাথরের আড়াল থেকে সীলের ডাক দিতো, আর ডাক শুনে সীলেরা কাছে আসা মাত্রই বর্শায় গেঁথে নিত তাদের। বিভিন্ন উপজাতি ঝর্ণার পানিতে মাদক (গাছের নির্যাস) মিশিয়ে দিয়ে মাছেদের অসাড় করে ভাসিয়ে তুলতো। তাহিতিয়রা এ কাজে হুটিও নামের বাদাম বা হোরা বৃক্ষের রস ব্যবহার করতো। আদিবাসী অস্ট্রেলিয়রা নলখাগড়ার নল দিয়ে শ্বাস নিয়ে ডুবে থাকতো পানিতে আর ওপরে হাঁস এলে টেনে ধরতো নিচ থেকে। তারাহুমারারা এক ধরনের ফল শক্ত সুতায় বেঁধে রাখতো। পাখিরা এসে সে ফল খেয়ে আটকে যেতো।

শিকার আজ আমাদের জন্য নিছক খেলা হলেও, এর টান রক্তের; একসময় তা শিকারী বা শিকার উভয়ের জন্য বাঁচা-মরার খেলা। কারণ শুধু যে খাবারের জন্যই আমরা শিকার করেছি তা না, নিরাপত্তা বা প্রভুত্বের প্রশ্নেও এর দরকার। এ এমন এক যুদ্ধ যার বিপরীতে মানব ইতিহাসের বাকি সকল যুদ্ধ মৃদু এক গুঞ্জন মাত্র। এখনও জঙ্গলে মানুষ প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধ করে। যদিও এখন সে ধরনের হিংস্র জন্তু কমই আছে যারা ক্ষুধায় বা বিপদে না পড়লেও আক্রমণ করে। জংলী অনেক উপজাতির রীতি আছে যে, শিকারের উপর অধিকার শুধু মাত্র শিকারীর, তাই সবাইকেই শিকার করতে হয়; অনেক সময় নিজেদের। যাদুঘরগুলোতে সাজানো

আছে ছুরি, মুগুর, বর্শা, তীর, ফাঁদ, বুমেরাং, লেসো, গুলতি— যা দিয়ে আদিম মানুষেরা ভূমিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। নিরাপদ জীবন উপহার দিয়েছে তার অকৃতজ্ঞ সন্তানদের— যারা পরে তার পিতা, সেই মানুষের হত্যায় মেতেছে। বিলীন করে দেবার এত যুদ্ধের পর, আজও আমরা দেখতে পাই কত শত জাত! বনে একাকি হাঁটতে গেলে, শত ভাষায় ডেকে ওঠা পোকামাকড়, সরীসৃপ, মাংশাসী প্রাণী বা পাখিদের ভিড়ে হয়তো উপলব্ধি আসতে পারে যে, এ ব্যস্ত সমারোহে মানুষই হচ্ছে চিরায়ত হিংসা বা ধ্বংসের জাত, এ দৃশ্যপটে আমাদের ঘটেছে অন্যায় প্রবেশ। কোনদিন হয়তো এসব চৌপদী বা বহুপদী কীট-পতঙ্গ মানুষ এবং তার সমস্ত চিহ্নকে মুছে দেবে। এসব অস্ত্রশস্ত্র বা লুণ্ঠনবাজ এ দ্বিপদীদের অযত্নের পায়ের ছাপ মুছে দিতে পারবে সবুজ পৃথিবীর বুক থেকে।

শিকার বা মাছ ধরার অভ্যাস সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশের উপাদান না হলেও এগুলো আমাদের সভ্যতায় আজও টিকে আছে। একসময় এগুলো মূল জীবিকা। আমাদের সাহিত্য বা দর্শন, আমাদের কলা বা রীতি, আমাদের ভদ্র চেহারার আড়ালে এগুলো এখনও আমাদের সভ্যতার মূল স্তম্ভ। এখনো আমরা ছদ্ম-শিকারী— জঙ্গলের বাইসন মারি না বটে, তবে সুযোগ মত দুর্বল বা বন্দীদের মেরে আনন্দ পাই। নির্দোষ খেলাধুলায় হলেও শিকারের অদম্য ইচ্ছেটা বারবার জেগে ওঠে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সভ্যতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে খাদ্যের জোগানের উপর। উপসনালয় কিংবা সংসদ, যাদুঘর কিংবা কনসার্ট হল, পাঠাগার বা বিদ্যালয় সবই আসলে অট্টালিকার সম্মুখভাগ, পেছনে আছে বিরাট বধ্যভূমি।

কিন্তু, শিকারে জীবিকা নির্বাহ সভ্যতার আদি স্তম্ভ হতে পারে না। যদি তাই হতো, মানুষ তাহলে আরেকটি মাংশাসি প্রাণী ছাড়া আর কিছুই হতো না। সে তখনই মানুষ হতে শুরু করলো যখন সে অনিশ্চয়তার শিকারী জীবন ছেড়ে নিরাপদ পশু পালনের জীবন শুরু করলো। এতে কিছু সুবিধা পাওয়া গেল— পশু পোষ মানলো, প্রজননে সংখ্যা বাড়ানো গেল এবং দুধ উৎপাদন শুরু হল। প্রথম কবে পশুকে পোষ মানানো শুরু হলো তা জানা যায়নি। হয়তো শিকার করা কোন পশুর নিরীহ শাবকটিকে ধরে নিয়ে আসা শুরু হয়ে বাচ্চাদের খেলার সঙ্গী হিসেবে কাজে লাগবে বলে। পোষ মানানোর কায়দা শেখার ফলে পশুটাকে খাওয়ার সময়টা পিছিয়ে, তাকে প্রথমে বানানো হতো ভারবাহী সঙ্গী। পশুকে মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য একজন রূপে গ্রহণ করা হলো সে হয়ে উঠলো সহযোদ্ধা, শ্রমে সে সহকর্মী আর বসবাসে বিশ্বস্ত বন্ধু। বংশ-বিস্তারের রহস্যটি উপলব্ধি করা গেলো এবং জোড়া থেকে একপাল পশুর উৎপাদন হতে লাগলো। পশু দুধের বদৌলতে নারীর মাতৃকাল ছোট হয়ে এলো, শিশুর মৃত্যুহার কমলো এবং একটি নির্ভরশীল খাদ্য উৎসের সন্ধান মিললো। জনসংখ্যা বাড়লো, জীবন হলো স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল, পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান পোক্ত হলো।

ইতিমধ্যে নারীর হাত ধরে ঘটলো সর্বোচ্চ বিপ্লব। মাটির উৎপাদন ক্ষমতা আবিষ্কৃত হলো। পুরুষ যখন শিকারে বেরুতো, নারী তখন তার ডেরার

আশপাশটা ঘুরে যা কিছু খাবার যোগ্য মিলতো তাই কুড়িয়ে আনতো। অস্ট্রেলিয়াতে লক্ষ্য করা গেছে, পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারী মধু সংগ্রহ করতো, আশেপাশের মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন কান্ড, মূল, গাছের ফল, বাদাম, বীজ, শস্য তুলে আনতো। আজও অস্ট্রেলিয়ায় কিছু উপজাতিদের বেলায় যে ফসল আপনা-আপনিই ফলে তাদের কেটে ঘরে তুলতে দেখা যায়, যদিও বীজ বপনের কোন চেষ্টাই তারা করে না। সেক্রেমেন্টো নদী-উপত্যকার ইন্ডিয়ানরা এ পর্যায়টি কখনও উত্তরে আসতে পারেনি। আমরা কোন দিনই জানতে পারবো না কখন মানুষ বীজের কাজ বুঝতে শিখেছে এবং বপন করতে শিখেছে। এই বুঝতে পারা ইতিহাসের এক রহস্য হয়েই থেকে যাবে। এটা নিয়ে বিশ্বাস বা ধারনা তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তা জানা সম্ভব নয়। এমনটা হতে পারে যে, মানুষ যখন জংলী শস্য কেটে ঘরে আন, পথে কিছু শস্যদানা এদিক-ওদিক ছিটিয়ে পড় এবং সেপথে পরের বছর ফলন দেখে তাদের বোধোদয় ঘটতে পারে। জুয়াংদের দেখা যায় সকলে মিলে মাঠে শস্য ছিটিয়ে দেয় এবং গাছেদের নিজে থেকে বেড়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকে। বোর্নিও উপজাতিদের ক্ষেত্রে লাঠি দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর বীজ ফেলতে দেখা যায়। এটিই বোধ হয় বীজ বপনের সরলতম পদ্ধতি। ইউরোপিয়রা মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও মাদাগাস্কার দ্বীপে দেখেছে যে, সৈনিকের মত এক রেখায় মহিলারা ক্ষেতে দাঁড়াতো, হাতে থাকতো চোখা লাঠি, সংকেতের সাথে সে লাঠিতে গর্ত খুঁড়ে মাটিকে উপড়ে ফেলা হতো, ফেলা হতো কিছু বীজ, পায়ের চাপে আবার মাটিকে সমান করা হতো এবং সবাই পরবর্তী দাগে এসে দাঁড়াতো। পরবর্তী সংযোজনটা হচ্ছে লাঠিটার ডগায় একটা চোখা হাড় এবং লাঠিটার সাথে আড়াআড়িভাবে আরেকটা ছোট লাঠি বাঁধা, যাতে তাতে পায়ের চাপ দেয়া যায়। ইউরোপিয় আগ্রাসনকারীরা মেক্সিকোতে গিয়ে অ্যাজটেক্‌দের হাতে চাষাবাদের জন্য এরচেয়ে উন্নত কোন প্রযুক্তি দেখতে পায়নি। পশুকে পোষ মানানো আর ধাতুর ব্যবহার শেখার পর চাষাবাদে ভারী যন্ত্রপাতির আবির্ভাব ঘটে। নিড়ানি থেকে লাঙ্গল এলো এবং তার ফলে গভীরের মাটির অব্যবহৃত সার মানুষের জীবন পাল্টে দিলো। বন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ মানুষের চাষাবাদের আওতায় এলো, নতুন প্রজাতির গাছের উদ্ভব হলো আর পুরানো প্রজাতির উন্নয়ন ঘটলো।

অবশেষে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে মজুদ করার কায়দা শিখলো, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারলো, মানুষের সময়জ্ঞান হলো।লেখকের মত ইংরেজী তিনটি শব্দ— Provision, providence, prudence- একই মূল থেকে এসেছে মজুদ, ভবিষ্যতের জন্য মজুদ, দূরদর্শিতা। কাঠবেড়ালি যেমন ওক্ গাছের বীজ গর্তে পুরে রাখে, মৌমাছি যেমন মৌচাকে মধু জমিয়ে রাখে, লক্ষ বছর বন্য আচরণের পর মানুষ অবশেষে ভবিষ্যতের জন্য খাবার মজুদ করার সুবিধাটা বুঝতে শিখলো। পুড়িয়ে, লবন মিশিয়ে বা হিমায়িত করে মাংসের সংরক্ষণ শিখলো। তার চেয়ে বড় কথা, খরার মাসের মজুদের জন্য সে ফসলের গোলা বানালো

যাতে তা বৃষ্টি, আর্দ্রতা, পোকামাকড় বা লুটেরার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ধীরে ধীরে এটা সে বুঝতে শিখলো যে খাবারের যোগান হিসেবে চাষাবাদ শিকারের চেয়ে উন্নত এবং বিশ্বস্ত পন্থা। এভাবেই পশু থেকে মানুষ হবার যে গল্প তার তিনটি ধাপ (বলতে শেখা, লিখতে শেখা এবং চাষাবাদ) এর একটি আঁকা হলো।

মানুষ রাতারাতিই শিকার থেকে চাষাবাদে নেমে এসে এটি ধরে নেয়া চলবে না। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মত বহু জাতির কখনোই এ পর্যায় পার হওয়া হয়নি। এদের নারীরা চাষাবাদ করে, কিন্তু পুরুষেরা শিকার করে। এ পরিবর্তনর শুধু যে ধীর গতিতে ঘটেছে তা নয়, এটি আসলে কখনোই একেবারে সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। খাদ্য আহরণের পুরানো যে পদ্ধতি, তার সাথে কদাচিৎ নতুন আরেকটি পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে। ইতিহাসের বেশির ভাগ অংশেই দেখা যায়, মানুষ বরং পুরানো পদ্ধতিকেই নতুনের চেয়ে বেশী পছন্দ করেছে। আদিম মানুষদের লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা হাজারো নতুন খাদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে, খাবারের তালিকায় চিরায়ত বাদাম, ফল, মাংস বা মাছের সাথে তাদের মিশিয়েছে, কিন্তু সে সবরকমই শিকারের পেছনে পাগলের মত ছুটেছে। এখনো যে সব আদিম মানুষেরা মূলত শস্য, সবজি বা দুধের উপর নির্ভর করে, তাদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় যে, তারা মাংসের জন্য ভীষণ পাগল। সদ্যমৃত কোন জন্তু সামনে পড়লেই তারা আদিম উৎসবে মেতে ওঠে। কাদাচিৎ-ই রান্না করে সময় নষ্ট করা হয়, দাঁতের পক্ষে যত দ্রুত ছিঁড়ে নেয়া সম্ভব, তত দ্রুতই কাঁচা মাংস গলাধঃকরণ করে তারা। পুরো এক গোষ্ঠীকে দেখা গেছে চরে আটকে পড়া এক তিমি মাছকে সাতদিনে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলছে। যদিও ফুয়োজিয়ানরা রান্না করতে জানে, কিন্তু কাঁচা মাংসই তাদের পছন্দ। একটি মাছ ধরা পড়লে তাকে কানের পাশে আঘাত করে হত্যা করা হয় এবং দ্বিতীয় কোন প্রক্রিয়ায় না গিয়ে তৎক্ষণাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত খেয়ে ফেলা হয়। খাদ্যের অনিশ্চয়তা এ মানুষগুলোকে রীতিমত সর্বভূক বানিয়ে ছেড়েছে— ঝিনুক, সামুদ্রিক আর্চিন, ব্যাঙ, শামুক, ইঁদুর, মাকড়সা, কেঁচো, বিছা, ঘাসফড়িং, মথ্, শুয়োপোকা, টিকটিকি, সাপ, কুকুর, ঘোড়া, পোকা, উকুন, সাপের ডিম প্রত্যেকটি খাবারই কোথাও না কোথাও আদিম মানুষদের কাছে সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত। কিছু উপজাতি তুখোড় পিঁপড়া-শিকারি, কেউ কেউ পোকাদের রোদে শুকিয়ে খায় বা পরবর্তী উৎসবের জন্য তুলে রাখে, কেউ আবার মাথার উকুন বেছে আনন্দের সাথে খেয়ে থাকে। বেশী উকুন বেছে আনতে পারলে তারা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, যেন এরা মানুষের চিরশত্রু। নিচু জাতের উপজাতি আর উঁচু জাতের বানরের মেন্যুতে আসলে বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

বাছবিচারহীন এই ক্ষুধার অবসান ঘটেছে আগুনের আবিষ্কারের ফলে। মানুষ শিকারের জীবন ছেড়ে চাষাবাদের জীবন বেছে নিতে পেরেছে। এমন অনেক প্রজাতির গাছ আছে যেগুলোকে কাঁচা খাওয়া যায় না, রান্নার ফলে তাদের স্টার্চ বা সেলুলোজ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের খেয়ে হজম করা যায়। রান্নার ফলে খাবার

নরম হলো এবং তার ফলে চিবানোর প্রয়োজন কমলো। তখন থেকে অবশ্য দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়েছে, যা সভ্যতার অন্যতম এক পদচিহ্ন।

যেসব বিচিত্র খাবারের বর্ণনা এতক্ষণ দেয়া হলো— তার সাথে মানুষ যোগ করলো সবচেয়ে সুস্বাদু পদ— স্বজাতির মাংস। ইতিহাসের এক পর্যায়ে নরভক্ষণ ব্যাপারটি সার্বজনীন। প্রায় সকল আদিম উপজাতির মধ্যেই এ অভ্যাস দেখা গেছে। এমনকি আধুনিক মানুষ যেমন, ইরিশ, আইবেরিয়ান, পিক্ট এবং এগারো শতকের ডেইনদের-ও মানুষ মাংস খেতে দেখা গেছে। অনেক উপজাতির মধ্যেই নরমাংস কেনা-বেচা হতো, কবর দেবার ব্যাপারটিই অজানা ছিলো। আপার কঙোর বাজারে খাবার কেনা- বেচার মতোই সাবলীলভাবে নারী ও শিশু বিক্রি হত। আমরা যেমন মাংসের দোকানে গরু, ছাগলের মাংস কেনা-বেচা করি, নিউ ব্রিটেন দ্বীপে মানুষের মাংস বিক্রির জন্য কসাইখানা। কিছু কিছু সলোমন দ্বীপে আটককৃত বন্দী, বিশেষত নারীদের বেশি খাইয়ে মোটাতাজা করা হতো, যেমনটি আমরা করে থাকি ক্রিসমাস্ বা ঈদ উপলক্ষে গরু ছাগলের ক্ষেত্রে। ফুয়োজিয়ানরা নারীদের কুকুর থেকে উপরে স্থান দিতো কারণ তাদের ভাষ্যমতে, কুকুরের স্বাদ ভোঁদরের মত। তাহিতীতে এক পলিনেশীয় নেতা পিয়েরে লটির কাছে তার খাবারের বর্ণনা দিয়েছে, 'ভালো করে ভাজা হলে সাদা মানুষেরা খেতে পাকা কলার মত।' ফিজি দ্বীপবাসীরা কিছুটা অভিযোগের সুরে বলেছে যে, সাদাদের মাংস নোন্তা এবং শক্ত। ইউরোপিয় নাবিকরা এতই শক্ত যে খাওয়ার যোগ্য নয়। পলিনেশিয়রা বরং খেতে ভালো।

এরকম অভ্যাসের উৎসটা কোথায়? আগে যে রকম ভাবা হয়ে তেমনটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, খাদ্যের স্বল্পতাই এ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে। সেটা যদি হয়েও থাকে তবুও বলতে হয় যে, খাদ্য স্বল্পতা এর জন্ম দিলেও এর প্রতি এক ধরনের অনুরাগ অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে। সর্বত্রই দেখা যায়, রক্ত আদিম মানুষদের কাছে উপাদেয় এক বস্তু; ভীতিকর কিছু নয়। শাকাহারি গোত্রকেও আনন্দের সাথে রক্ত পান করতে দেখা যায়। এমন সব উপজাতিও রক্ত পান করে যারা অন্যথায় দয়ালু এবং সহৃদয়। মানুষের মাংস খাওয়া হত কখনো ঔষধ, কখনো ধর্মীয় আচার হিসেবে, কখনো বা এ বিশ্বাসে যে এতে করে শিকারের শক্তি তার শরীরে জমা হবে। মানুষের মাংস খাবার ব্যাপারে আলাদা কোন সংকোচ তাদের মনে কাজ করতো না। মানুষের মাংস এবং অন্য প্রাণীর মাংসের মধ্যে কোন ভেদাভেদই করত না তারা। মেলানেশিয়ায় যে সর্দার তার বন্ধুদেরকে মানুষের রোস্ট দিয়ে আপ্যায়ণ করতো তার খুব সুনাম হতো। 'শত্রুকে হত্যা করার পর' ব্রাজিলের এক দার্শনিক-নেতা ব্যাখা করছিলেন, 'তার শরীরটা পঁচে নষ্ট হবার চেয়ে তাকে খেয়ে ফেলাই তো ভালো... মরাকে না খাওয়াই তো সবচেয়ে বড় ভুল। যদি আমি খুন হই, তাহলে আমার শত্রুরা আমাকে খেলো না খেলো তাতে কি-বা আসে যায়। শত্রুর মাংসের চেয়ে সুস্বাদু আর কি হতে পারে?... তোমরা শ্বেতাঙ্গরা বড্ড নাজুক স্বভাবের!'

সন্দেহ নেই যে, নর মাংস খাওয়ার এই রীতির কিছু সুবিধা। এরা শিশু আধিক্য নিয়ে ডীন সুইফটের* পরিকল্পনাখানি আগে থেকেই পালন করা শুরু করে, আর বৃদ্ধদের অর্থপূর্ণ এক মৃত্যুর সুযোগ করে দিয়েছিলো। কবর দেয়াটা তাদের বিচারে এক ধরনের অপব্যয়। মন্টেনের মতে, মৃত্যুর পর মানুষকে রোস্ট করে খাওয়ার চেয়ে ধর্মের মোড়কে তাকে নিপীড়ন করে হত্যা করা অনেক বেশী বর্বরোচিত।অন্যদের অবোধ-বিশ্বাসকেও সহানুভূতির সাথে বিচার করা উচিৎ!

২. শ্রমশিল্পের ভিত্তি

আগুন- আদিম যন্ত্রপাতি-বুনন এবং কারুকাজ- স্থাপনা এবং পরিবহন- ব্যবসা এবং হিসাব

কথা বলা দিয়ে মানুষের শুরু, সভ্যতার শুরু চাষাবাদে আর শ্রমশিল্পের শুরু হয়েছে আগুনের ব্যবহার দিয়ে। মানুষ আগুনের আবিষ্কার করেনি; সম্ভবত প্রকৃতিই সে বিস্ময় তাকে উপহার দিয়ে পাতায়-পাতায় ঘর্ষণে বা বজ্রপাতে কিংবা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। মানুষ তার অনুকরণ রপ্ত করেছে এবং এর কিছু উন্নতি ঘটিয়েছে। এ বিস্ময়ের হাজারো ব্যবহার দেখিয়েছে মানুষ। প্রথমে হয়তো তার চিরশত্রু অন্ধকারকে দূর করার জন্য মশাল জ্বালিয়েছে, তারপর এর উত্তাপের সাহায্যে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত তুন্দ্রাঞ্চল পর্যন্ত জয় করে পুরো পৃথিবীকে তার আয়ত্তে এনেছে। তারপর ধাতুকে পুড়িয়ে নরম করেছে, বাধ্যগত করেছে, বিভিন্ন প্রকার ধাতুর মিশ্রণকে শক্ত কিংবা নরম করে অধিক ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে। আগুন এতোটাই উপকারী এবং অদ্ভুত এক বিষয় যে, আদিম মানুষেরা কখনোই এর রহস্যের কূল-কিনারা করতে পারেনি; তারা একে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে। ভক্তির অগুনতি সাড়ম্বরতায় তাকে সাজিয়েছে মানুষ, জীবন এবং গৃহের মধ্যমণি ছিলো আগুন। ইংরেজী hearth (ঘরের অগ্নিকুণ্ড) শব্দের ল্যাটিন হচ্ছে focus (কেন্দ্রবিন্দু)। যেখানেই যাক আগুনকে সে সাথে বয়ে বেড়িয়েছে এবং কখনোই নিভতে দেয়নি তাকে। রোমানরা আগুন নেবানোর দায়ে গীর্জার কুমারীকে মৃত্যুদণ্ড-ও দিয়েছে।

ইতিমধ্যে, শিকার, পশুপালন কিংবা চাষাবাদের মাঝেও মানুষের মস্তিষ্ক আবিষ্কারে লিপ্ত ছিলো। জীবনের অর্থনৈতিক ধাঁধাঁর বৈজ্ঞানিক উত্তরের খোঁজে ব্যস্ত ছিলো আদিম মানুষের মন। মানুষ প্রথমে প্রকৃতির দান, যেমন— গাছের ফল, পশুর চামড়ার কাপড়, পাহাড়ের পাদদেশে গুহার ঘর— এসব নিয়েই তৃপ্ত ছিলো। তারপর হয়তো সে প্রাকৃতিক সব প্রযুক্তি এবং প্রাণীকূলের শ্রমশিল্পের অনুকরণ শুরু করলো। হয়তো বলছি কারণ ইতিহাসের অধিকাংশটাই অনুমান আর বাকিটা পক্ষপাতদুষ্ট। মানুষ দেখতে পেত যে, বানরেরা শত্রুর দিকে পাথর বা ফল ছুঁড়ে মারে, ঝিনুক বা বাদাম ভাঙ্গার জন্য পাথর ব্যবহার করে, বীভারেরা বাঁধ তৈরি করে, পাখিরা বাসা বা নিকুঞ্জ বানায়, শিম্পাঞ্জীরা ছাউনীর মত কিছু একটা তৈরি করে। তাদের নখর, দাঁত, শিং বা শক্ত চামড়ার কথা ভেবে তার হিংসে হতো

এবং এসব দুর্বলতাকে জয় করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রযুক্তির কথা ভাবতো সে। ফ্রাংকলিনের মতে, মানুষ হচ্ছে সেই প্রাণী যারা যন্ত্রের ব্যবহার জানে। কিন্তু এটি হয়তো আমাদের ক্ষমতার আরেকটি অতিমূল্যায়ন, যা আসলে অনেকটাই সার্বজনীন, শুধু আছে মাত্রাগত পার্থক্য।

আদিম মানুষের সকল অস্ত্রের উপাদান বা সম্ভাবনাটুকুও আমাদের আশেপাশের উদ্ভিদজগতেই ছিলো। বাঁশ থেকে মানুষ বানিয়েছে ছুরি, সুই, শর, বোতল; গাছের ডালপালা থেকে আংটা, সাঁড়াশি, চেপে ধরার জন্য বাইস, বাকল এবং আঁশ থেকে সুতা কিংবা রকমারী কাপড়। সর্বোপরি, মানুষ তার নিজের জন্য তৈরী করেছে একটি লাঠি। জিনিসটি অতি সাধারণ, কিন্তু এর ব্যবহার এতো বিচিত্র যে মানুষ সবসময়ই লাঠিকে কর্তৃত্ব বা শক্তির প্রতীক বলে বিবেচনা করতো; পরীদের যাদুদণ্ড, মেষশাবকের ছড়ি, মুসা বা অ্যারনের যাদুর লাঠি থেকে শুরু করে রোমান কনসালের হাতির দাঁতের লাঠি, অগারের লিটুয়াস কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট বা রাজার রাজদণ্ড। চাষাবাদে এই লাঠিই হয়েছে নিড়ানী, যুদ্ধে বর্শা, তলোয়ার বা বেয়োনেট। এদিকে মানুষ খনিজ সম্পদের-ও ব্যবহার করলো, পাথর কেটে তৈরি করলো এক যাদুঘর পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র আর দ্রব্যাদিঃ হাতুড়ি, নেহাই, তীরের ফলা, করাত, চাঁছার যন্ত্র, কীলক, লিভার, কুড়াল, ড্রিল। প্রাণীকূল থেকে সে বানালো চামচ, হাতা, পাত্র, কলসি, থালা, কাপ, বড়শি, প্রাণীর শিং, দাঁত, হাড় ও চামড়ার বিভিন্ন তৈজসপাতি। বেশিরভাগ দ্রব্যাদিতেই প্রাণীর তন্তু বা গাছের আঁশের সাহায্যে বাঁধা হলো কাঠের হাতল, কখনো রক্তের বিচিত্র সব মিশ্রণে জোড়া দেয়া হলো দুটি অংশ। আদিম মানুষের বুদ্ধিমত্তা একজন গড়পড়তা আধুনিক মানুষের সমান বা হয়তো তার চে' বেশিই হবে; কিন্তু আমরা তাদের চে' এগিয়ে আছি আমাদের সম্মিলিত জ্ঞান এবং আমাদের উন্নত যন্ত্রপাতির কারণে। বাস্তবে আদিম মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে পরিস্থিতিতে প্রতিনিয়ত ছিল ছিল আবিষ্কারের মাধ্যমেই টিকে ছিলো। আমাদের মত ছকবাঁধা জীবন নয় তাদের। এস্কিমোদের একটি প্রিয় খেলা হচ্ছে, দুর্গম সব স্থানে এরা একাকী, এক বস্ত্রে যাবে এবং সেখানে টিকে থাকবার জন্যে কে কার চে' ভালো পন্থা ব্যবহার করেছে তার প্রতিযোগিতা হবে।

এবার আদিম মানুষের দক্ষতার কিছুটা বর্ণনা দেয়া যাক। এদের দক্ষতার সগর্ব প্রমাণ মেলে তাদের বুননশিল্পে, যদিও এখানেও প্রাণীকূলই তাদের পথিকৃত। মাকড়সার জাল, বাবুই পাখির বাসা, গাছের আঁশের জটিল বুনন— এগুলো এত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত ছিলো যে, বুনন মানুষের আদিতম সৃজনশীলতার একটি হওয়া বিধিবদ্ধ ছিলো। গাছের বাকল, পাতা, ঘাস দিয়ে বোনা কাপড়, কার্পেট, ছামিয়ানা— এদের মধ্যে কিছু কিছু এতটাই সুন্দর যে, আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও এর অনুরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। অ্যালুশিয়ান মহিলারা একটি জামা বানাতে কখনো একবছর সময় নেয়। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা তাদের কম্বল এবং কাপড়ের পাড়ে চুল বা বেরীর রঙে রাঙানো সুতার এত সুন্দর এমব্রয়ডারি

করে, তাদের রং-এর ব্যবহার এতই জীবন্ত যে, ফাদার থিওডাটের ভাষায়,"আমাদেরগুলো তাদের ধারেকাছেও যেতে পারবে না।" আবারো দেখা যায়, প্রকৃতির হাত ধরেই শিল্পের সূত্রপাত। পাখির হাড়, মাছের কাঁটা কিংবা বাঁশের চিকন ডগা থেকে সুই প্রস্তুত করা হতো। প্রাণীর তন্তু হতে এত সূক্ষ্ম সুতা বানাতো হতে যে আধুনিককালের সবচে' সূক্ষ্ম সুই এর মাথায় তা প্রবেশ করানো সম্ভব। গাছের বাকলকে পিটিয়ে বানানো হতো মাদুর বা কাপড়, চামড়া শুকিয়ে জুতো, গাছের আঁশে কয়েক সারিতে পেঁচিয়ে তৈরী করা হতো শক্ত দড়ি, রঙিন বেত বা ডাল দিয়ে বানানো হতো রকমারী ঝুড়ি যা আধুনিক সময়কারগুলোর চে' অনেক বেশি সুন্দর।

বুননশিল্পের পাশাপাশি মুৎশিল্প-ও জন্ম নিয়েছিলো। বেতের ঝুড়ির বাইরে কাঁদার আস্তরণ দিয়ে তাকে রোদে এবং আগুনে পোড়ানো হতো, শক্ত হয়ে গেলে বেতের ঝুড়িখানি আলাদা করে ফেলা হতো। এভাবেই হয়তো ধীরে ধীরে নতুন এক শিল্পের জন্ম হয় যা পরে চীনের বিখ্যাত পোরসেলিনে রূপ নেয়। অথবা, কিছু মাটির দলা হয়তো রোদে শুকিয়ে শক্ত হবার পর সিরামিক শিল্পের ধারণা দেয়। আগুন এক পর্যায়ে রোদের বিকল্প রূপে কাজে আসে। সকল প্রকার ব্যবহারের জন্যই মাটির একেকটি পাত্রের আবিষ্কার হয়— রান্নার জন্য, গৃহস্থালী জিনিসপত্র রাখবার এবং বহন করবার জন্য। আবার, এদের অলংকরণের কাজে কারুশিল্পের ব্যবহার শুরু হয়। ভেজা কাদায় নখের চাপে করা সাধারণ নকশাই হচ্ছে আমাদের প্রথম চিত্রকলা। আর, এভাবেই হয়তো লেখার প্রথম হরফগুলো জন্ম নিয়েছে।

আদিম মানুষেরা রোদে শুকানো কাঁদা দিয়ে ইট বানিয়েছে, ঘর বানিয়েছে এবং স্থাপনাশিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছে। একের পর এক পদ্ধতি প্রয়োগ বা আধুনিকায়নের ফলে কাঁদার এ ঘর থেকে এক পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই নিনেভ এবং ব্যবিলনের টাইলসের অসাধারণ ব্যবহার। সিলোনের ভেয়দাদের মত কিছু আদিম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের কোন ঘরবাড়িই ছিলো না- পৃথিবী ছিলো তার মেঝে, আকাশ তার ছাদ। তাসমেনিয়রা গাছের কোটরে ঘুমাতো, নিউ সাউথ ওয়েলসের উপজাতিরা গুহায় বসবাস করতো, বুশম্যানদের মত অনেকে আবার ডাল এবং লতাপাতা দিয়ে ছাউনী বানাতো, ছাউনী তৈরিতে কখনো কখনো এদেরকে মাটিতে খুঁটি পুঁততে দেখা যায়। এ ধরনের ছাউনীর চারপাশে যখন বেড়া দেয়া হলো, তখনই কুঁড়েঘরের সৃষ্টি হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা প্রথম থেকেই এ ধরনের কুঁড়েঘর বানাতো পারতো— এগুলো আকারে দু-তিনজন থেকে শুরু করে ত্রিশ-চল্লিশজনকে ধারণ করতে পারতো। যাযাবর, শিকারী বা পশুচারকদের পছন্দ তাঁবু, যা তারা যত্রতত্র বহন করতে পারতো। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মত উন্নত উপজাতিরা কাঠের বাড়ি বানাতো। ইরোকুয়িস্‌রা ছাল-বাকলসহ গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ি বানাতো। এদেরকে তিনশ' হাত লম্বা জনপদ বানাতে দেখা গেছে যা বহু পরিবার ধারণ করতে পারতো। শেষপর্যন্ত,

অস্ট্রেলিয়ার আশেপাশের দ্বীপগুলোতে তক্তার তৈরী বাড়ি বানাতে দেখা যায় যা দিয়ে কাঠের বাড়ির পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

সভ্যতার অপরিহার্যতার মধ্যে আরো তিনটি উপাদান তখনো বাকি ছিল— পরিবহন ব্যবস্থা, বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং লেনদেনের মাধ্যম। উড়োজাহাজ থেকে এক কুলী মাথায় করে বোঝা নামাচ্ছে (আশি বছর আগে যখন এই বইটি লেখা হয়, এটি তখনকার সাধারণ কোন দৃশ্য হয়ে থাকবে) এটিই হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থার আদি এবং আধুনিকতম চিত্র। শুরুতে নিশ্চয়ই মানুষ নিজেই তার বোঝা বহন করতো— যদি না সে হতো বিবাহিত; আজকের দিনেও দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলেই মানুষ নিজেই তার গাধা এবং গাড়ি। এরপর সে আবিষ্কার করলো দড়ি, লিভার ও কপিকল। পশুকে বশ মানালো এবং বোঝা বইতে বাধ্য করলো; লম্বা ডালে স্লেজ বানিয়ে তুলে দিলো পশুর কাঁধে; গাছের গুঁড়ি দিয়ে রোলার বানিয়ে স্লেজকে চলতে সাহায্য করলো; গুঁড়িকে প্রস্থচ্ছেদ বরাবর কেটে যন্ত্র-বিশ্বের সবচে' বড় আবিষ্কার- চাকায় রূপ দিলো; স্লেজকে চাকার উপর বসিয়ে বানালো পশুটানা গাড়ি। আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা কখনোই তাদের স্লেজের সাথে চাকা জুড়ে দেবার কথাটা ভাবেনি। বড় গুঁড়িতে খোড়ল কেটে বানালো কান্যু বা ডিঙিনৌকা; কয়েকটি গুঁড়ি জোড়া দিয়ে সাজালো ভেলা। আর নদীপথ হয়ে উঠলো পরিবহনের সবচে' সুবিধাজনক মাধ্যম। মাটিতে চললো প্রথমে এলোমেলো দুর্গম পদচারণ; তারপর পদচিহ্নের অনুসরণে গড়ে উঠলো সরূপথ, তারপর রাজপথ। সে তারা চিনতে শিখলো; আকাশ দেখে চলতে শিখলো; তার কাফেলাকে পাহাড়, মরুভূমি আর অরণ্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলো। প্যাডেল মেরে, বৈঠা বেয়ে কিংবা পাল সাজিয়ে তার নৌকা দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত সাগর পাড়ি দিলো তার প্রিয় সংস্কৃতিকে মহাদেশের সীমানার বাইরে ছড়িয়ে দেবার জন্য। এখানেও লক্ষ্যনীয় যে, মূল সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেছে মানুষ লিখতে শেখার-ও আগে। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের দক্ষতার বন্টনে ভৌগোলিক কোন নিয়ম খাটে না; মানুষের মধ্যে কিছু কিছু গোত্র তাদের বিশেষ প্রতিভার জাগরণে অথবা প্রয়োজনীয় উপাদানটি তাদের আয়ত্তে থাকবার কারণে সে তার সে তার প্রতিবেশীর তুলনায় কম খরচে উৎপাদন করতে পারলো। এসব দ্রব্যাদি তাদের নিজস্ব ব্যবহারের তুলনায় বেশি উৎপাদন হলো এবং উদ্বৃত্তটুকু সে তার পার্শ্ববর্তী গোত্রের সাথে অদল-বদলের চেষ্টা চালালো। আর, এভাবেই বাণিজ্যের সূত্রপাত। কলম্বিয়ার চিব্‌চা ইন্ডিয়ানরা পাথুরে লবণ রপ্তানি করতো কারণ তাদের অঞ্চলে এর আধিক্য ছিলো। বিনিময়ে তারা নিতো শস্যদানা, যেহেতু তাদের অনাবাদী জমিতে তা ফলানো যেতো না। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের কিছু গ্রাম শুধুমাত্র তীরের ফলা বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো; নিউ গিনির কিছু গোত্র শুধু মৃৎশিল্পের কাজ করতো; আফ্রিকার কিছু লোক ছিলো কামার, কেউবা শুধু নৌকা বা বর্শা বানাতো। এ জাতীয় বিশেষজ্ঞদের গোত্র বা গ্রাম, কখনো কখনো বিশেষ কিছু

পরিবার, তাদের শিল্পের ধারায় বিশেষ উপাধী ধারণ করতো, যেমন— স্মিথ, ফিশার, পটার (কামার, জেলে, কুমোর)। উদ্বৃত্তের এ বাণিজ্য প্রথমদিকে উপহার হিসেবেই আদান-প্রদান হতো। আজকের এ হিসাব-সর্বস্য জীবনেও অনেকসময় আমরা দেখতে পাই, একটি বাণিজ্য-চুক্তির আগেভাগে থাকে একটি ভোজন-পর্ব। এর পাশাপাশি যুদ্ধ, ছিনতাই, শ্রদ্ধার্পণ, জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের মধ্য দিয়েও ঘুরে চলেছে লেনদেনের চাকা। ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত বিনিময়-ব্যবস্থা, গড়ে উঠেছে বাজার, ব্যবসালয়; প্রথমে অনিয়মিত, তারপর নির্দিষ্ট সময়ান্তে, তারপর স্থায়ীভাবে— উদ্বৃত্তের সাথে লেনদেন হতো অপ্রতুলতার।

বিরাট একটা সময় জুড়ে বাণিজ্য ছিলো শুধুই বিনিময়; বাণিজ্যকে দ্রুততর করবার জন্য মূল্যমান নির্ধারণী একটি মাধ্যমের ব্যবহার আসতে শত শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোন এক ডাইক্‌কে হয়তো দেখা গেছে, কয়েকদিন ধরে একজন ক্রেতার খোঁজে মৌচাকের মোম হাতে নিয়ে হন্য হয়ে বাজারময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিনিময়ের প্রথমদিককার মাধ্যম বা মুদ্রা ছিলো সার্বজনীন চাহিদার কোন বস্তু; এমন কিছু যা সবারই প্রয়োজন। যেমন- খেঁজুর, লবণ, চামড়া, পশম, অলংকার, বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু এবং অস্ত্রপাতি। এ ধরনের লেনদেন ব্যবস্থায় দুটি ছুরিকে ধরা হতো এক জোড়া মোজার সমান, এ দুটি মিলে হতো একটি কম্বলের সমান, এ তিনটি মিলে হতো একটি বন্দুকের সমান, এ চারটি মিলে আবার একটি ঘোড়ার সমান; এল্‌কের দুটি দাঁতের মূল্য একটি টাট্টুঘোড়ার সমান, আটটি টাট্টুঘোড়ার দাম একজন রমণীর সমান। এমন জিনিস কমই আছে যা কখনো করো বা কারো হাতে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি: শিমের বীচি, বড়শির কাঁটা, ঝিনুক, মুক্তা, পুঁতি, কোকোয়ার বীজ, গোলমরিচ এবং পরবর্তীতে ভেড়া, শূকর, গরু বা দাসী। শিকারী বা পশুপালকদের কাছে গবাদিপশু ছিলো এক সুবিধাজনক মুদ্রা। এ মুদ্রা প্রজননের ফলে সুদে-আসলে বাড়তো। এরা বহনে সহজতর। হোমারের সময়েও মানুষ এবং সকল বস্তুর মূল্য গবাদিপশুর বিপরীতে বিচার হতো : ডিওমিডিসের বর্মখানির মূল্য ছিলো চারটি পশুর সমান। রোমানরা গবাদিপশু এবং পয়সার জন্য একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতো- পিকাস আর পিকুনিয়া- তাদের প্রথম দিককার পয়সার উপর একটি ষাঁড়ের ছবি আঁকা হয়েছিলো। ইংরেজি Capital (পুঁজি), Chattel (অস্থাবর সম্পত্তি) এবং Cattle (গবাদি পশু) শব্দগুলো ফরাসী শব্দ এবং তারও আগে ল্যাটিন Capitale শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সম্পত্তি। এই Capitale শব্দটি আবার Caput শব্দ থেকে আগত যার অর্থ মাথা (গবাদি পশুর)। যখন খনি থেকে ধাতুর উত্তোলন শুরু হলো, তখন অন্যান্য মুদ্রার চল উঠে গেলো। তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এবং শেষমেষ তার ওজন ও মূল্যের অধিক বিভেদের কারণে সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রচলন হলো। এতে অধিক টাকা স্বল্প পরিসরে রাখা যেত। প্রতীকী বস্তু থেকে ধাতব মুদ্রায় প্রবর্তনের ব্যাপারটা সম্ভবত আদিম মানুষের কীর্তি নয়, মুদ্রার আবিষ্কার বা কৃতিত্বটা সভ্য সমাজের পাওনা। এর ফলে উদ্বৃত্তের বহুল লেনদেন এবং তারই সাথে আরাম-আয়েশ এবং সম্পদের বর্ধনের কৃতিত্বটাও সভ্য মানুষের প্রাপ্য।

৩. অর্থনৈতিক সংগঠন

আদিম সাম্যবাদ- এর বিলুপ্তির কারণ- ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎস- দাসত্ব- শ্রেণী

আদিম বিশ্বে বাণিজ্যের হাত ধরেই বিশৃঙ্খলার আগমন ঘটে। কারণ এর আগে লাভ-ক্ষতি, সম্পদ কিংবা শাসনের প্রশ্নই আসেনি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পদ সীমাবদ্ধ ছিলো মানুষের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতে। সম্পদের ধারণাটি তার ব্যবহার্য বস্তুর সাথে এতো শক্তভাবে জুড়ে ছিলো যে, মৃত্যুর পর তা তার সাথে কবর দিয়ে দেয়া হতো— এমনকি তার স্ত্রীকেও; আর অব্যবহার্য জিনিসের ব্যপারে সম্পদের ধারণা এতটাই দুর্বল ছিলো যে, এটি অন্যেরা সহজে মেনে নিতো না এবং বারংবার সেটিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হতো। আদিম মানুষের ক্ষেত্রে, প্রায় সকল অঞ্চলেই জমি ছিলো সমাজের বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান, পেরুর অধিবাসী, ভারতের চট্টগ্রামের পাহাড়ি উপজাতি, বোর্ণিওবাসী এবং দক্ষিণ সাগরের দ্বীপবাসীদেরকে দেখা যায় জমির মালিকানা সকলে মিলে ভোগ করতে, চাষাবাদ করতে এবং গাছের ফল বা শস্য সবার মাঝে ভাগ হতে। "জমি" ওমাহা ইন্ডিয়ানের ভাষায়,"পানি বা বায়ুর মত— এটি বিক্রি হয় না।" সামোয়াতে শ্বেতাঙ্গদের আগমনের পূর্বে জমি কেনা-বেচার ধারনাটিই ছিলো না। অধ্যাপক রিভারস্ দেখেছিলেন, মেলানেশিয়া এবং পলিনেশিয়ায় তখনও সাম্যবাদ বিরাজ করতো, যা আভ্যন্তরীণ লাইবেরিয়ায় আজও বিরাজ করে।

খাদ্যের ব্যপারেও সাম্যবাদ বজায় ছিলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের পরিসরে। আদিমদের মধ্যে প্রথা ছিলো যে, যার কাছে খাদ্য আছে তাকে অবশ্যই তা খাদ্যহীনের সাথে ভাগ করে নিতে হবে; কোন পর্যটক তার যাত্রাপথে যে বাড়িতেই দাঁড়ান না কেন, তাকে খাওয়াতে হবে; খরাক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে তার প্রতিবেশীদের লালন-পালন করতে হবে। বনের মধ্যেও কেউ যদি খেতে বসতো, একা খেতে শুরু করবার আগে সে চিৎকার করে ডাক দিতো যদি ক্ষুধার্ত কেউ আশেপাশে থাকে এবং শুনতে পায়। টার্নার যখন সামোয়ার এক লোককে লন্ডনের দরিদ্রের সম্বন্ধে বলছিলো, সে লোক বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলো,"এটা কিভাবে হয়? কোন খাবার নেই! কোন বন্ধুও কি নেই? থাকবার বাড়ি নেই! সে জন্মেছে যেখানটায় সেখানেও নেই? সেখানে তার বন্ধুদেরও কি একটা বাড়ি নেই?" ক্ষুধার্ত ইন্ডিয়ানদের শুধু চাইতে হতো, খাবারটুকু যত অল্পই হোক, তাকে কিছুটা অংশ দিতেই হতো।" যতক্ষণ গ্রামের কোথাও ভুট্টা আছে, ততক্ষণ কেন কেউ খাবার পাবে না?" হটেনটট্‌দের মধ্যে রীতি চালু ছিলো, যার বেশি আছে তার বাড়তিটুকু ভাগ হতো যতক্ষণ না সকলেই সমান পরিমাণে পায়। শ্বেতাঙ্গ পর্যটকেরা দেখেছে, সভ্যতায় প্রবেশের পূর্বে আফ্রিকার লোকদের কোন উপহার দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তা বিলি-বন্টন হয়ে যেতো; একজন হয়তো একটি কালো স্যুট উপহার দিয়েছেন, কিছুক্ষণ পর তিনি দেখতেন যাকে তিনি দিয়েছেন তার মাথায় হ্যাট, তার এক বন্ধুর পরনে প্যান্ট, আরেকজনের গায়ে কোট। শিকারের উপর এস্কিমো

শিকারীদের ব্যক্তিগত কোন অধিকার ছিলো না; এটি পুরো গ্রামে ভাগাভাগি হতো; সকল যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার ছিলো সকলের এজমালি সম্পত্তি। ক্যাপ্টেন কার্ভের উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে বলেছেন,"গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তির সাথে এরা পরিচিত নয়... অন্যের ব্যপারে বড্ড উদার, কারো কিছু ঘাটতি থাকলে তা নিজের উদ্বৃত্ত থেকে পূরণ করে দেয়।" "যেটা খুবই বিস্ময়কর" এক মিশনারীর মতে, "এরা একে অপরের সাথে অতি ভদ্র এবং বিবেচকের মত আচরণ করে যা সভ্য সমাজের বেশিরভাগ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'আমার' এবং 'তোমার' শব্দগুলো, সেইন্ট ক্রিসোস্টমের ভাষায় যা আমাদের হৃদয় থেকে সহমর্মিতা মুছে দিয়েছে এবং লোভের জাগরণ ঘটিয়েছে, তা এসব আদিম মানুষের কাছে এখনও অজানা।" "আমি তাদের দেখেছি" আরেকজন পর্যবেক্ষক বলেছেন, "দল অনেক ভারী হলেও শিকার তারা ভাগাভাগি করে খায়— কখনোই অসমান ভাগাভাগি কিংবা বন্টনের সমস্যা নিয়ে কলহ বাঁধতে দেখিনি আমি। দুস্থকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এমন অপবাদ শোনার চে' সে বরং খালি পেটে শুয়ে থাকবে... এরা নিজেদের এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন তারা এক বিরাট পরিবার।"

আমাদের প্রিয় সভ্যতা, যা কিছুটা হলেও পক্ষপাতদুষ্ট, তাতে উন্নীত হবার পর কেন এই আদিম সাম্যবাদ বিদায় নিল? সামনার বিশ্বাস করেন যে, এমন সাম্যবাদ অবৈজ্ঞানিক— জীব-কূলের অস্তিত্বের যুদ্ধে এ এক প্রতিবন্ধকতা। এতে আবিষ্কার, শিল্প বা সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। যোগ্যতাকে পুরস্কার দেয়া না হলে, দুর্বলতাকে শাস্তি না দিলে মানুষের দক্ষতা লোপ পায়, ক্রমবিকাশ বা অপর গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটে। লস্‌কিল উত্তর-পূর্ব অংশে এমন সব ইন্ডিয়ানদের দেখেছেন যারা এতোটাই অলস যে নিজেরা কোন শস্য ফলায় না বরং অন্যেরা তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, এ আশায় বসে থাকে। কর্মঠরা যেহেতু তাদের বেশি পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে না, তাই বছর বছর তারা কম গাছ লাগাতে শুরু করলো। ডারউইনের মতে, ফুয়েজিয়ানদের এই নির্ভুল সাম্যবাদ তাদের জন্য এতোটাই ক্ষতিকর ছিলো যে, তাদের পক্ষে কখনোই সভ্য হওয়া সম্ভব ছিল না। অথবা, ফুয়েজিয়ানরা হয়তো ব্যপারটা এভাবে দেখতো যে, সভ্যতা হবে তাদের সাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আদিম সমাজের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্ঘটনা, রোগশোকের কবল থেকে যারা বেঁচে যেতো, তাদের জন্য এ সাম্যবাদ কিছুটা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলো; কিন্তু সেটি কখনোই তাদেরকে সেই দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে পারেনি। ব্যক্তিসত্ত্বার উপলব্ধির কারণেই সম্পদ এসেছে, যদিও সে আমদানি করেছে নিরাপত্তাহীনতা এবং দাসত্বের। এতে যোগ্যতর ব্যক্তিদের সুপ্ত ক্ষমতাটুকু জেগে উঠেছে, কিন্তু জীবনযুদ্ধে প্রতিযোগিতার তীব্রতা বেড়েছে। দারিদ্র্যকে তখন থেকেই বিস্বাদ মনে হয়েছে কারণ সাম্যের সময়ে সে কাউকে ভোগায়নি।

সভ্যতার শুরুতেই সাধারণত— সাম্যবাদের জন্ম নেবার একটি কারণ হচ্ছে, অভাব-অনটনের সময় যখন ক্ষুধা একটি সার্বজনীন সমস্যা, তখনই ব্যক্তি

গোষ্ঠীবদ্ধ হতে চায় এবং তখনই এটি সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে। তারপর যখন প্রাচুর্য্যের আগমন ঘটে, সামাজিক বন্ধন তখন শিথিল হয়ে পড়ে; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য জেগে ওঠে; বিলাসের যেখানে শুরু, সেখানেই সাম্যবাদের শেষ। জীবন যখন কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে এবং শ্রম-বন্টনের কারণে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পেশায় বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন এটা খুবই অস্বাভাবিক যে, সবার কর্ম তার গোত্রের জন্য সমান ভূমিকা রাখতে পারবে; নিঃসন্দেহে যে সমাজের অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকবে, সে লাভের বেশি অংশ ভোগ করতে চাইবে। যে কোন বর্ধিষ্ণু সভ্যতাই বর্ধিষ্ণু অসমতার এক দৃশ্য। দক্ষতার ভেদাভেদ যা প্রাকৃতিকভাবে বা জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়, সেটাই ধীরে ধীরে সম্পদ এবং ক্ষমতার মত কৃত্রিম ভেদাভেদের জন্ম দেয়। কোন আইন বা স্বৈরশাসকের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ অসমতার নিষ্পত্তি যদি না হয়, তাহলে তা বাড়তে বাড়তে একসময় বিস্ফোরণ ঘটে যখন দরিদ্রের আর হারানোর মত কিছুই বাকি থাকে না এবং বিপ্লব, বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে সমাজ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

সমান এবং সহজতর জীবনের আশায়, সাম্যবাদ প্রতিটি আধুনিক সমাজেই অতীতের এক মোহময় স্বপ্ন হয়ে বেঁচে থাকে; কাজেই অসমতা বা অনিশ্চয়তা যখনই মানুষের সহ্য সীমাকে ছাড়িয়ে যায়, সে তখন পূর্বের স্তরেই ফিরে যেতে চায়— যার সমতার কথাটাই তার মনে থাকে, দারিদ্র্যের অংশটুকু সে ভুলে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে জমি তার নিজের পুনর্বিন্যাস ঘটায়, সে আইনত-ই হোক কিংবা রোমের গ্রাচ্চি, ফ্রান্সের জেকোবিন্‌স্ কিংবা রাশিয়ার সাম্যবাদীদের মাধ্যমে অন্য উপায়েই হোক। নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে সম্পদও পুনর্বিন্যস্ত হয়; হয়তো সম্পদ বাজেয়াপ্ত হবার মধ্য দিয়ে অথবা আয়ের উপর করারোপ কিংবা দলিল করে বাধ্যতামূলক দানের মাধ্যমে। তারপর পণ্য, সম্পদ বা ক্ষমতা কুক্ষীকরণের দৌড় আবার প্রথম থেকে শুরু হয়; ক্ষমতার পিরামিড আবার তার স্বরূপে ফিরে আসে; যে রকম আইন-ই করা হোক না কেন ক্ষমতাবানেরা কোন না পন্থায় ভালো জমি বা ভালো ভূখণ্ডের দখল নেয়, সিংহভাগ করায়ত্ত করে বসে। সহসাই সে আবার রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের দখল নেয়, আইনের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, এবং সময়ে অসমতার সেই একই মহান চিত্র আবার ফুটে ওঠে। এভাবে দেখা হলে, মানুষের পুরো অর্থনৈতিক ইতিহাসটাই আসলে তার সামাজিক সংগঠনের এক মন্থর হৃদস্পন্দন বা প্রতিফলন; প্রাকৃতিকভাবে আহরিত সম্পদ এবং সহজাত বিপ্লবের হৃদ-সংকোচন এবং প্রসারণ।

যে সমাজে মানুষ সবসময়ই যাযাবর এবং সবসময়ই বিপদ বা অভাবের সম্মুখীন, সেখানেই সাম্যবাদের টিকে থাকাটা সহজ। শিকারী এবং পশুচারকদের জমির ব্যক্তিগত মালিকানার কোন প্রয়োজনই ছিলো না। কিন্তু যখনই মানুষ চাষাবাদের হাত ধরে বসতি স্থাপন করলো, তখনই এটা অনুধাবন করা গেলো যে, অধিক চাষাবাদে তখনই লাভ যখন ফসল শুধুমাত্র তার জমির মালিকের কাছে পৌছায়। ফলস্বরূপ, প্রতিষ্ঠান কিংবা ভাবনা, জাতি কিংবা গোত্রের ভেতরেও

যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচনের সূত্রটি কর্মরত, তাই শিকার থেকে চাষাবাদে উত্তরণের কারণেই গোত্রগত সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পদের ভাবনা এলো। উৎপাদনের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে উঠে আসলো মালিকানা পদ্ধতি। পরিবার যেহেতু ধীরে ধীরে পিতৃতান্ত্রিক হয়ে উঠছিলো এবং সকল কর্তৃত্ব কুক্ষিগত ছিলো বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের হাতে, সম্পত্তি-ও ধীরে ধীরে ব্যক্তিকরণের শিকার হতে লাগলো; ব্যক্তিগত আহরণ বাড়তে লাগলো। বনজঙ্গল বা জলা-জায়গা থেকে পরিশ্রম দিয়ে তার জমি আলাদা করলো, দাবী বসালো এবং অধিকারের সাথে তা আগলে রাখলো। শেষে সমাজ-ও তার অধিকার মেনে নিলো এবং ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পাশাপাশি নতুন এক ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব হলো। জনসংখ্যার বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরোনো জমিগুলো যখন অনাবাদী হয়ে উঠলো, তখন জমির অভাব দেখা দিলো এবং জমি বে-দখলের চেষ্টাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একপর্যায়ে, সংগঠিত কিছু সমাজ ব্যবস্থায়, ব্যক্তি মালিকানার বিধান-ই প্রতিষ্ঠা পেলো। মুদ্রার প্রচলনের ফলে ব্যাক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির বৃদ্ধি, তার হাত-বদল সহজতর হলো। পুরোনো আঞ্চলিক ধারা বা নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতেই সমাজ কিংবা রাজাদের হাতে মালিকানার সংজ্ঞা বা শর্তাবলী সময়ের সাথে পাল্টালো; জমির পুনর্বন্টন হলো বারংবার। নতুন এবং পুরোনো নিয়মের মাঝে বেশ কিছুদিন দোদুল্যমান থাকার পর অবশেষে আদিম অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার মূলে ব্যক্তি মালিকানার স্থান হলো।

চাষাবাদ, সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ই জন্ম দেয়নি, দাসত্বের-ও জন্ম দিয়েছে। খাঁটি শিকারী-সমাজে দাসত্বের ধারণাটিই ছিলো না; শিকারীর স্ত্রী পুত্ররাই তার ভৃত্যের কাজগুলো করে দিতো। পুরুষের জীবন পালা বদলাতো শিকার বা যুদ্ধের উত্তেজনায় এবং শ্রান্তি বা অবসরের আবর্তে। আদিম মানুষদের চরিত্রে একধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলসতা লক্ষ্য করা যায়, যা সম্ভবত শিকারের পেছনে ছোটা বা যুদ্ধের ক্লান্তিকর অবসাদ বা তার পূর্ব-প্রস্তুতি; এটি ততটা বিশ্রামের অলসতা নয়। এ ধরনের অনিয়মিত পরিশ্রমের জীবন ছেড়ে চাষাবাদের বাধা জীবনে রূপান্তরিত হতে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন ছিলো; কৃষিকাজের রুটিন আর শ্রম-সংগঠন।

নিজেদের জন্য কাজ করে যেসব সংগঠন, তার ব্যবস্থাপনার ব্যপারটি থাকে শিথিল এবং আত্ম-প্রণোদিত; অন্যের কাজ করা সংগঠনগুলো, চূড়ান্ত বিচারে, চলে বল প্রয়োগে। চাষাবাদের আবির্ভাব এবং মানুষের মাঝে অসমতা সৃষ্টি হবার ফলে সামাজিকভাবে সবল মানুষের কাজে নিযুক্ত হতে লাগলো সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষ; তার আগে যুদ্ধে বিজয়িরা কখনো অনুধাবন করেনি যে, জীবিত বন্দি-ই ভালো যুদ্ধবন্দি। নরভক্ষণ এবং কসাইখানার সংখ্যা কমতে লাগলো; দাসত্বের বৃদ্ধি ঘটলো। নরহত্যা বা নরভক্ষণের পথ ছেড়ে দাসত্বের চর্চাটি ছিলো এক বিরাট নৈতিক উত্তরণ। একই ধরনের এক উন্নয়নের, তা যদিও বড় মাপের, দেখা মেলে আজকের বিশ্বে দেশ দখলের পর তাদের হত্যার পরিবর্তে ইনডেমনিটি চুক্তির

মধ্যে। দাসত্ব যখন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পেলো এবং লাভজনক বলে প্রমাণিত হলো, তখন চুক্তিভঙ্গকারী ঋণগ্রহীতা কিংবা দুর্দমনীয় সন্ত্রাসীদের দাস বানানো এবং দাসের খোঁজে ক্ষমতাবানদের ঝটিকা-হামলার চল শুরু হলো। যুদ্ধের ফলে দাসত্বের সুবিধা হলো, দাসত্বের ফলে যুদ্ধ উপকৃত হলো।

হাজারো বছরের দাসত্বের ফলেই মানবজাতি শুল্ক দেয়ার অভ্যাস বা রীতি রপ্ত করেছে। আমরা কেউ কোন কঠিন কাজ করতে চাই না যদি তা কোনরকম শারিরীক, আর্থিক বা সামাজিক দণ্ড ছাড়া পাশ কাটানো যায়। দাসত্বকে একটি নিয়ম হিসেবে মেনে নেবার মাধ্যমে মানুষ শ্রমশিল্পের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। দাসত্ব আসলে, পরোক্ষভাবে, সভ্যতার পথে মানবজাতিকে এগিয়ে দিয়েছে; এতে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে— কিছু লোকের জন্যে— অবকাশের সুযোগ তৈরি করেছে। কিছুদিন পর মানুষ এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; অ্যারিস্টেটল বিশ্বাস করতেন যে, দাসত্ব প্রাকৃতিক এবং অনিবার্য, সেইন্ট পল চার্চ থেকে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যা তাঁর সময়ে হয়তো স্বর্গীয় এক বিধানের মতই শুনিয়েছিলো।

ধীরে ধীরে চাষাবাদ এবং দাসত্বের মধ্য দিয়ে, মানুষের অন্তর্গত বৈচিত্র্য এবং শ্রমের ভেদাভেদের কারণে আদিম সমাজের তুলনামূলক সমতা প্রতিস্থাপিত হচ্ছিল এবং প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিলো শ্রেণীভেদ। আদিম সমাজে, নিশ্চিতভাবে, দাস এবং মুক্ত বলে কোন ভিন্নতা ছিলো না, ভূমিদাসপ্রথা কিংবা কোন জাতিপ্রথা ছিলো না, নেতা এবং অনুসারী থাকলেও তাদের মধ্যে তফাৎ ছিলো সামান্যই। যন্ত্রপাতি এবং ব্যবসার উন্নতির ফলে দুর্বল এবং অদক্ষরা ধীরে ধীরে সবলের প্রজা হয়ে উঠছিলো। যে কোন নতুন আবিষ্কারই ছিলো সবলের হাতে নতুন এক অস্ত্র, দুর্বলকে ব্যবহার করার নতুন এক কায়দা। (কাজেই আজ আবিষ্কারের যে মিসিসিপি বহমান, যাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলি, তা আসলে মানুষের প্রাকৃতিক অসমতাকে আরো তীব্রতর করেছে।) বংশ পরম্পরায় ভালো সুযোগগুলো উপরস্থ মানুষের হাতেই থেকে গেছে এবং এক সময়কার সুষম সমাজ এভাবে শ্রেণী বা জাতের স্তরে ভাগ হয়ে পড়েছে। ধনী, দরিদ্র উভয়েই সম্পদ ও দারিদ্র্যের ভিন্নতার ব্যপারে সচেতন হয়ে উঠেছিলো; শিরায় শিরায় বহমান রক্তধারার মত ইতিহাস জুড়ে শ্রেণীযুদ্ধের শুরু হলো। শ্রেণীশাসন, সম্পদের সুরক্ষা, যুদ্ধের আয়োজন এবং শান্তির সংগঠনের জন্য রাষ্ট্র এক অপরিহার্য বিষয় রূপে প্রতিষ্ঠা পেল।

তৃতীয় অধ্যায়
সভ্যতার রাজনৈতিক উপাদান

১. শাসনের উৎস

মানুষের অসামাজিক প্রকৃতি - আদিম নৈরাজ্যবাদ- বংশ এবং জাতি - রাজা - যুদ্ধ

মানুষ স্বেচ্ছায় আইনানুগ জীবনযাপন করে না। পুরুষ যতটা না আগ্রহের কারণে গোত্রবদ্ধ থাকে, তারচে' বেশি থাকে অভ্যাস, অনুকরণ কিংবা পরিস্থিতির চাপের কারণে। সমাজকে সে ততোটা ভালোবাসে না, যতোটা নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে। সে অন্যের সাথে যোগ দেয় কারণ একাকীত্ব তার জীবনকে বিপদজনক করে তোলে এবং এমন বহু কাজ আছে যা অনেকে মিলে সহজে করা যায়; অন্তরে সে নিঃসঙ্গ, একক এক ব্যক্তি, সর্বদা এ পৃথিবীর সঙ্গে যুয্যমান। সকলেই যদি তার নিজের পথ বেছে নিতো, তাহলে কখনোই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো না। এমনকি আজও সে রাষ্ট্রের উপর সন্তুষ্ট নয়, এখনও সে মৃত্যুকে করের পাশে তুলনা করে, সেই শাসনকে স্বাগত জানায় সে কম শাসন করে। কেউ কেউ যে অধিক আইনের পক্ষপাতী, তা আসলে এ কারণে যে সে নিশ্চিৎ, তার প্রতিবেশীর জন্য তা প্রয়োজন; সকল মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নৈরাজ্যবাদী এবং তার জন্য সব আইনকেই অতিরিক্ত বলে মনে করে।

শাসনের ব্যপারটি সরল সমাজগুলোতে ছিলো না বললেই চলে। শিকারী উপজাতিরা শুধুমাত্র তখনই আইন মানতে রাজী হয় যখন তারা বড় কোন শিকারের জন্য গোত্রবদ্ধ আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। বুশম্যানদের সমাজ পরিবার পর্যন্তই, আফ্রিকার পিগমী, অস্ট্রেলিয়ার সরল উপজাতিগুলো সাময়িক রাজনৈতিক সংগঠনে রাজী হয় এবং কাজ শেষে আবার পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ে; তাসমেনিয়দের কোন নেতা, আইন বা শাসনব্যবস্থা ছিলো না; সিলনের ভেয়দাদের পরিবারভিত্তিক ছোটখাট দল ছিলো, কিন্তু বড় কোন শাসনব্যবস্থা ছিলো না; সুমাত্রা দ্বীপের কুবুরা "কর্তাব্যক্তি ছাড়াই বেঁচে আছে", পরিবারই তার শাসক; ফুয়েজিয়ানদের দল কালেভদ্রে বারোজনের চে' বড় হয়; টুঙ্গুরা দশ-বারোটি তাঁবুর দল গঠন করে; অস্ট্রেলিয়ার 'হোর্ডরা কদাচিৎ ষাটজনের বেশি নিয়ে দল গড়ে। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিকারের মত বিশেষ উদ্দেশ্যে সংসর্গ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সৃষ্টি হয়; এরা কোন স্থায়ী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে না।

সর্বপ্রথম সামাজিক সংগঠন হলো বংশ— বংশ-পরম্পরায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিবার, যারা একই ভূমির উপর নির্ভরশীল, একই দেবতা বা একই রীতিনীতিতে বিশ্বাসী। যখন কয়েকটি বংশের লোক একই নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হলো তখন একটি গোত্রের সৃষ্টি হলো, যা রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পথে দ্বিতীয় ধাপ। কিন্তু এটি ছিলো অতি মন্থর এক প্রক্রিয়া; অনেক গোত্রের কোন নেতাই নেই, আর অনেক গোত্রকে দেখা যায় শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়ে নেতার স্বীকৃতি দিতে। যদিও গণতন্ত্র আমাদের বর্তমান সমাজে মুকুটের একটি পালক হিসেবে পরিচিত, কিন্তু আদিম সমাজের চিত্র ভিন্ন— পরিবারের কর্তা কিংবা বংশের মুরুব্বী-ই তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব- বাইরের কারো কর্তৃত্ব তারা মেনে নিতো না। ইরোকুয়িস কিংবা দেলাওয়ার ইন্ডিয়ানরা কোন আইন অথবা বংশের বাইরে কোন নিয়ন্ত্রককে মেনে নেয় না; তাদের নেতাদের ক্ষমতাও সামান্য, গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠরা যে কোন সময় এ ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন। ওমাহা ইন্ডিয়ানরা সাতজনের এক কাউন্সিল দিয়ে পরিচালিত হয়, তার মিটিং চালিয়ে যায় যতক্ষণ না একটি একক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; এর সাথে বলা যেতে পারে ইরোকুয়িসদের বিখ্যাত লীগের কথা যেখানে বহুসংখ্যক গোত্র একীভূত হয়েছিলো- সংঘের প্রতি পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলো— এবং শান্তি নিশ্চিৎ করতে পেরেছিলো। অনেকে আদিম এ অসভ্য জাতের সাথে লীগ অব্ নেশন্স্ গঠন করা আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ দেখেন না।

যুদ্ধ-ই নেতা, রাজা বা রাষ্ট্রের গঠন করেছে— যেমনভাবে এটাও সত্যি যে, এগুলোই যুদ্ধের স্রষ্টা। সামোয়াতে যুদ্ধের সময় নেতার ক্ষমতা থাকতো, কিন্তু অন্যসময় কেউই তার দিকে খুব একটা মনোযোগ দিতো না। ডাইকদের মধ্যে পরিবারের কর্তা ছাড়া অন্য কোন শাসন ব্যবস্থা ছিলো না; যুদ্ধের সময় তার সবচে' সাহসী যোদ্ধাকে নির্বাচন করতো নেতৃত্ব দেবার জন্য। অক্ষরে অক্ষরে তার কথা পালন করতো; যুদ্ধ থেমে গেলে তাকে আক্ষরিক অর্থে আবার তার কাজে পাঠিয়ে দেয়া হতো। শান্তির সময় ক্ষমতার বেশিরভাগ থাকতো পুরোহিত কিংবা প্রধান যাদুকরের হাতে। তারপর যখন বেশিরভাগ গোত্রেই রাজার শাসন-প্রথা চালু হলো, সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা ধর্ম-যাজক থেকেই রাজার নির্বাচন হলো অথবা সবার মিলিত শাসন শুরু হলো। সমাজ আসলে দু'ভাবে শাসিত হয়েছে: শান্তির সময় কথা দিয়ে এবং গন্ডগোলের সময় তলোয়ার দিয়ে; কথায় ব্যর্থ হলেই বলের প্রয়োগ হয়। কখনো আইন, কখনো সংস্কার কিংবা উভয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে মানবজাতির পুরো জীবন; আজকের আগে কোন রাষ্ট্রই এদের আলাদা করার সাহস দেখায়নি এবং কোন একদিন হয়তো আবার এরা মিলিত হয়ে পড়বে।

যুদ্ধ কি করে রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে? এমন নয় যে, মানুষ আদতেই যুদ্ধবাজ। নীচুস্তরের কিছু মানুষ বেশ শান্তিপ্রিয়, এস্কিমোরা ভাবতেই পারতো না কেন একই শান্তিপূর্ণ বিশ্বাসে বিশ্বাসী ইউরোপীয়রা সীল হত্যার মত নিজেদের হত্যা করবে

এবং এক অন্যের জমি দখল করবে। "কেমন হতো" তাদের বিস্মিত বহিঃপ্রকাশ,"যদি তোমার ভূমি বরফ দিয়ে ঢাকা থাকতো! তোমার ভূমি, যাতে সোনা ও রূপা আছে, যার জন্য তোমার খ্রীস্টানদের এতো লোভ, তা যদি বরফের এত উঁচু পাহাড় দিয়ে ঢাকা থাকতো যে তোমরা তার দেখাই পেতে না, তাহলে কেমন হতো! তোমাদের চোখে যা বিফলতা, তা-ই আমাদের শান্তি, তা-ই আমাদেরকে নিগৃহীত হওয়া থেকে বাঁচায়।" তারপরও, আদিম সমাজে অবিরাম যুদ্ধ লেগে ছিলো। শিকারীরা শিকারে ভরপুর ভালো বনের দখল নিয়ে, পশুচারকেরা ভালো ঘাসের জন্য, কৃষকেরা কুমারী মাটির জন্য, সময়ে সময়ে খুনের বদলা নিতে, নবীনদের আইনানুগ বানাতে বা বাধ্য করতে, জীবনের একঘেয়েমি দূর করতে, লুণ্ঠন কিংবা ধর্ষণের প্রতিবাদ হিসেবে এবং কালেভাদ্রে ধর্মের নামে যুদ্ধ করতো সবাই। যদিও নরহত্যা কমানোর লক্ষ্যে কিছু রীতিনীতি চালু ছিলো— যেমনটা আমাদের মধ্যেও চালু আছে- কিছু কিছু দিন বা মাস বা প্রহর আছে যখন কোন ভদ্রলোক পশু জবাই করে না— কিছু নিয়ম-কানুন ছিলো অলংঘনীয়, কিছু রাস্তা ছিলো নিরপেক্ষ, কিছু বাজার বা অঞ্চল কলহমুক্ত; ইরোকুয়িসদের লীগ তিনশ' বছরের জন্য 'যারপরনাই শান্তি' নিশ্চিৎ করেছিলো। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদিম গোত্র বা দলদের মধ্যে নির্বাচনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে যুদ্ধই ছিলো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

যুদ্ধের ফলাফল ছিলো অন্তহীন। দুর্বলকে বিলীন করে দেবার জন্য এটি এক নির্দয় নিষ্কাশক হিসেবে কাজ করেছে এবং সাহসে, গন্ডগোলে, হিংস্রতায়, বুদ্ধিতে, দক্ষতায় একটি জাতিকে উঁচু স্তরে নিয়ে গেছে। এতে আবিষ্কারের মন উদ্দীপ্ত হয়েছে, এমন অস্ত্র বানানো হয়েছে যা পরে উপকারী যন্ত্রপাতিতে রূপ নিয়েছে, যুদ্ধের কৌশল পরে শান্তির কৌশলে পরিণত হয়েছে। (কত রেললাইন যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়েছে এবং এখন ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে।) সর্বোপরি, যুদ্ধের ফলেই আদিম সাম্যবাদ এবং নৈরাজ্যবাদ লোপ পেয়েছে, সংগঠন এবং আইনকানুনের সূত্রপাত হয়েছে; বন্দীদের দাস বানানোর প্রথা এসেছে, শ্রেণীশোষণ শুরু হয়েছে, শাসনব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। সম্পত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের মাতা আর যুদ্ধ হচ্ছে পিতা।

২. রাষ্ট্র

বল প্রয়োগকারী সংগঠন হিসেবে - গ্রাম সমাজ- রাষ্ট্রের মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান

"সাদা চুলের একদল পশু," নিট্‌ঝ্‌কে বলেন, "দখলবাজ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ একটি জাত, যখন তার সংগঠনের ক্ষমতা এবং যুদ্ধবিদ্যা দিয়ে সংখ্যায় বড় কিন্তু অসংগঠিত একটি জাতকে ছোঁ মেরে লুফে নেয়.. তেমনভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।" গোত্রগত সংগঠন থেকে রাষ্ট্রের ভিন্নতা" লেস্‌টার ওয়ার্ড বলেন, "সেখানেই যখন এক জাতি আরেক জাতির উপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করে।" "সর্বত্র" ওপেন হাইমার বলেন,"আমরা দেখতে পাই, একটি যুদ্ধবাজ গোত্র আরেকটি কম যুদ্ধবাজ গোত্রের সীমানা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে, আভিজাত্যের সাথে বসতি স্থাপন করে এবং একটি

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে।" "সহিংসতাই" রাজেন্‌হফার বলেন,"হচ্ছে সেই মাধ্যম যা গঠন করেছে রাষ্ট্রের।" গুমপ্লোউইক্‌জের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে দখলের ফল, পরাস্তের উপর বিজয়ীর স্থাপনা। "রাষ্ট্র" সামনার বলেন, "বলের ফল, টিকেও থাকে বলের দ্বারা।"

সাধারণত একদল শিকারী বা পশুচারকের হাতে এক চাষাবাদ-নির্ভর জাত এই দখলদারিত্বের শিকার হয়ে থাকে। কারণ, চাষাবাদ মানুষকে শান্তির পথে চলতে শেখায়, গতানুগতিক এক জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে, লম্বা দিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত করে তোলে; এ ধরনের মানুষেরা সম্পদ জমা করে, কিন্তু যুদ্ধের কৌশল বা অনুভূতি ভুলে বসে। শিকারী বা পশুচারকেরা বিপদে অভ্যস্ত, হত্যায় দক্ষ, যুদ্ধ তাদের কাছে পশু ধাওয়া করার মতই একটি ব্যাপার এবং তা কদাচিৎ বেশি কষ্টের; বনে যখন শিকার কমে যায়, রোগের কারণে পশুর পাল গুটিয়ে আসে, তারা তখন ঈর্ষায় তাকায় মাঠের ভরা ফসলের দিকে, খুঁজে-পেতে আক্রমণের জন্য গ্রহণযোগ্য একটা যুক্তি দাঁড় করায়, হানা দেয়, দখল করে, দাস বানিয়ে শাসন করে।

এ মতবাদ শুধুমাত্র আদিম সমাজের জন্যই প্রযোজ্য, কারণ পরবর্তীতে হিসাবটুকু আরো জটিল হয়ে ওঠে আরো কয়েকটি উপাদান— বৃহত্তর সম্পদ, ভালো অস্ত্র, উন্নত বুদ্ধিমত্তা- এরাও এ বিষয়ে প্রভাব ফেলে। তাই মিশর শুধু হিক্‌সস্‌, ইথিওপিয়া, আরব বা তুর্কীদের মত নোমাডদের হাতেই দখল হয়নি, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম এবং ইংরেজদের মত প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার হাতেও দখল হয়েছে— যদিও এসব উন্নত জাতি দখলটা করেছে সাম্রাজ্যবাদের নেশায় শিকারী বা বেদের মত হয়ে যাবার পর।

রাষ্ট্রের ধারণা এসেছে অনেক পরে, লিখিত ইতিহাসের সামান্য কিছুকাল পূর্বে। কারণ রাষ্ট্র আসার আগে সামাজিক সংগঠনের সূত্রে একটি পরিবর্তন আসা প্রয়োজন ছিলো— আত্মীয়তা থেকে কর্তৃত্বনির্ভর শাসন; এবং আদিম সমাজে প্রথমটাই ছিলো বিধান। কর্তৃত্ব সেখানেই সবচে' ভালো খাটে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে ভিন্ন দুটি গোত্রকে এক করে একটি কার্যকরী সংঘে রূপান্তরিত করা হয়। তারপরও এমন দখল দীর্ঘস্থায়ী হয় না যদি না নতুন কৌশল বা অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারে প্রজাদের আন্দোলন দমন করে রাখা যায়। স্থায়ী দখলদারিত্বের ক্ষেত্রগুলোতে দেখা যাবে, দমনের বিষয়টি এক পর্যায়ে অবদমিতের দৃষ্টিসীমা বা চেতনা থেকে হারিয়ে যায়; যে ফ্রেঞ্চরা ১৭৮৯ সালে আন্দোলনে মেতেছিলো, ক্যামিল দেস্‌মোলিন বলার আগে সামান্য কয়েকজনই লক্ষ্য করেছে যে যারা তাদের হাজার বছর ধরে শাসন করছে, তারা আসলে জার্মানী থেকে এসেছে এবং জোরপূর্বক তাদের উপর চেপে বসেছে। সময় সবকিছুকেই শুদ্ধ করে তোলে— সবচে' জঘন্য চুরিকেও— চোরের নাতিদের হাতে তা হয়ে ওঠে পবিত্র, অলংঘনীয় সম্পদ। সকল রাষ্ট্রের শুরু হয় জবরদস্তি দিয়ে, কিন্তু অভ্যাসগত ভক্তির কারণে তা একসময় বিবেকের অংশ হয়ে দাঁড়ায়, এবং অবিলম্বে সকল নাগরিক তার পতাকার আনুগত্যে রোমাঞ্চিত হয়।

নাগরিকই ঠিক; কারণ যেভাবেই রাষ্ট্রের শুরু হোক, এটি সহসাই শৃংখলার এক পরিহার্য খুঁটি হয়ে দাঁড়ায়। ব্যবসা যখন বংশ বা গোত্রকে এক করে তোলে, তখন নতুন এক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায় যার ভিত্তি সম্পর্ক নয়, সংলগ্নতা। তখন কৃত্রিম এক নিয়মের প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে গ্রাম সমাজকে উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে: এটি স্থানীয় সংগঠন হিসেবে বংশ বা গোত্রকে প্রতিস্থাপিত করেছিলো, এবং গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের জন্য সরল ও গণতান্ত্রিক একটি শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলো। কিন্তু গ্রাম সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য এতগুলো আলাদা সমাজের মধ্যে সমন্বয়কারী বাহ্যিক একটি নীতিমালার প্রয়োজন ছিলো যা সবগুলোকে অর্থনীতির একটি জালে সংযুক্ত রাখবে। রাষ্ট্র, যদিও শুরুতে সে ছিলো এক রাক্ষস, কিন্তু পরবর্তীতে এই সমন্বয়ের কাজটি করেছে; এটি শুধুমাত্র সংগঠনের কাজটিই করেনি, বিবাদময় হাজারো গোত্রের চাওয়া-পাওয়ার বিহিত করে একটি মিশ্র সমাজের পত্তন করেছে। সময়ের সাথে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা শাসনের হাত আরো লম্বা হয়েছে; যদিও সে অপর রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধগুলোকে আরো ধ্বংসাত্মক করে তুলেছে, কিন্তু নিজের গন্ডির ভেতরে শান্তি নিশ্চিৎ করেছে। রাষ্ট্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, সে বহির্মুখী যুদ্ধের জন্য আভ্যন্তরীন শান্তি। মানুষ ভাবলো যে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করার চে' কর পরিশোধ করা ঢের ভালো; সব লুটেরাকে ঘুষ দেবার চে' একজন বড় লুটেরাকে কর দেয়াই শ্রেয়। রাজার শাসনে অভ্যস্ত একটি জাতি রাজাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যবর্তীকাল, ইন্টার রেগ্‌নাম, যাকে বাংলায় বলি, অরাজকতার কাল, সে সময় প্রজাদের চেহারা যে কেমন ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে তা বোঝা যায় বাগান্দা'দের আচরণে— যখন রাজা মারা যায়, আত্মরক্ষার্থে সকলকেই অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছিলো, আউটল্‌'রা রায়ট শুরু করে, সর্বত্র খুন এবং ধ্বংসের জোয়ার ধেয়ে আসে। "স্বৈরশাসন ছাড়া" স্পেন্‌সার বলেন, "কখনোই সমাজের বিকাশ হতো না।"

শুধুমাত্র বল প্রয়োগেই যদি রাষ্ট্র চলতো, তাহলে অবিলম্বেই তার পতন হতো, কারণ মানুষ যদিও সহজেই প্রতারিত হয়, সে আবার প্রাকৃতিভাবে ভীষণ জেদি-ও বটে; আরোপিত করের মত ক্ষমতাও তখনই ভালো কাজ করে যখন তা হয় অদৃশ্য এবং পরোক্ষ। সেজন্য, রাষ্ট্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন পথে শিক্ষামূলক উপদেশবাণীর ব্যবস্থা করে— পরিবার, চার্চ, বিদ্যালয়- নাগরিকের হৃদয়ে দেশপ্রেম এবং দেশ নিয়ে গর্বের অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করে। এতে হাজারো পুলিশের কাজ কমে; রাষ্ট্র এবং নাগরিক এক অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, যা যুদ্ধেও ভাঙ্গার নয়। সর্বোপরি, সংখ্যালঘু শাসকেরা চায় তার কর্তৃত্বটাকে আইনের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে যাতে মানুষ শৃংখলাবদ্ধ থাকে এবং নিরাপদ বোধ করে, প্রজার অধিকার-ও কিছুটা নিশ্চিৎ করা হয় যাতে আইনের শাসনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম অক্ষুণ্ন থাকে।

৩. আইন

আইনহীনতা- আইন ও প্রথা - প্রতিশোধ জরিমানা - আদালত - সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা - দ্বন্দ্বযুদ্ধ - শাস্তি - আদিম স্বাধীনতা

আইনের আগমন ঘটেছে সম্পত্তি, বিবাহ এবং শাসনের কারণে; নীচুজাতের সমাজ এটি ছাড়াই দিব্যি চালিয়ে নেয়। "দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্বদিকের অসভ্য সমাজের সাথে আমি বাস করেছি" আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস বলেন, "যাদের কোন আইন, আদালত নেই, শুধুমাত্র লোকজনের মতামতেই এরা কাজ চালিয়ে নেয়। প্রতিটি মানুষ বিবেচকের মত তার সঙ্গীকে শ্রদ্ধা করে এবং খুব কম সময়ই তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এমন একটি সমাজে সকলেই প্রায় সমান।" মার্কেসাস দ্বীপবাসীদের সম্বন্ধে হারমান মেরভিল-ও একই ভাষায় লিখেছেন, "টিপিদের সাথে বাস করার সময় জনগণের প্রতি সহিংসতা প্রদর্শনের জন্য আমি একজনকেও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখিনি। সে উপত্যাকায় সবকিছুই ছিলো ছন্দময় এবং ঝঞ্ঝাটহীন, আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, চরম শুদ্ধ, ধার্মিক খ্রীষ্টানজগতেও যেমনটি অসম্ভব।" রাশিয়ার পুরোনো সরকার অ্যালুশিয়ান দ্বীপে আদালত প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চাশ বছরেও কোন মামলা দায়ের হতে দেখেনি। ব্রিনটন বলেন,"ইরোকুয়িসদের সমাজে অপরাধ কিংবা আইনের লঙ্ঘন এত কম পরিমাণে ঘটতো যে তাদের সমাজে দণ্ডবিধি ছিলো না বললেই চলে।" সে এমনই এক আদর্শ, আদর্শবাদে বিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদীরা যার প্রত্যাবর্তনের জন্য জীবনভর অপেক্ষা করেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় কিছুটা সংশোধনী আনা দরকার। আদিম সমাজ তুলনামূলকভাবে আইনমুক্ত ছিলো কারণ তারা আইনের মত শক্তিশালী এবং অলংঘনীয় প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, দ্বিতীয়ত আগেকার দিনে সহিংসতামূলক অপরাধ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই বিবেচিত হতো এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধের বিষয় বলে গণ্য হতো।

যেকোন সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রথার শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষের চিন্তা এবং কর্ম প্রথার খাঁখুনীতে গড়া। আইনের অনুপস্থিতি, পরিবর্তন বা ব্যাঘাতে সামাজিক রীতিনীতিই একটি সমাজকে সঠিক পথে চালু রাখে। বংশগতি বা সহজাত প্রবৃত্তি মানুষকে ভারসাম্য জোগায়, অভ্যাস জোগায় ব্যক্তিকে আর গোত্রের ভারসাম্য জোগায় প্রথা বা সামাজিক রীতি। রুটিনই মানুষকে প্রকৃতস্থ রাখে; কারণ চিন্তা এবং কর্ম যদি সাবলীল কোন অভ্যাসে ব্যস্ত না থাকে, মন তাহলে অন্তহীন দ্বিধায় ভুগবে এবং অচিরেই পাগলাটে হয়ে উঠবে। অর্থনৈতিক একটি সূত্র মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা অভ্যাস বা সামাজিক প্রথার ক্ষেত্রেও খাটে; উদ্দীপনার সবচে' ভালো সাড়া সেটিই যা স্বতস্ফূর্ত। চিন্তা বা আবিষ্কার হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতার মাঝে এক বিশৃংখলা, একে তখনই মেনে নেয়া যায় যখন পরিবর্তনটা হয় বাঞ্ছনীয় বা যদি এতে লাভের আশা থাকে। (নতুবা সামাজিক প্রথার বাইরে হাঁটাচলা করা বিপদজনক!)

প্রথার মত প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর যখন ধর্মের অতিপ্রাকৃত অবয়ব যোগ হয়, এবং পূর্বপুরুষদের আচরণবিধি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হিসেবে গণ্য হয়, সামাজিক প্রথা তখন আইনের চে'ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রকৃতিগত স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়। আইন ভাঙ্গার অর্থ হচ্ছে লোক সাধারণের অর্ধেকের সাধুবাদ কুড়ানো, যারা গোপনে তার প্রতি ঈর্ষাবোধ করে যিনি এই পুরোনো শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে; প্রথা ভাঙ্গার অর্থ হচ্ছে সার্বজনীন শত্রুতা ডেকে আনা। কারণ প্রথার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে জনগণ, যেখানে আইন জনগণের উপর আসমান থেকে চেপে বসেছে; আইন হচ্ছে কর্তার আদেশ; কিন্তু প্রথা হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত কর্মকাণ্ড যা তার গোত্রের অভিজ্ঞতায় সবচে' সুবিধাজনক বলে বিবেচ্য। আইন প্রথাকে কিছুটা প্রতিস্থাপন করেছে যখন পরিবার, বংশ, গোত্র এবং গ্রাম সমাজের প্রাকৃতিক বিন্যাস রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; এটি পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হয়েছে যখন লেখার আবির্ভাব ঘটেছে, যখন নিত্যদিনের রীতিনীতি বৃদ্ধ এবং পুরোহিতের স্মৃতির সংহিতা থেকে লেখা আইনের আকারে প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এ প্রতিস্থাপন এখনো পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি; মানুষের আচরণবিধির বিচার এবং নির্বাচনে আইনের পেছনে প্রথাই হয় শেষ কথা, সিংহাসনের চালিকাশক্তি, মানবের শেষ বিচারক।

ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ নেয়া থেকেই প্রথমত আইনের বিকাশ ঘটে। "এটা আমার প্রতিশোধ" আদিম এক ব্যক্তির ভাষায়, "আমিই তা পরিশোধ করবো।" লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্ডিয়ান গোত্রগুলোতে প্রত্যেতেই তার নিজের আইন-রক্ষক, এবং এমনভাবে প্রতিশোধ নিতো যেন এ ন্যায়বিচারের জন্য সে সক্ষম। এ কারণে আদিম সমাজে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যেতো, B হত্যা করেছে A-কে, A-এর বন্ধু বা সন্তান C হত্যা করেছে B-কে, B-এর বন্ধু বা সন্তান D হত্যা করেছে C-কে এবং এভাবেই চলতে থাকতো বর্ণমালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, আজকের যুগেও আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মাঝে এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রতিশোধের এই নীতি আইনের পুরো ইতিহাস জুড়েই দেখা যায় : রোমান আইনের ল্ অব্ রির্চালিয়েশান বা পাল্টা দুর্ব্যবহরের আইনে এর উল্লেখ আছে; হামুরাবির কোড্-এ এর একটি বিরাট ভূমিকা আছে, ' মোসাইক'- এ উল্লেখ আছে, " চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত"; আজকের দিনের বেশিরভাগ বৈধ শাস্তির আড়ালেও এ নীতিই বলবৎ আছে।

অন্যায় প্রতিরোধে আইন বা সভ্যতার দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ আদায়। প্রায়শই দেখা যেতো, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার্থে দলনেতা তার ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তার করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে রক্তের বদলে স্বর্ণ বা অন্যকিছু দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বলতো। অবিলম্বেই একটি তালিকা তৈরি হলো; নির্ধারিত হলো যে, একটি চোখ, দাঁত, হাত কিংবা একটি জীবনের ক্ষতিতে কতটুকু ক্ষতিপূরণ দেয়া দরকার; হামুরাবি এ প্রসঙ্গে বিশদ এক আইন প্রণয়ন করেছিলেন। আবিসিনিয়রা এ ব্যাপারে এতটাই নিখুঁত হতে চেয়েছিলো যে, যখন

এক বালক গাছ থেকে পিছলে তার এক সঙ্গীর উপর পড়ে এবং সঙ্গীটি তাতে মারা যায়, বিচারকেরা শোকাহত মাকে বললেন তার আরেক সন্তানকে গাছে উঠে সেই অপরাধীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়তে। অবশ্য অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর বয়স, লিঙ্গ এবং পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে শাস্তির পরিমাণের হেরফের হতো; যেমন ফিজিতে নেতার হাতে খুনের থেকে সাধারণ মানুষের ছিঁচকে চুরিকে জঘন্যতর অপরাধ বলে মনে করা হতো। ইতিহাসের সর্বাংশ জুড়ে দেখা যায়, অপরাধীর পদমর্যাদার সাথে সাথে অপরাধের গুরুত্ব লোপ পেতো। (একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে। মনুসংহিতা (৮, ৩৩৬-৮) অনুযায়ী একই অন্যায়ের জন্য নিম্নবর্ণের চে' উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে বেশী শাস্তির বিধান ছিলো; তবে এ আইন খুব একটা মানা হয়নি।) প্রতিশোধের এজাতীয় ব্যবস্থাপনা বা জরিমানায় যেহেতু দোষ এবং ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিতো, কাজের আইনের তৃতীয় ধাপ হিসেবে আদালতের প্রতিষ্ঠা হলো; লোকজনের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দলনেতা, বয়োজ্যেষ্ঠ বা পুরোহিতেরা বিচারে বসতো। এমন নয় যে, বিচারক দিয়েই সবসময় এ আদালত পরিচালিত হতো, কখনো কখনো স্বেচ্ছাসেবী সমিতি দিয়েও শান্তিপূর্ণ সমাধান আসতো। (আমাদের সবচে' উন্নত শহরগুলোতে আজকাল এ আচার শুরু হয়েছে যা বেশ সময় বাঁচায়।) বহু শতাব্দী ধরে, বহু সমাজে আদালতের দ্বারস্থ হবার ব্যাপারটা ছিলো ঐচ্ছিক; এবং বিচার প্রত্যাশী ব্যক্তি যদি বিচারে সন্তুষ্ট না হতো, তার জন্য পথ খোলা ছিলো নিজের প্রতিশোধ নিজেই নেবার।

এমনও রীতি ছিলো যে, বিবাদ মীমাংসা হতো জনগণের সামনে উভয় পক্ষের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে, চালু ছিলো নির্দোষ মুষ্ঠিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান এস্কিমোদের মরণপণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ। প্রায়শ আদিম মানুষেরা কঠিন অগ্নিপরীক্ষার দ্বারস্থ-ও হতো-মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের কারণে নয় যে, দেবতারা অপরাধীর পরিচয় ফাঁস করে দেবে— এ কারণে যে, অগ্নি-পরীক্ষাতে যতই অনাচার হোক, এ দ্বন্দ্বের তো অবসান হবে নয়তো যা জীবনভর দুটি পরিবারের গন্ডগোলের কারণ হয়ে বেঁচে থাকবে। কখনো কখনো অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয়কেই বলা হতো দুটি খাবারের থালার মধ্যে একটি নির্বাচন করতে যার একটিতে মেশানো থাকতো বিষ; ভুল ব্যক্তির কপালেও বিষ জুটতে পারতো (সাধারণত সেটা বোঝাও যেতো), কিন্তু তবুও বিবাদের তো শেষ হতো, যেহেতু উভয়পক্ষই সাধারণভাবে অগ্নিপরীক্ষার উপর বিশ্বাস রাখতো। কিছু গোত্রে রীতি ছিলো, যদি কেউ তার দোষ স্বীকার করে তাহলে সে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং অভিযোগকারী বর্শা নিক্ষেপ করবে। অথবা, কোন কোন অভিযুক্ত এমন প্রস্তাব দিতো যে, অভিযোগকারী তার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করুক; একটি বর্শাও যদি তার গায়ে গাঁথে, তাহলে সে দোষী; বর্শা না গাঁথলে সে নির্দোষ। এভাবেই অভিযোগটির নিষ্পত্তি হতো। অগ্নিপরীক্ষা এমনই আদিম পদ্ধতি থেকে মুসা এবং হামুরারি'র আইন হয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত চালু ছিলো; দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যা অগ্নি পরীক্ষার-ই এক রূপ,

যাকে ঐতিহাসিকরা বিলুপ্ত বলে ধরে নিয়েছিলো, আমাদের সময়ে তা আবার ফিরে এসেছে। আদিম এবং আধুনিক সমাজের ব্যবধান কিছু কিছু ব্যপারে বড্ড সরু এবং স্বল্প; সভ্যতার ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত।

আইনের বিকাশের চতুর্থ ধাপ হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিরোধে বা শাস্তি প্রদানে (দলনেতা বা রাষ্ট্রের দ্বারা) বাধ্যবাধকতার বিধান। অন্যায়ের শাস্তি দেবার চে' তা প্রতিরোধের পথে এটি একটি ধাপ। কাজেই নেতা তখন শুধুমাত্র বিচারকই নন, আইন-প্রণেতাও বটে; গোত্রের রীতিনীতি থেকে আগত 'সাধারণ আইনে'র সাথে যুক্ত হলো রাষ্ট্র-ঘোষিত 'স্পষ্ট আইন'; একদিকে আইন বাড়তে লাগলো, অন্যদিকে তা প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত হলো। উভয় বিচারেই পূর্বপুরুষের তিক্ততার স্মৃতি আইনের পাতায় স্থান করে নিলো। প্রতিশোধ, যা তারা প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছিলো, তার দুর্গন্ধ আইনের শরীরে থেকেই গেলো। আদিকালের শাস্তিগুলো বড় নিষ্ঠুর, কারণ আদিম সমাজ সবসময়ই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো; সমাজ ব্যবস্থা যত স্থিতিশীল হলো; শাস্তিও ততটাই কম কঠোর হতে লাগলো।

সাধারণ অর্থে আদিম সমাজে ব্যক্তির 'অধিকার' সভ্যতা পরবর্তী সময়ের চে' কম ছিলো। সর্বত্রই মানুষ এক শৃংখলার মধ্যে জন্মায়: পরম্পরায় শৃংখল, পারিপার্শ্বিকের শৃংখল, রীতি এবং আইনের শৃংখল। আদিম ব্যক্তি সবসময়ই নিয়মকানুনের এক ভীষণ শক্ত জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো; সবা কাজে হাজারো নিষেধাজ্ঞা, হাজারো ভয়ে তার ইচ্ছার দৌড় থাকতো সীমাবদ্ধ। নিউজিল্যান্ড আদিবাসীদের দৃশ্যত কোন আইন-ই ছিলো না, কিন্তু বাস্তবে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড কঠোর প্রথায় পরিচালিত হতো। অপরিবর্তনীয় এবং প্রশ্নের উর্ধ্বে স্থাপিত সব রীতিতে নির্ধারিত হতো বাংলার লোকের উঠা-বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটা, খাওয়া, পান করা কিংবা নিদ্রা। ব্যক্তি বলতে আলাদা কোন সত্ত্বার অস্তিত্বই ছিলো না আদিম সমাজে; বিদ্যমান ছিলো শুধু পরিবার, বংশ, গোত্র এবং গ্রাম সমাজ; এরাই ছিলো জমির মালিকানা এবং ক্ষমতা চর্চার একক। সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানাধীন হবার পরেই ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেলো, রাষ্ট্রের আবির্ভাবে ব্যক্তি-স্বতন্ত্র্যের আইনী প্রতিষ্ঠা হলো, তার অধিকার সংজ্ঞায়িত হলো, একক ব্যক্তি স্পষ্ট এক বাস্তবতায় রূপ নিলো। অধিকার প্রকৃতি থেকে আসেনি, প্রকৃতি বল আর ধূর্ততা ছাড়া আর কিছুই জানে না কারণ এতেই সমাজের মঙ্গল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হচ্ছে নিরাপত্তা-পরবর্তী বিলাসীতা; একক ব্যক্তি হচ্ছে সভ্যতার ফসল, তার এক চিহ্ন।

৪. পরিবার

সভ্যতায় এর ভূমিকা - বংশ বনাম পরিবার - পারিবারিক তত্ত্বাবধানের জন্ম - পিতার গুরুত্ব হ্রাস - লিঙ্গের বিভাজন - মায়ের অধিকার নারীর সামাজিক অবস্থান - নারীর পেশা - নারীর অর্থনৈতিক অর্জন - পিতৃতন্ত্র - নারীর পরবশ্যতা

পুরুষের মৌলিক চাহিদা হলো ক্ষুধা এবং ভালবাসা, কাজেই সামাজিক সংগঠনের মূল কাজই হচ্ছে অর্থনৈতিক সরবরাহ এবং জৈবিক ধারার

রক্ষণাবেক্ষণ; সন্তানের প্রবাহ খাদ্যের নিশ্চয়তার জন্য অপরিহার্য। মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজ কিছু সংগঠনের জাল বিছিয়ে রাখে যারা কল্যাণ এবং শৃংখলা নিশ্চিৎ করে। পরবর্তীতে, সভ্যতার শুরুর দিকে, রাষ্ট্রই হয়ে ওঠে শৃংখলার কেন্দ্রীয় শক্তি। বংশে নির্ধারিত হয় লিঙ্গ এবং প্রজন্মের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক; তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও, মানুষের সত্যিকারের লাগাম সবচে' পুরোনো এবং গভীরের সংগঠনটির হাতেই থেকে যায়— যার নাম পরিবার।

এটা প্রায় অসম্ভব যে, প্রথম মানব শুধু পরিবারের গন্ডিতেই বেঁচে ছিলো, এমনকি যখন সে শিকারীর পর্যায়ে ছিলো; কারণ প্রতিরক্ষায় মানুষের শারিরীক যে কৃষ্টতা তা সেরকম একটি নিঃসঙ্গ পরিবারকে অসহায় করে তুলবে। সাধারণত এ জাতীয় দুর্বল প্রাণীরা প্রকৃতিতে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে; এবং এরকম নখর, দন্ত বা অভেদ্য চামড়ার বিশ্বে দলবদ্ধতাই টিকে থাকার একমাত্র পন্থ। ধরা যাক, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো; দলবদ্ধ শিকার বা বংশের সংহতি দিয়েই সে নিজেকে রক্ষা করেছে। অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং রাজনৈতিক সংগঠন যখন সমাজ থেকে আত্মীয়তাকে প্রতিস্থাপিত করেছে, সমাজের কাঠামো থেকে তখন বংশের গুরুত্ব লোপ পেয়েছে; বংশ তখন নীচে থেকে পরিবার দ্বারা এবং ওপর থেকে রাষ্ট্র দ্বারা উচ্ছেদ হয়েছে। রাষ্ট্র শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, পরিবার নিয়েছে শ্রম-বন্টন এবং বংশ রক্ষার দায়িত্ব।

নীচু জাতের প্রাণীরা সন্তানের লালন-পালন করে না, তাই তারা অসংখ্য ডিম পারে, কিছু বাঁচে আর বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যায় বা অন্যের খাদ্যে পরিণত হয়। বেশিরভাগ মাছই বছরে দশ লক্ষ ডিম পারে, কিছু কিছু জাতের মাছ তাদের বাচ্চার জন্য কিছুটা উৎকণ্ঠা দেখায় এবং দেখতে পায় যে, বছরে পঞ্চাশটি ডিম পারাই তার কার্যসিদ্ধির জন্য যথেষ্ট। পাখিরা তাদের বাচ্চার ব্যাপারে বেশ যত্নশীল এবং বছরে মাত্র পাঁচ থেকে বারোটি ডিমে তা দেয়; স্তন্যপায়ীরা, যার নামেই মাতৃস্নেহের কথা এসে যায়, পুরো বিশ্ব জয় করেছে বছরে গড়ে তিনটি বাচ্চা জন্ম দিয়ে। প্রাণীজগতে, সন্তানের যত্ন বৃদ্ধির পাশাপাশি উর্বরতা বা মৃত্যুর হার উভয়-ই কমে যায়। মানব ইতিহাসে, সভ্যতার জাগরণের পাশাপাশি জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়-ই কমে গেছে। ভালো লালন-পালন একটি লম্বা শৈশব উপহার দেয়, নিজের পায়ে চলার আগে শিশু পায় পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ বা উন্নয়ন; এবং কম সন্তান উৎপাদনের ফলে অন্যান্য কাজে বেশী শ্রম দেয়া যায়।

যেহেতু লালন-পালনের বেশীরভাগটুকু মা-ই করে থাকে, পরিবার প্রথমে (ইতিহাসের কুয়াশা আমরা যতটুকু ভেদ করতে পেরেছি) এমনভাবে সংগঠিত ছিলো যে, পুরুষ যেন বহিঃস্থ এবং নৈমিত্তিক, আর নারীর অবস্থান মৌলিক এবং মুখ্য। পশুরা যেমন কার্য এবং কারণ না বুঝেই উত্তেজিত হয়, মিলিত হয় এবং সন্তান উৎপাদন করে, আগেকার লোকদেরও সম্ভবত গর্ভধারণে পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিলো না— যেমনটা এখনকার কিছু উপজাতিতে লক্ষ্য করা যায়। ট্রোবিয়েন্ড দ্বীপবাসীরা গর্ভধারণের জন্য শারিরীক মিলনকে নয়, নারীর

শরীরের ভেতর বালোমা নামের এক প্রেতাত্মার অনুপ্রবেশকে দায়ী করে। সাধারণত মেয়েরা গোছল করবার সময় এই অশরীরীর প্রবেশ ঘটে, "আমাকে একটি মাছে কামড়েছে" মেয়েটি বলে। ম্যালিনোস্কির ভাষায়,"আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, এ অবৈধ সন্তানের পিতা কে, আমি একটি উত্তর-ই পেয়েছি- কোন পিতা নেই, যেহেতু মেয়েটি অবিবাহিত। তারপর যখন আবার জিজ্ঞেন করলাম, শারিরীকভাবে তার পিতাকে, তারা কেউ আমার প্রশ্নটি বুঝতে পারছিলো না। ...উত্তরটি হয়তো এমন ছিলো,"বালোমা-ই মেয়েটিকে এ সন্তান দিয়েছে।" তাদের এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিলো যে, পুরুষের সাথে একটি মেয়ের খোলামেলা সম্পর্ক থাকলেই বালোমা তার শরীরে প্রবেশ করে; জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে তারা পুরুষ সংসর্গ থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে বরং পূর্ণ জোয়ারে গোসল করাটা পরিহার করতো। সহৃদয় মেলামেশার নির্দয় কুফলতার বিপরীতে এটি নিশ্চয়ই চমৎকার এক গলা; তত্ত্বটি স্বামী বা নৃতাত্ত্বিকদের জন্য বানানো হয়ে থাকলে ব্যপারটি আসলে আরো মজার। মেলানেশিয়রা গর্ভধারণের কারণ হিসেবে শারিরীক সংসর্গকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলো, কিন্তু অবিবাহিত মেয়েরা এজন্য খাবারের একটি বিশেষ উপাদানকে দায়ী করতো। যেখানে পুরুষের ভূমিকা বোঝা গিয়েছিলো, সেখানেও সঙ্গী বা সহবাস- এতটাই অনিয়মিত ছিলো যে, পিতা চিহ্নিত করাটা কখনোই সহজ ছিলো না। ফলস্বরূপ, আদিমকালের মায়েরা সন্তানের পিতার পরিচয় উদ্ধারে খুব কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকতো। সন্তান মায়ের; কাজেই নারী-ও স্বামীর নয়, পিতার— অথবা ভাইয়ের— এবং বংশের; এদের সাথেই তার সম্পর্ক, এরাই তার সন্তানের আত্মীয়। ভাইবোনের সম্পর্ক তখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চে' জোরালো হতো। অনেক ক্ষেত্রেই, পুরুষ তার মায়ের পরিবার বা বংশেই থেকে যেতো এবং স্ত্রীকে তার বংশে এক অতিথি হিসেবে বিবেচনা করতো। রোমান সভ্যতায়-ও স্বামীর চে' ভাই ছিলো বেশী প্রিয়; ইন্তাফেরনেসের স্ত্রীকে স্বামী নয়, ভাই-ই বাঁচিয়েছিলো দারিয়ুসের হাত থেকে; এন্টিগোন তার ভাইয়ের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো, স্বামীর জন্য নয়। "এ দুনিয়াতে স্ত্রী-ই সবচে' আপন- একথাটি আধুনিক কালের, এবং মানবজাতির ইতিহাসে অতি সাম্প্রতিক এক ধারণা।"

পিতা-সন্তানের সম্পর্ক ছিলো সামান্য। আদিম সমাজের অনেক জাতিতে নারী ও পুরুষ আলাদা বসবাস করতো। অস্ট্রেলিয়া ও বৃটিশ নিউগিনি, আফ্রিকা ও মাইক্রোনেশিয়া, আসাম এবং বার্মা, অ্যালিয়ুট, এস্কিমো, সামোয়া, বিশ্বের যত্রতত্র এখনো অনেক আদিবাসীর দেখা মেলে যেখানে পারিবারিক জীবন বলতে কিছু নেই; পুরুষ থাকে এক জায়গায়, নারী আরেক জায়গায়, কদাচিৎ একজন আরেক জনের কাছে যায়; এমনকি খাবারের-ও আলাদা ব্যবস্থা। উত্তর পাপুয়াতে নারীর সাথে পুরুষের কোন ধরনের সামাজিক যোগাযোগকে ভালো চোখে দেখা হয় না, এমনকি তার সন্তানের মায়ের সাথেও। তাহিতিতে "পারিবারিক জীবন বলতে কিছু জানা নেই।" এ ধরনের লিঙ্গ বিভাজন থেকেই আসে পুরুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, যা

আদিম সমাজের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, এবং এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে, নারীকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা। আমাদের আধুনিক পুরুষতান্ত্রিকতার সাথে এখানে ভীষণ মিল।

কাজেই পরিবারের সরলতম রূপ হয়ে দাঁড়ায় নারী এবং তার সন্তান, বৃহদ্‌পরিবারে নারী তার মা কিংবা ভাইয়ের সাথে বাস করতো; বংশ ক্রিয়ার ব্যাপারে আদিম মানুষের অজ্ঞতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই পশুপাখির মত মানব সমাজেও এধরণের একটি রীতির জন্ম হয়। এর থেকে প্রথম বিকল্প-ব্যবস্থা হচ্ছে ম্যাট্রিলোকাল ম্যারেজ বা নারী-সমাজে বিয়ে: স্বামী তার বংশ ত্যাগ করে স্ত্রীর বংশে গিয়ে বসবাস করতো, স্ত্রীর পরিবারের হয়ে কাজ করতো। এক্ষেত্রে মায়ের ধারায় বংশ-ধারা নির্ধারিত হতো, কখনো রাজত্বের-ও হাতবদল হতো মাতৃধারায়। এ 'মাতৃ-ধারা' কিন্তু 'মাতৃতন্ত্র' নয়- এটি পুরুষের উপর নারীর শাসন বোঝায় না। এমনকি সম্পত্তি যখন মায়ের ধারায় হস্তান্তর হতো, তখনও সম্পত্তির উপর নারীর কর্তৃত্ব ছিলো সামান্যই; সে ছিলো বংশ-ধারা নির্ধারণের মাধ্যম-বিশেষ, অন্যথায় যে কাজটি আরো কঠিন হয়ে পড়তো। এটা সত্যি যে সমাজের যে কোন ব্যবস্থাপনাতেই নারীর কিছুটা কর্তৃত্ব থাকে, যা গৃহে তার প্রয়োজনীতার কারণে প্রাকৃতিকভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়; খাবার তৈরি করা, পুরুষের শারিরীক প্রয়োজনীয়তা মেটানো কিংবা এক্ষেত্রে পুরুষকে ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতার কারণেই সে কিছুটা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। আবার, দক্ষিণ আফ্রিকার উপজাতিদের মধ্যে নারী শাসকের আবির্ভাব হতে দেখা গেছে; পিলিউ দ্বীপের নেতারা বৃদ্ধাদের এক সংঘের অনুমতি ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতো না; ইরোকুয়িস আদিবাসী রমনীরা কথায় বা দলগত সিদ্ধান্তে ভোটদানে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতো; সেনেকো ইন্ডিয়ান রমণীদের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ছিলো, এমনকি নেতা নির্বাচনেও তাদের ভূমিকা থাকতো। কিন্তু এসবগুলোই আসলে ব্যতিক্রম আর দুর্লভ উদাহরণ। সর্বোপরি, সে আমলে নারী ছিলো দাসত্বের দ্বারা করায়ত্ব। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তার অক্ষমতা, অস্ত্রে অদক্ষতা, সন্তানের ধারণ, লালন-পালনের ফলে তার শারীরিক শক্তিক্ষয় তাকে লিঙ্গযুদ্ধে অক্ষম বানিয়ে রেখেছিলো; সমাজের অতি উঁচু বা নীচু স্তর ছাড়া বাকি স্তরগুলোতে তাকে অধীনস্ত করে রাখা হয়েছিলো। সভ্যতার বিকাশেও তার এমন কোন গুরুত্ব ছিলো না যে তার এ অবস্থানের উন্নতি হবে; আমেরিকার ইন্ডিয়ানের চে' গ্রীক বাতাবরণে নারীর অবস্থান আরো নীচে নেমে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিলো; মানুষের সংস্কৃতি কিংবা নীতিবোধের চে' এখানে তার প্রয়োজনীয়তাই তার অবস্থান নির্ধারণ করেছে।

শিকারী জীবনে শিকারের আসল কাজটুকু ছাড়া বাকী সব কাজই করেছে নারী। নিজেকে ক্ষণিক হিংস্রতার মুখে ঠেলে দেবার বিনিময়ে বাকী পুরো সময়টা, পুরো বছর পুরুষ শুয়ে বসে কাটাতো। নারী সন্তান ধারণ করতো, লালন-পালন করতো, ঘর-বাড়ীর মেরামত করতো, বনে, মাঠে খাদ্যের সন্ধান করতো, রান্না করা, পরিস্কার করা, জুতা বা কাপড় বোনা, সব কাজই করতো নারী। গোত্রটি

যখন বসবাসের জায়গা পাল্টাতো, যে কোন আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হতো বলে পুরুষকে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে থাকতে হতো; বাকী সব কিছুই বহন করতো নারী। বুশম্যানদের নারীরা দাস এবং ভারবাহী জন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো; যদি পথিমধ্যে দেখা যেতো যে, কোন নারী তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম, তাহলে তার গোত্র তাকে ফেলে রেখে চলে যেতো। লোয়ার মুরে গোত্র যখন শ্বেতাঙ্গদের সাথে ষাঁড়ের পাল দেখলো, তারা ভেবেছিলো যে, এরা শ্বেতাঙ্গদের স্ত্রী। লিঙ্গভেদে শারীরিক শক্তির যে তফাৎ আজকাল দেখা যায়, সেসময় তা এতটা প্রকট ছিলো না; আর এখন সেটা যতটা না সহজাত, তারচে' বেশী অভ্যাসজনিত: নারী সেসময় উচ্চতায়, সহিষ্ণুতায়, বলে বা সাহসে ছিলো পুরুষের কাছাকাছি; সে তখনও অলংকার হয়ে পড়েনি, সৌন্দর্যের এক উপাদান বা যৌনাচারের খেলনা হয়ে পড়েনি; সে ছিলো শক্ত-সমর্থ এক প্রাণী; দীর্ঘক্ষণ ধরে পরিশ্রমের কাজে পারদর্শী, এবং প্রয়োজনে, সন্তান বা বংশের জন্য মরণপণ যুদ্ধ করতে সক্ষম। চিপেউয়া এক নেতার বক্তব্য এমন:"নারী তৈরীই হয়েছে কাজের জন্য। এদের একেকজন দুজন পুরুষের সমান টানতে বা বইতে পারে। এরা আমাদের তাঁবু খাটায়, আমাদের জন্য কাপড় বুনে, তার রিপু করে এবং রাতে আমাদের উষ্ণ রাখে.. এদের ছাড়া ভ্রমণের সময় আমরা সত্যিই অসহায়। তারা সবই করে এবং তার মূল্য দিতে হয় সামান্যই; আর যেহেতু তাদের সারাজীবন রান্নার পরিশ্রমটুকু করতে হয়, অবসরে তাদের আঙ্গুলগুলো চেটে দিলেই তারা খুশী থাকে।"

আদিম সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার বেশীরভাগই এসেছে পুরুষ নয়, নারীর হাত ধরে। পুরুষ যখন শতাব্দীব্যাপী শিকার বা পশুচারণে ডুবে ছিলো, নারী তখন তার গৃহের আশেপাশে চাষাবাদের সূচনা করেছে, বিভিন্ন গৃহস্থালী কাজ বা কলা কৌশল রপ্ত করেছে, যা পরে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে রূপ নিয়েছে। গ্রীকরা যাকে "পশমী সুতার গাছ" বলতো, সেই তুলাকে পাকিয়ে আদিম নারী সুতা বানিয়েছে, সুতার কাপড় বুনেছে। এটি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, নারীই সেলাই, বুনন, ঝুড়ি বানানোর শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, স্থাপনা শিল্পের সূচনা করেছে; কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী ব্যবসার-ও সূচনা করেছে; নারী গৃহের পত্তন করেছে, পশুকে পোষ মানিয়েছে, ধীরে ধীরে তার পোষা প্রাণীর তালিকায় পুরুষের নাম সংযোগ করেছে; সামাজিক সুখ বা সামাজিক বিন্যাসের ব্যাপারে পুরুষকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যা ছিলো সভ্যতার মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং সিমেন্ট।

কিন্তু চাষাবাদ যখন আরো জটিল হতে লাগলো এবং তার সাথে বৃহত্তর লাভের সম্ভাবনা জাগলো, বলধারী পুরুষ তখন একটু একটু করে সব তার নিজের হাতে তুলে নিতে লাগলো। পশুর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন এক সম্পদ বা ক্ষমতার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেলো; এমনকি যে চাষাবাদকে ক্ষমতাধর নমরূদ সাদামাঠা এক ব্যাপার বলে ভেবেছিলেন, বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ অবশেষে তাকে গ্রহণ করলো; ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে নারী যে অর্থনৈতিক নেতৃত্বের জন্ম

দেয়, পুরুষ তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়। নারীর পোষ মানানো পশুকে চাষাবাদের কাজে লাগানো হয়। নিড়ানী থেকে লাঙ্গলের আবির্ভাব ঘটলে অধিক শারিরীক শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং চাষাবাদে পুরুষের প্রাধান্য প্রকাশ পায়। গবাদি-পশু এবং ভূমিজাত দ্রব্যাদি বেড়ে ওঠায় হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে; এতে পুরুষের কর্তৃত্ব এবং নারীর অধিনস্ততা ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পায়, কারণ সম্পদের আবির্ভাবেই পুরুষ তার জীবনের চে' প্রিয় এ সম্পদ তার সত্যিকারের সন্তানদের হাতে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে নারীর কাছে বিশ্বস্ততার প্রত্যাশা করে। ক্রমান্বয়ে পুরুষ তার পথের সন্ধান পায়: পিতৃত্ব স্বীকৃতি পায়, সম্পত্তি পুরুষের বংশধারায় হাতবদল হতে শুরু হয়; মাতৃধারা থেকে পিতৃধারার প্রবর্তন হয়; বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নেতৃত্বে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই হয়ে ওঠে সম্পদের আইনী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা মনোস্তাত্ত্বিক একক। দেবতারা, যাদের বেশীরভাগই এতদিন ছিলো নারী, হঠাৎ করে শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষে রূপ নেয় যাদের সবারই একটি করে হারেমখানা আছে— যেমনটি পুরুষ তার একাকিত্বের সময়ে স্বপ্ন দেখতো।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বা পিতায়-শাসিত-পরিবারে রূপান্তরের ব্যাপারটি হয়েছিলো নারীর জন্য ভয়ংকর। সকল পরিস্থিতিতে নারী ও তার সন্তানের প্রথমে হলো তার পিতা বা বড় ভাইয়ের সম্পত্তি, তারপর স্বামীর। বিয়ে করবার মাধ্যমে তাকে কিনে নেয়া হলো, যেমনভাবে বাজার থেকে দাস কেনা হতো। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী হয়ে উঠতো স্বামীর উইল করা সম্পত্তি; কিছু কিছু জায়গায়, যেমন- নিউগিনি, নিউ হেব্রাইড্স্, সলোমন দ্বীপ, ফিজি কিংবা ভারতে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হতো এবং স্বামীর সাথে কবর বা পুড়িয়ে দেয়া হতো, অথবা প্রত্যাশা করা হতো যে, সে আত্মহত্যা করবে যাতে পরকালে স্বামীর সেবা করা যায়। পিতা এখন ইচ্ছামত তার স্ত্রী বা কন্যাদের দান, বিক্রি, ধার দেবার ক্ষমতা পেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য পিতাদের কাছে তা দৃষ্টিকটু না ঠেকে বা অন্যেরা নিন্দা করে। পুরুষ যখন তার যৌন আকাঙ্খা গৃহের বাইরে-ও প্রসারিত রেখেছিলো, নারী সেই একই সমাজে বিয়ের আগে নিতো কুমারীত্বের শপথ, বিয়ের পর সতীত্বের। একধরণের দ্বৈতমানের সৃষ্টি হলো।

শিকারী সমাজ থেকে শুরু করে নারীর যে বশ্যতা এতদিন ধরে একটু একটু করে টিকে ছিলো, এ সময়ে এসে তা নির্দয়, অসহনীয় এবং সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করলো। আগেকার দিনে রাশিয়াতে বিয়ে দেবার সময় বাবা তার মেয়ের গায়ে হাল্কা চাবুক মারতো এবং তারপর চাবুকটি জামাই-য়ের হাতে তুলে দিতো; এই প্রতীকী আচরণে এটাই বোঝানো হতো যে, মারগুলো এখন নতুন এক হাত থেকে আসবে। আমেরিকার ইন্ডিয়ান, যাদের মধ্যে নারীর অধিকার অব্যর্থরূপে পালন করা হতো, তারাও নারীর সাথে দুর্ব্যবহার করতো; মজুরের খাটুনীগুলো তাদের দিয়ে করানো হতো, প্রায়শই তাদেরকে কুকুর বলে ডাকা হতো। সর্বত্রই, নারীর জীবনকে পুরুষের জীবনের চে' সস্তা বলে ভাবা হতো; পুত্র-সন্তান জন্মালে যেমন সবাই আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতো, কন্যা-সন্তান জন্মে তেমন আহলাদ করা

হতো না। মায়েরা কখনো কখনো এ দুর্গতি থেকে মুক্তি দেবার জন্য কণ্যাকে জন্মের পরপরই মেরে ফেলতো। ফিজিতে স্বামীরা একটি বন্দুকের বিনিময়ে স্ত্রীকে যখন ইচ্ছা তখন বিক্রি করে দিতো। কিছু আদি গোত্রে স্বামী-স্ত্রী একসাথে শুতো না কারণ স্ত্রীর নিঃশ্বাসে স্বামীরা দুর্বল চিত্তের হয়ে পড়ে; ফিজির পুরুষেরা প্রতিরাতে বাসায় শোয়াটা সমীচীন মনে করতো না; নিউ ক্যালেডোনিয়াতে নারী শুতো ছাউনীতে আর পুরুষ শুতো ঘরের ভিতর। ফিজির কিছু মন্দিরে কুকুর ঢুকতে পারতো কিন্তু মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো। মুসলিমদের কিছু রীতিতে এখনও এ জাতীয় বর্জনের রেওয়াজ চালু আছে। সন্দেহ নেই, মেয়েরা সবসময়ই দীর্ঘ বাক্‌চারিতার দক্ষতা উপভোগ করে এসেছে; কখনো কখনো পুরুষ রূঢ় প্রত্যাখ্যানের স্বীকার হয়েছে, তিরস্কৃত হয়েছে, এমনকি— কখনো কখনো— মার-ও খেয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি, পুরুষ ছিলো প্রভু, আর নারীরা দাস। কাফিররা দাস বানানোর জন্য নারীদের ক্রয় করতো— এটি ছিলো তাদের কাছে জীবনভর রোজগার বা জীবনবীমার মত; যে ব্যক্তির পর্যাপ্ত পরিমাণে স্ত্রী থাকতো, সে জীবনের বাকি দিনগুলো বিশ্রাম করে কাটাতো পারতো। ভারতের কিছু আদিগোত্রে পোষা জীবজন্তুর পাশাপাশি পরিবারের নারীদের উত্তরাধিকারের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হতো; মুসার শেষ ঐশিক আদেশেও এ তফাৎটি ভালোমত চিহ্নিত হয়নি। আফ্রিকার কোথাও দাসদের সাথে নিগ্রো মহিলাদের তফাৎ ছিলো না; পার্থক্য বলতে এটুকুই যে, তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে তুষ্ট করার পাশাপাশি শারিরীকভাবেও তুষ্ট করতে হতো। বিবাহপ্রথা চালু হয়েছে সম্পত্তির আইনসিদ্ধ প্রবাহ এবং দাসত্বের বিধান প্রতিষ্ঠা করবার জন্য।

চতুর্থ অধ্যায়
সভ্যতার মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান

সুবিন্যস্ত না হলে কোন সমাজ টিকে না এবং কোন বিন্যাস টেকে না নিয়ন্ত্রণ বা প্রবিধান ছাড়া। এটি ইতিহাসের একটি বিধান যে, আইনের আধিক্যের সাথে প্রথা এবং চিন্তা-চেতনার আধিক্যের সাথে সহজাত প্রবৃত্তি ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়। জীবন টিকিয়ে রাখবার জন্য কিছু নিয়মের প্রয়োজন পড়ে; গোত্রভেদে এদের ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে গোত্রের ভেতর এদের ব্যবহার হতে হবে অভিন্ন। নিয়ম বহুবিধ হতে পারে, যেমন- চলমান ধারা, প্রথা, নীতি বা আইন। চলমান ধারা হচ্ছে পারস্পরিক আচার-আচরণ যা এ সময় অন্যের দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত। প্রথা হচ্ছে সেসব ধারা যা কয়েক প্রজন্মের গ্রহণ এবং বর্জনের পরীক্ষার পর প্রাকৃতিকভাবে টিকে আছে। আর নীতি হচ্ছে সেসব প্রথা যা কোন গোত্র তার কল্যাণ এবং বিকাশের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে। আদিম সমাজে কোন আইন না থাকায় এসব অপরিহার্য প্রথা বা নীতিই মানুষের অস্তিত্বের সকল বলয় নিয়ন্ত্রন করেছে এবং সামাজিক শৃংখলা রক্ষায় শূন্যস্থাণের পূরণ করেছে। সময়ের মন্থর যাদুর কারণে প্রথার দীর্ঘদিনের ব্যবহারে তা ব্যক্তির দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়; সে তখন প্রথা ভাঙ্গলে ভীত হয়, অস্বস্তি বা লজ্জা বোধ করে; এখানেই চেতনা বা নৈতিকতার জন্ম, যাকে ডারউইন পশু আর মানুষের মধ্যে সবচে' গভীর পার্থক্য বলে নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তিগত চেতনার পরবর্তী স্তরটি হচ্ছে সামাজিক চেতনা- ব্যক্তি যখন উপলব্ধি করে যে, সে কোন একক ব্যক্তি নয়, সে সমাজেরই একজন এবং সমাজকে তার কিছুটা গুরুত্ব এবং আনুগত্য দেবার আছে। নৈতিকতা হচ্ছে ব্যক্তির সাথে গোত্রের আর প্রত্যেক গোত্রের সাথে মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা। একে ছাড়া সভ্যতা একেবারেই অসম্ভব।

১. বিবাহ

বিবাহের অর্থ- এর জৈবিক সূচনা- যৌন সাম্যবাদ - পরীক্ষামূলক বিবাহ - দলগত বিবাহ - ব্যক্তিক বিবাহ বহুগামিতা - বহুগামিতার প্রজননগত উপকারিতা - অন্য গোত্রে বিবাহ - কাজের বিনিময়ে বিবাহ - পাকরাওকৃত বিবাহ - খরিদকৃত বিবাহ - আদিম ভালবাসা - বিবাহের অর্থনৈতিক অবদান

একটি গোত্রে যেসব রীতিনীতি থাকা দরকার, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারণ এবং তার পরিচর্যা, কারণ এখান থেকেই জন্ম নেয় মতানৈক্য, বিরোধ, সহিংসতা এবং সম্ভাব্য অধঃপতন। লিঙ্গগত সম্পর্ক নির্ধারণের মূল মন্ত্রটি হচ্ছে বিবাহ, যাকে বলা যায়, সন্তান লালন-পালনের জন্য নারীপুরুষের এক সংযোগ। এটি ভয়ানক দোদুল্যমান এবং সদা-পরিবর্তনশীল এক সংযোগ, যা অতীত হতে অদ্যবধি সকল সম্ভাব্য রূপ বা গবেষণা পার করে এসেছে- নারীপুরুষের সহাবস্থান ছাড়া সন্তান লালন-পালন করা থেকে শুরু করে আধুনিক কালে সন্তান ধারণ ছাড়া নারীপুরুষের সহাবস্থান পর্যন্ত।

বিয়ের আবিস্কার করেছে আমাদের পূর্বজ পশুরা। কিছু পাখি আছে যারা একগামী; সারাজীবন একই সঙ্গীর সাথে বিচ্ছেদহীন বিবাহে আবদ্ধ এরা। গরিলা এবং ওরাংউটানদের গোত্রে দেখা যায়, সন্তানদানের ঋতুকালটিই এরা একসাথে থাকে এবং মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ডি ক্রেস্‌পিগনীর পর্যবেক্ষণটি এমন : "বোর্ণিওর ওরাংগুলো পরিবারবদ্ধ জীবনযাপন করে- পুরুষ, নারী এবং একটি নবযাতক"; ডঃ স্যাভেজ গরিলাদের সম্বন্ধে বলেন,"এটি দেখতে পারা অস্বাভাবিক নয় যে, বড়গুলো গাছের নীচে বসে ফল-ফলাদি আর বন্ধুসুলভ গালগল্প দিয়ে নিজেদের পরিতৃপ্ত করছে যখন বাচ্চগুলো তাদের চারপাশে লাফালাফি করছে কিংবা হৈচৈ, উল্লাসে ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" বিয়ে আসলে মানুষের চে'ও পুরোনো।

বিবাহহীন সমাজ দুর্লভ, তবে একজন অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানকারী হয়তো তেমন অনেক সমাজ পাবেন যাদের দিয়ে তিনি নিম্নশ্রেণীর স্তন্যপায়ীদের উচ্ছৃংখলতা থেকে আদিম মানুষের বিবাহ পর্যন্ত একটি পরিবর্তনসূচক সিঁড়ি বানাতে পারবেন। ফুটুনা এবং হাওয়াই দ্বীপে বেশিরভাগ লোকই বিয়ে করতো না; লুবুরা বাধাহীন মেলামেশা করতো এবং বিয়ের কোন ধারনা-ই তাদের ছিলো না; বোর্ণিও-র কিছু গোত্র পাখির চে'ও স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়াতো, তাদের সঙ্গীপ্রথা ছিলো কিন্তু বিবাহপ্রথা ছিলো না; আদিকালের রাশিয়াতে কিছু গোত্রে "পুরুষ নারীকে উপভোগ করতো; কিন্তু কোন স্বীকৃতি দিতো না, তাই নারীর কোন বাঁধা স্বামী থাকতো না।" আফ্রিকার পিগমীদের কোন বিবাহপ্রথা ছিলো না বলে বর্ণিত আছে এবং আরো বলা আছে,"তাদের পশুপ্রবৃত্তি ছিল একেবারে লাগামহীন।" আদিকালে "নারীর এই রাষ্ট্রীয়করণ", আর তদ্‌সংগত জমি ও খাদ্যের সাম্যবাদ, আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, তার খুব কম রূপরেখাই একাল পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এর স্মৃতি অবশ্য কিছু মানুষের মধ্যে টিকে ছিলো এভাবে যে, অনেকের মতে একগামিতা আসলে এক নারীর উপর এক পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য যা প্রাকৃতিক বা নৈতিক নয়; বরং অনুমতি-প্রাপ্তির উৎসব (ফেসটিবল অব্ লাইসেন্স), যার কিছুটা এখনও আমাদের মার্দি গ্রাসে প্রচলিত, সকল যৌন বিধি নিষেধ সাময়িকভাবে স্থগিত করে রাখা হতো; ব্যবিলনের মিলিটা মন্দিরে একটি উৎসব হতো— যেখানে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে কামনা করলে সে নারী রাজী

হতে বাধ্য ছিলো এবং তারপরই তার বিয়ের অনুমতি মিলতো; আদিম সংস্কারে অতিথিপরায়ণতায় স্ত্রীকে ধার দেবার রীতি ছিলো; এবং প্রথম রাতের অধিকার বা জাস্ প্রাইম নকটিস্, যেখানে ফিউডাল ইউরোপে তালুকদারেরা, সম্ভবত আদিম গোত্রগত অধিকারের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে, কখনও কখনও স্বামীর পূর্বে স্ত্রীকে ভোগ করতো।

বেশ কিছু বাছবিচারহীন সম্পর্কের পরীক্ষা করা হয়েছে। মালাক্কার ওরাং সাকাই গোত্রে একটি নারী কিছু সময়ের জন্য গোত্রের প্রত্যেক পুরুষের সাথে থাকতো, হাত বদল হতে থাকতো যতক্ষণ না চক্রটি সম্পন্ন হয় এবং তা আবার শুরু হয়। সাইবেরিয়ার ইয়াকুট, দক্ষিণ আফ্রিকার বটকুডো, তিব্বতের নিম্নশ্রেণী এবং আরো অনেকেই বিয়ে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতো এবং কোন কারণ দর্শানোর ছাড়াই যে কারো অসম্মতিতে তা ভেঙ্গে যেতো। বুশম্যানদের, "বিবাহবন্ধন হঠাৎ ভেঙ্গে যেতো এবং অবিলম্বে দুজনেই নতুন সম্পর্কে আবদ্ধ হতে দেখা যেতো।" স্যার ফ্রান্সিস গেল্‌টনের মতে,"ডামারাদের দাম্পত্য সপ্তাহান্তে ভেঙ্গে যেতো এবং আমি জিজ্ঞেস করা ছাড়া কদাচিৎ বুঝতে পারতাম যে, সে মুহূর্তে কোন নারীর স্বামী কোনটি।" বাইলাদের "প্রতিটি পুরুষের মধ্যে স্ত্রী বদল হতো এবং স্ত্রীরাও স্বেচ্ছায় এক পুরুষ ছেড়ে আরেক পুরুষের কাছে চলে যেতো। যুবতী হবার অগেই অনেক মেয়ের চার পাঁচটি করে স্বামী থাকতো, যাদের সবাই জীবিত।" হাওয়াই দ্বীপে বিবাহ শব্দের অর্থই হলো চেষ্টা করা। তাহিতিতে, একশ' বছর আগেও, বাচ্চাহীন জুটি যে কোন সময় তাদের সংযোগ ভেঙ্গে দিতে পারতো, বাচ্চা হয়ে গেলে কোন সামাজিক নিন্দা ছাড়াই তাকে নষ্ট করে ফেলা যেতো, অথবা বাচ্চাটিকে লালন-পালনের মধ্য দিয়ে দম্পতিটি একটি স্থায়ী সম্পর্কের দিকে এগুতো। মাতৃত্বের বোঝা বইবার প্রতিদানস্বরূপ পুরুষ তখন নারীটির প্রতিপালন করতো।

তৎকালীন পেইন বর্তমানের কেরিয়া অঞ্চল সংলগ্ন মধ্য এশীয় এক গোত্র সম্বন্ধে মার্কো পোলো তের শতকে লিখেছেন,"যদি কোন পুরুষ বিশদিনের বেশি সময় বাড়ীর বাইরে থাকে, তাহলে তার স্ত্রী চাইলে আরেকজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে; একইভাবে স্বামীটিও যেখানে থাকতে চায় সেখানে আবার বিয়ে করতে পারে। বিয়ে কিংবা নীতি বিষয়ে আমাদের নব-আবিষ্কারগুলো আসলে বহু পুরোনো। লেটুরনু বিয়ে সম্বন্ধে বলেছেন, "বিয়ে নিয়ে হিংস্র, বর্বর সমাজগুলো যত প্রকার পরীক্ষা সম্ভব সবই করে দেখেছে, বা তখনও করে যাচ্ছে, ইউরোপে বিদ্যমান ধ্যান-ধারনার বিন্দুমাত্র জ্ঞানও তাদের নেই। স্থায়ীত্বকাল নিয়ে পরীক্ষার পাশাপাশি সম্পর্ক নিয়েও পরীক্ষা চলেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা "দলগত বিবাহ" দেখতে পাই যেখানে এক গোত্রের একদল পুরুষ অন্য গোত্রের একদল নারীকে বিয়ে করতো, পুরুষদল নারীদলকে নিয়ে যৌন সাম্যবাদের চর্চা করতো, প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীর সাথে সংসার করতো। সিজার প্রাচীন ব্রিটেন নিয়েও একইরকম মন্তব্য করেছেন। আদি ইহুদী এবং আরো কিছু পুরোনো গোত্রের

'লেভিরেইট' প্রথার ভেতরে এখনও এরকম মনোভাব কিছুটা জীবিত, যেখানে ভাই মারা গেলে ভাইয়ের স্ত্রীকে অবশ্যই বিয়ে করতে হয়; এটাই ছিলো প্রথা।

কিসের কারণে মানুষ আদিম সমাজের এরকম উচ্ছৃংখল জীবন ছেড়ে ব্যক্তিক বিবাহে নেমে এসেছে? যেহেতু প্রাক-বিবাহ মেলামেশায় খুব কম গোত্রেই বিধি নিষেধ আছে, কাজেই এটা নিশ্চিৎ যে শারিরীক আকাঙ্ক্ষার কারণে বিবাহপ্রথার জন্ম হয়নি। পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি-ই বলে দেয়, বিবাহ-উত্তর বিধি নিষেধ বা স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দাহের কারণে এটি কখনোই আদিম যৌন সাম্যবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারার কথা নয়। আর, সন্তান যেভাবে তার মায়ের বংশে, তার বৃহৎ-পরিবারে লালিত-পালিত হতো তা কোনভাবেই নারী-পুরুষের নতুন এ সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিবাহ প্রথার পেছনে কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে থাকবে। সমস্ত সম্ভাবনাগুলোতেই (আবারো আমাদের স্মরণ করা দরকার যে আমরা আসলে কার্য-কারণগুলোর সামান্যই জানতে পেরেছি) সম্পত্তিপ্রথার জাগরণ বিবাহপ্রথার পেছনে কাজ করে থাকবে।

অল্প খরচে দাস আমদানির জন্যই পুরুষ ব্যক্তিক বিবাহের ধারা চালু করেছে, এবং দ্বিতীয়ত সে চায়নি যে, তার সম্পদ অন্যের হাতে চলে যাক্। বহুগামীতা, এক ব্যাক্তির কয়েক সঙ্গীর সাথে সহবাস, যত্রতত্র নারীর বহুভর্তৃত্ব বা বহুপতিপ্রথা (পলিএন্ড্রি)— রূপে চালু ছিলো, যেমন— টোডা বা তিব্বতের কিছু গোত্রে; এই প্রথা এখনও অনেক জায়গায় প্রচলিত যেখানে পুরুষের সংখ্যা নারীর চে' বেশি। কিন্তু সহসাই এ প্রথা পুরুষের হাতে বাতিল হয় এবং বহুগামিতার অর্থ দাঁড়ায় বহুস্ত্রী প্রথা (পলিজিনি)— এক পুরুষের কয়েক স্ত্রী মালিকানা। মধ্যযুগীয় কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ ভেবেছিলেন, ইসলাম বহুগামিতার জনক, কিন্তু আসলে তারচে' অনেক পুরোনো, আদিম বিশ্বে বহুল প্রচলিত এক বিবাহপ্রথা। এটি সর্বগ্রাহ্য হবার পেছনে বহু কারণ ছিলো। আদিকালে শিকার বা সংঘর্ষের ঘনঘটার কারণে পুরুষের জীবন ছিলো ভয়াবহ সহিংস এবং নারীর চে' পুরুষের মৃত্যুহার ছিলো বেশি। ফলস্বরূপ, নারী বাধ্য হতো, বহুগামিতা কিংবা সংখ্যালঘু চির কৌমার্যের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে; কিন্তু চিরকৌমার্য সেই গোত্রে ঘৃণিত এক বিষয় যেখানে অধিক মৃত্যুহারের কারণে সন্তান উৎপাদনের চাপটি বেশি। উপরন্তু, পুরুষ বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী; এঙ্গোলার নিগ্রোর ভাষায়, তারা "প্রতিদিন একই খাবার খেতে অপারগ।" পুরুষ আবার কম বয়স্ক সঙ্গী পছন্দ করে যেখানে আদিম সমাজের নারীরা তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে পড়তো। নারীরা-ও কখনো কখনো বহুস্ত্রী প্রথার পক্ষে দাঁড়াতো; তাতে তার সন্তানটিকে সে বেশিদিন ধরে লালন-পালন করতে পারতো এবং পুরুষের যৌন মনোস্তত্ত্বে হস্তক্ষেপ না করেই তার সন্তান ধারনের সংখ্যা কমাতে পারতো। প্রথম স্ত্রী বার্ধক্যে ঝুঁকে পড়লে নিজেই কখনও কখনও চাইতো যে তার স্বামী আরেক বিয়ে করুক যাতে তার বোঝা কিছুটা লাঘব হয় এবং বাড়তি সন্তানেরা পরিবারের ধন-সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়। সন্তান ছিলো অর্থনৈতিক সম্পদ; পুরুষ নারীতে বিনিয়োগ করে সুদের মতো সন্তান লাভ

করতো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও সন্তান ছিলো পুরুষের দাস; যার যত বেশী স্ত্রী এবং সন্তান থাকতো, সে ছিলো তত ধনী। দরিদ্রেরা ছিলো একগামী, তবে তার চোখেও স্বপ্ন থাকতো একদিন ধনী হবার এবং সম্মানিত বহুগামী পুরুষে রূপ নেবার।

সন্দেহ নেই যেখানে সেখানে পুরুষের চে' নারীর আধিক্য বিরাজ করে, বিবাহপ্রথায় বহুগামিতা সাবলীলভাবে গৃহীত হয়েছিলো। সমকালীন একগামিতার চে' সেকালে বহুগামিতা চর্চার প্রজননগত একটি উপকারিতা ছিলো; আধুনিক সমাজে সবচে' সক্ষম এবং যোগ্য পুরুষ বিয়ে করে সবার শেষে এবং সন্তান উৎপাদন করে সবচে' কম, বহুগামী সমাজে সবচে' যোগ্য পুরুষটি সবচে' ভালো সঙ্গী পেতো এবং সর্বাধিক সন্তানের জন্ম দিতো। সেজন্য বহুগামিতার চর্চা সকল আদিম সমাজে, এমনকি সভ্যতা-পরবর্তী বেশিরভাগ সমাজেই চালু ছিলো; পুবে আমাদের সময়ে এসে এর চর্চা থেমেছে। চিত্রপটের কিছু পরিবর্তন এর বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করেছিলো। চাষাবাদ-নির্ভর সমাজে দুর্ঘটনা বা সংঘর্ষ কমে যাওয়ায় নারী পুরুষের সংখ্যায় সমতা আসে; এমতাবস্থায়, আদিম সমাজেও বহুগামিতা হয়ে পড়ে সমৃদ্ধশালী সংখ্যালঘুদের অধিকার। আপামর জনসাধারণ সামান্য ব্যভিচারের বাইরে প্রধানত একগামী-ই হয়ে ওঠে; ধনীর বহুগামিতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা হয় এক সংখ্যালঘু শ্রেণীর ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক চিরকৌমার্যের মধ্য দিয়ে। দুই লিঙ্গের সংখ্যার সমতা আসার পর পুরুষ হয়ে ওঠে যৌন ঈর্ষাপরায়ণ আর নারী হয় দখলপ্রবণ; ক্ষমতাশালীরাও অন্যের স্ত্রী বা সম্ভাব্য স্ত্রীর দখল নেয়া ছাড়া বহুগামিতার স্বাদ পেতো না। ধীরে ধীরে বহুবিবাহের ব্যাপারটি কঠিন হয়ে উঠলো এবং ক্ষমতাশালীদের মধ্যে ভয়ানক ধূর্তরাই একাজ করতে পারতো। সম্পদ অরো বাড়তে লাগলো এবং পুরুষ অনিচ্ছুক ছিলো সম্পদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাগাভাগির ব্যাপারে; কাজেই স্ত্রীদের মধ্যে ভেদাভেদ করা হলো "প্রধান পত্নী" এবং "উপপত্নী" রূপে, আর সম্পত্তি ভাগ হতো শুধুমাত্র প্রথমপক্ষের সন্তানদের মধ্যে; এশিয়াতে আমাদের প্রজন্ম পর্যন্ত এ প্রথা জারি ছিলো। কালের চক্রে প্রধান পত্নীই হলো একমাত্র উত্তরাধিকারী আর উপপত্নীরা হলো রক্ষিতা বা আলাদা সংসার বা তাদের ইতি ঘটলো। খ্রীস্টানধর্মের আবির্ভাবে ইউরোপে একবিবাহের ধর্মীয় বা আইনী বিধান জারি হলো। কিন্তু একগামীতা, বর্ণমালা বা রাষ্ট্রের মত, কৃত্রিম এবং সভ্যতা-উত্তর এক বিষয়, প্রাক-সভ্যতার বা প্রাথমিক নয়।

বিয়ের ধরন যেমনই হোক, আদিম সমাজের এ পর্যায়ে বিয়ে করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাড়িয়েছিলো। সমাজে অবিবাহিত ব্যাক্তির কোন মূল্যই ছিলো না, তাকে অপূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে ধরা হতো। অন্য গোত্রে বিবাহের ব্যাপারটিও বাধ্যতামূলক হয়ে উঠলো : বলা যায়, আশা করা হতো যে, পুরুষটি অন্য দল বা বংশের মেয়েকে সঙ্গী করে আনবে। একই বংশের নারী-পুরুষের প্রজনন বা আন্ত প্রজননের ক্ষতিকর প্রভাবের সন্দেহে এই প্রথার বিকাশ ঘটে, নাকি ভিন্ন গোত্রে

বিবাহের ফলে গোত্রগত সম্প্রীতির সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধের আশংকা কমে বলে, নাকি অন্য গোত্রের মেয়েকে ধরে আনার মাধ্যমে পৌরুষের বাড়তি প্রকাশ ঘটে বলে, অথবা প্রাচীন সে প্রবাদের কারণে যে— অতি সংসর্গ ঘৃণার জন্ম দেয়, দূরত্ব দৃষ্টিপটের বৃদ্ধি ঘটায়— তা আমাদের জানা নেই। যে কোন কারণেই হোক, এ প্রথা ছিলো সার্বজনীন; যদিও ফারাও, টলেমী বা ইনকারা ভাই-বোনের বিয়েকে সমর্থন করেছে, বংশগত বিবাহ রোমান বা আধুনিক আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমাদের আচার-আচরণ, চেতনে হোক কি অবচেতনে, নির্ধারণ করে এসেছে।

কিভাবে একজন পুরুষ অন্য গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করতো? মাতৃধারার সমাজে প্রায়শ পুরুষকে মেয়ের বংশে গিয়ে বসবাস করতে হতো। পিতৃতন্ত্র চালু হবার পর, পাণি-প্রার্থী পুরুষকে প্রথমে কিছুদিন শ্বশুড়ের পক্ষে ভৃত্যের কাজ করতে হতো এবং তারপর মেয়েকে তার গোত্রে নিয়ে আসতে পারতো; কাজেই লিয়া এবং র‍্যাচেলের জন্য জ্যাকব ভৃত্য খেটেছে লাবানের কাছে। মাঝেমধ্যে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পাণিপ্রার্থী ব্যাপারটিকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলতো। চুরি করা স্ত্রীর উপকারিতা-ও ছিলো; শুধু যে স্ত্রীটি একজন সস্তা দাস হতো তা-ই নয়, তার থেকে কিছু বাচ্চা দাসও পাওয়া যেতো, বাচ্চার কারণে মেয়েটিও দাসত্বে বাধ্য থাকতো। সার্বজনীন না হলেও, পাকড়াও-কৃত বিবাহ আদিম সমাজে অহরহ ঘটতো। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান নারীরা যুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং এটা এতটাই নিয়মিত ঘটতো যে, কিছু গোত্রে স্বামী-স্ত্রী একভাষায় কথাও বলতে পারতো না। রাশিয়া এবং সাইবেরিয়ার স্লাব জনগোষ্ঠী গত শতাব্দীতেও পাকড়াও-কৃত বিয়ের চর্চা করেছে। ব্রিফল্টের মতে, পাকড়াও-কৃত বিবাহ হচ্ছে মাতৃধারার সমাজে বিবাহ-উত্তর যোগদান আর পিতৃতান্ত্রিক বিবাহে স্বামীর সমাজে স্ত্রীর চলে আসার মধ্যবর্তী একটি ঘটনা : পুরুষ নারীর সমাজে গিয়ে বাস করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নারীকে তার সমাজে যোগ দিতে বাধ্য করে। লিপার্টের বিশ্বাস, পরগোত্রে বিবাহ হচ্ছে অন্য গোত্র থেকে দাস ধরে আনার শান্তিপূর্ণ এক বিকল্প; এখানেও চৌর্যবৃত্তি সমাজের কাছ থেকে অনুমতিপত্র আদায় করেছে। এর কিছুটা অবশেষ রয়ে গেছে সে আধুনিক লৌকিকতায় যেখানে স্ত্রী বিয়ের আসরে ছুটে বেড়ায় আর স্বামীর তাকে পাকড়াও করতে হয়। সর্বোপরি, নিরন্তর লেগে থাকা গোত্রগত কলহের এ ছিলো আরেক অবয়ব এবং স্বপ্নহীন নিদ্রা আর স্বল্পকালীন কামোত্তেজক দৃশ্যগুলো ছাড়া বাকি সময় লেগে থাকা লিঙ্গ যুদ্ধের সূচনা-লগ্ন।

সম্পদের বৃদ্ধির পর, বিয়ের জন্য ভিনগ্রহী এক গোত্রে গিয়ে কাজ করার চে' অথবা পাকড়াও করতে গিয়ে গোত্রসুদ্ধ লোকের মারের মুখে পড়ার চে' সুবিধাজনক মনে হলো মেয়ের বাবাকে কিছু অর্থ-সম্পদ বা উপহার দিয়ে মেয়েকে নিয়ে আসা। ফলশ্রুতিতে বাবা-মায়ের আয়োজনে খরিদকৃত বিবাহের সূচনা হয়। কিছু মধ্যবর্তীয় উদাহরণের-ও সৃষ্টি হয়; মেলানেশিয়রা স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে

আসতো এবং পরে সেই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। নিউগিনির কিছু গোত্রে ছেলেরা মেয়েদের তুলে নিয়ে আসতো, তারপর তারা লুকিয়ে থাকতো আর তার বন্ধুরা মেয়ের বাবার সাথে টাকা-পয়সার দফারফা করতো। যে সাবলীলতায় এসব নৈতিক অবিচারকে টাকার বিনিময়ে মানুষ মেনে নেয় তা সত্যিই বিস্ময়কর। তার মেয়েকে নিয়ে পালানোর অপরাধে এক মাউরী মা উচ্চস্বরে, তিক্ত ভাষায় গালাগাল দিচ্ছিল যতক্ষণ না ছেলেটি তাকে একটি কম্বল উপহার দেয়। "এটাই আমি চাচ্ছিলাম," মা-টি বললো,"কম্বলটার জন্যই আমি এতক্ষণ চিৎকার করাম।" তবে কন্যাদের মূল্য সাধারণত কম্বলের চে' বেশীই হতো: হটেনটট্‌দের মধ্যে কন্যার মূল্য ছিলো একটি গরুর সমান; ক্রদের মধ্যে তিনটি গরু ও একটি ভেড়ার সমান; কাফিরদের মধ্যে মেয়ের পরিবারের অবস্থান ভিত্তিতে ছয়টি থেকে ত্রিশটি গবাদি পশুর সমান; টোগোতে মূল্য ছিলো নগদে ষোল ডলার আর উপহারে ছয় ডলার।

আদিকালে আফ্রিকার সর্বত্র খরিদকৃত বিবাহের চর্চা ছিলো, এখনও জাপান বা চীনে এটি চালু আছে; প্রাচীন ভারত বা ইহুদী সম্প্রদায়, প্রাক্-কলম্বাস মধ্য আমেরিকা এবং পেরুতে এটি বিস্তার লাভ করেছিলো; এখনও ইউরোপে এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এটি কিন্তু সহজাত এক উত্তরণ; কন্যা হচ্ছে বাবার সম্পত্তি এবং একটি সীমা পর্যন্ত সে তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে তুলে দিতে পারেন। ওরিনোকো ইন্ডিয়ানরা ব্যাপারটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে, স্বামীর ব্যবহারের জন্য মেয়েটিকে প্রস্তুত করতে বাবার যে শ্রম ব্যয় হয়েছে তার জন্য তো কিছু একটা পাওয়া উচিৎ। কখনো কখনো পাণিপ্রার্থীদের সামনে মেয়ের প্রদর্শণীর আয়োজন করা হতো; সোমালিয়াতে কন্যাকে সাজ-সজ্জিত করে ঘোড়ার পিঠে বা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, বাতাস মৌ মৌ করতো তীব্র সুগন্ধে যাতে কন্যার দামটা একটু বেশী ওঠে।

কোথাও এমন কোন তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, মেয়েরা খরিদকৃত বিবাহের প্রতিবাদ করেছে; বরং তারা বিনিময়-মুদ্রার অংকে গর্ববোধ করতো এবং যে মেয়ের বিয়েতে তার বাবা টাকা পেতো না, তাকে সবাই ভর্ৎসনা জানাতো; তারা মনে করতো ভালবাসার বিয়েতে বদমায়েশ স্বামী কিছু না দিয়েই অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে, স্বামীর এ মূল্যদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেয়ের বাবা ছেলেকে কিছু একটা উপহার দিতো, যা কালক্রমে স্বামীর উপহারের চে'ও বড় আকার ধারণ করলো। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ধনী বাবারা তাদের উপহারের বৃদ্ধি ঘটালো যা একপর্যায়ে যৌতুকে পরিণত হলো; পিতার মেয়ে-জামাই কেনা থেকে রূপান্তর হতে হতে স্বামীর স্ত্রী কেনার চল শুরু হলো।

বিবাহের এ বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের ভীড়ে ভালোবাসা নির্ভর কোন বিবাহের চিহ্নও নেই। ভালোবাসার বিয়ের কিছু ঘটনা ঘটে নিউগিনির পাপুয়ানদের মধ্যে; অন্যান্য কিছু আদিম সম্প্রদায়ে আমরা ভালোবাসার উদাহরণ দেখতে পাই (পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তে পারস্পরিক আসক্তি), কিন্তু সেসব সংসর্গের

সাথে বিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। সেসময় পুরুষ বিয়ে করতো সস্তা শ্রম, বেশি সন্তানের জন্মদাত্রী এবং রান্নার বাবুর্চি পাবার জন্য। ল্যান্ডার বলেন,"ইয়ারিবাতে বিয়ের ব্যাপারে কোন উৎকণ্ঠা বা উচ্ছাস দেখা যায় না; ফসলে নিড়ানী দেবার ব্যাপারে যেমনটা, পাণি-গ্রহণের ব্যাপারেও ততোটাই ভাবে পুরুষ— মায়ামমতার তো প্রশ্নই আসে না।" প্রাক-বিবাহ সম্পর্ক যেহেতু আদিম সমাজে অহরহ ঘটে থাকতো, প্রত্যাখ্যানের ফলে বাঁধের ওপারে ভালোবাসার জল বেড়ে ওঠার সুযোগটাই ছিল না; আর নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ-ই তখন ছিলো কোথায়! এ কারণেই- কামনা এবং তা পরিপূরণের দূরত্ব কম হওয়ায়- হতাশা বা অতৃপ্তির সময়ই কম, যেখান থেকে সাধারণত ভালবাসার জন্ম হয়। তেমন ভালোবাসা রক্ষিত ছিলো উন্নত সভ্যতার জন্য, যেখানে কামনার সামনে নীতিবোধের দেয়াল খাড়া করা আছে, যেখানে সম্পদের বৃদ্ধির কারণে মুষ্টিমেয় পুরুষের যোগ্যতা থাকে ভালবাসার স্বাচ্ছন্দ্যটুকু পাবার আর কিছুমাত্র নারীর ক্ষমতা থাকে সে কমণীয়তাটুকু দেবার; আদিম মানুষেরা ভাব-বিলাসী হবার মত ধনী ছিলো না। তাদের কবিতায় আর গানে প্রেম পাওয়া দুষ্কর। মিশনারীরা যখন অ্যাল্‌গন্‌কুইন্‌দের ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করতে গেলো, 'ভালোবাসা'র জন্য কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। বিয়ের ব্যাপারে হট্টেনটট্‌দের সম্বন্ধে বলা আছে,"ঠান্ডা এবং একে অন্যের চে' একেবারেই অভিন্ন।" গোল্ড কোস্টে,"স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মায়া-মমতার চিহ্নও নেই"; আদিম অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাও একইরকম। এক সেনেগাল নিগ্রো সম্বন্ধে কাইলী বলেন,"বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন সে মাঝেমধ্যে স্ত্রীদের ভালবাসে না। সে বললো, যদি সে তাই করতো তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো না।" কেন সে বিয়ে করেছে তার উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার এক উপজাতিয়ের সরল স্বীকারোক্তি হচ্ছে খাবার, পানি এবং কাঠ জোগাড় করবার জন্য এবং চলার সময় তার জিনিসপত্র বহন করবার জন্য সে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। চুম্বন, যা আমেরিকাতে এতটাই অপরিহার্য, প্রাচীন বিশ্বের জন্য তা জানাই ছিলো না, বা শুধুমাত্র অবজ্ঞার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হতো।

যৌনতাকে আদিম মানব দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখতো, পশুপাখির যৌনতার চে' বাড়তি কোন অপার্থিবতা বা ধর্মতত্ত্বের স্থান দিতো না; এ চিন্তায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতো না বা এর স্বপ্নে আকাশে উড়ে বেড়াতো না; যৌনতা ছিলো তার কাছে খাদ্য গ্রহণের মত এক ব্যাপার। কোন আদর্শগত উদ্দেশ্যের ভনিতা করতো না সে। যৌনতা তার কাছে ধর্মদীক্ষা বা উৎসব পালনের বিষয় ছিলো না; এটি ছিলো সহজাত অর্থনৈতিক লেনদেন। সে কখনোই এটা ভেবে লজ্জাবোধ করেনি যে, সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাস্তবতার বিচারকে সে আবেগের চে' বেশী মূল্য দিচ্ছে; বরং উল্টোটার জন্য সে মাঝেমাঝে লজ্জায় পড়েছে; বজ্রপাতের মত ঘটে যাওয়া কোন এক ক্ষণিকের ভুলের কারণে আমরা যেমন নারী-পুরুষকে প্রথার নামে সারাজীবনের জন্য শিকলে বেঁধে ফেলি, সে যদি আমাদের মত অবিনীত প্রকৃতির হতো, তাহলে নিশ্চয়ই এরকম অদ্ভূত একটি প্রথার ব্যাখ্যা দাবি

করতো। সেকালে মানুষ বিয়েকে যৌনাচারের অনুমতি-পত্র হিসেবে দেখেনি, দেখেছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা হিসেবে। নারীর কাছে সে, নারী নিজেও, কখনোই সৌজন্যতার প্রত্যাশা করেনি (যদিও সে এগুলো পেলে খুশী হতো), কারণ এ গুণাগুণ উপকারী কিংবা শ্রমোপযোগী নয়; লোকসানের খাত নয়, নারীকে অর্থনৈতিক সম্পদ হতে হতো; নয়তো, সত্যি বলতে, আদিম মানব কখনো বিয়ের কথা ভারতোই না। বিয়ে একটি লাভজনক অংশীদারত্ব, ব্যক্তিগত ভোগ-লালসা নয়। বিয়ে হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা যা উভয়ের একক প্রচেষ্টার চে' বেশি লাভজনক। সভ্যতার ইতিহাসে যেখানেই নারী বিয়ের পর অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে পারেনি, সেখানে বিবাহের পতন হয়েছে; এবং তার সাথে কখনো কখনো সভ্যতার-ও পতন হয়েছে।

২. যৌনতা বিষয়ক নীতিবোধ

প্রাক বিবাহ সম্পর্ক - বেশ্যাবৃত্তি - সতীত্ব - কৌমার্য্য - দ্বৈতমান - শালীনতা (বস্ত্র পরিধান) - নীতিবোধের আপেক্ষিকতা - শালীনতার জৈবিক ভূমিকা - ব্যভিচার - বিবাহ-বিচ্ছেদ - গর্ভপাত - জন্ম নিরোধন - শৈশব - ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

নীতিবোধের সবচে' বড় কাজ হলো যৌনতার বিধান প্রণয়ন; কারণ মানুষর যৌনবৃত্তি যে শুধু বিয়ের সময় সমস্যার সৃষ্টি করে তা নয়, বিয়ের আগে এবং পরেও করে, সমাজের শৃংখলা, এর স্থায়িত্ব, তীব্রতা বা আইনের অনুশাসনের ক্ষতি করে, বিকৃতির মাধ্যমে তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। প্রাক-বিবাহ সম্পর্কের প্রথম সমস্যাই হচ্ছে— এটা কি নিষিদ্ধ হবে, নাকি অনুমোদিত? প্রাণীকূলে যৌনতা একেবারে লাগামহীন নয়; কামোত্তজনার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় নারী-পশুর দ্বারা পুরুষ-পশুর প্রত্যাখ্যাত হবার মাধ্যমে তারা আমাদের কামুক জাতটির থেকে অনেক বেশি সংযত জীবনযাপন করে। বিউমারকেইস্ এরকমটা ভাবতেন যে, মানুষ পশুর চে' আলাদা কারণ এরা ক্ষুধার্ত না হলেও খায়, তৃষ্ণার্ত না হলেও পান করে, আর সর্ব ঋতুতে যৌনক্রিয়া চালায়। মাসিক চলাকালীন মেয়েদের উপর নির্ধারিত কিছু ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞায় আমরা পশুকূলের সাথে আদিম মানুষদের মিল খুঁজে পাই, অথবা বিপরীতটিও সত্য যার জন্য আইনের দরকার হয়েছে। এ সাধারণ ব্যতিক্রমটুকু ছাড়া সরল সমাজগুলোতে প্রাক-বিবাহ সম্পর্কে আর কোন বাধা নেই। উত্তর আমেরিকার তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা করতো; বিয়ের ক্ষেত্রে এটি কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতো না। নিউগিনির পাদুয়াদের খুব অল্প বয়সেই যৌন জীবন শুরু হতো, এবং প্রাক-বিবাহ যৌণতা ছিলো বিধানসিদ্ধ। সাইবেরিয়ার সোয়েট, ফিলিপিন্‌সের ইগোরোট, আপার বার্মার উপজাতি, কাফির, আফ্রিকার বুশম্যান, নাইজার, উগান্ডা এবং নিউ জর্জিয়ার নিগ্রো, মুরে দ্বীপ, আন্দামান, তাহিতি, পলিনেশিয়া এবং আসামে প্রাক-বিবাহ যৌনতার অবাধ স্বাধীনতা ছিলো।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে আদিম সমাজে বেশ্যাবৃত্তির আশা করা ঠিক না। "সবচে' পুরোনো পেশা" আসলে তুলনামূলকভাবে কম-বয়স্ক; শুধুমাত্র সভ্যতার আগমনেই এর জন্ম হয়েছে— সম্পদের আগমন এবং প্রাক্-বিবাহ সম্পর্কের অন্তর্ধানের ফলে। যেখানে সেখানে আমরা মেয়েদের দেখতে পাই যে, যৌতুকের টাকা উঠাচ্ছে কিংবা মন্দিরের জন্য তহবিল জোগাড় করছে; কিন্তু এটি তখনই ঘটে যখন আঞ্চলিক নীতিবোধ একে পিতার প্রতি দায়িত্ব কিংবা ক্ষুধার্ত দেবতার প্রতি ভক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সতীত্ব, সঙ্গত কারণেই বলা চলে, এক অভিনব উন্নয়ন। আদিম মানবী কৌমার্য হারানোর ভয় করেনি, বরং অক্ষমতার বদনামকে ভয় করেছে। প্রাক্-বিবাহ গর্ভধারণের ব্যাপারটিতে প্রায়শ তার স্বামী পেতে সুবিধা হতো, অসুবিধা তো নয়ই; এতে অক্ষমতার সকল সন্দেহ দূর হয়ে যেতো, সন্তানের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ পেতো। সম্পদের আবির্ভাবের পূর্বে সরল গোত্রগুলো কৌমার্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো, কারণ এটি তার লোকগ্রাহ্যতার বিপরীতে যেত। কাম্‌চাদাল স্বামী যখন দেখলো যে তার স্ত্রী এখনও কুমারী, তখন "তার মাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিলে মেয়েকে অবহেলায় মানুষ করার জন্যে।" অনেক জায়গায় কৌমার্য বিবাহের পথে বাধা হয়ে দাড়াতো, কারণ এতে তার স্বামী স্বগোত্রের রক্তপাতের বিরুদ্ধে যে পণ করেছে তা ভাঙ্গতে রাজী হতো না। এ ট্যাবু ভাঙ্গার জন্য কখনো কখনো মেয়েরা ভিনদেশীদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতো। তিব্বতে মায়েরা মেয়েদের কৌমার্য ভাঙ্গাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পুরুষ মানুষের খোঁজ করতো। মালাবারে মেয়েরা নিজেরাই পথচারীদের অনুরোধ জানাতো কারণ নয়তো তার বিয়ে হবে না। কিছু গোত্রে স্বামীর কাছে যাবার আগে কন্যা নিজেকে বিয়ের অতিথিদের কাছে সমর্পণ করতো; আরেক গোত্রে স্বামী তার স্ত্রীর কৌমার্য ভাঙ্গার জন্য অন্য কাউকে ভাড়া করে আনতো; ফিলিপিন্‌সের এক গোত্রে চড়া বেতনে এক বিশেষ কর্মকর্তার নিয়োগ হতো যে স্বামীদের হয়ে এ কঠিন কাজটি করে দিতো।

কি ছিলো সেই ভাবনা যা কৌমার্য্যকে ত্রুটি থেকে গুণে পরিণত করলো এবং সকল উন্নত সভ্যতার নীতিবোধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠা করলো? সন্দেহ নেই যে, এ ছিলো সম্পত্তি-পরবর্তী এক বিধান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে যে সতীত্বের আশা করতো, তারই এক সংযোজনী হিসেবে প্রাক-বিবাহ কৌমার্য প্রতিষ্ঠা পায়। কৌমার্যের মূল্য বেড়ে গেলো যখন খরিদকৃত বিবাহে কুমারী নারী অন্য বোনদের চে' বেশি দামে বিক্রি হলো; কুমারী তার অতীত দিয়ে বিবাহ-উত্তর সতীত্বের আশা দেখায় যা পুরুষের কাছে খুবই মূল্যবান— সে সবসময় তার সম্পদ চোরাগোপ্তা সন্তানদের হাতে চলে যাবার ভয়ে থাকতো।

পুরুষ কখনো নিজের বেলায় এমন বিধি-নিষেধ চাপানোর কথা ভাবেনি; ইতিহাসের কোন সমাজ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রাক-বিবাহ সতীত্বের বিধান চাপায়নি; এমন কোন ভাষা নেই যেখানে 'কুমারী-পুরুষের' জন্য একটি শব্দ রাখা আছে।

কৌমার্যের আবা শুধুমাত্র কন্যাদের জন্য নির্ধারিত এবং হাজারটা উপায়ে তা তার উপর চাপানো হয়েছে। টুয়ারেগ গোষ্ঠী এর অনিয়মে মেয়ে বা বোনদের মেরে ফেলতো; নুবিয়া, আবিসিনিয়া, সোমালি ল্যান্ডের নিগ্রোরা তাদের কন্যাদের ব্যভিচার ঠেকানোর জন্য যৌনাঙ্গে শিকল বা তালা মেরে দিতো; বার্মা এবং সিয়ামে একই লোকাচার চালু আছে। নির্বাসনের প্রথা ছিলো যাতে মেয়েরা প্রলোভন দেয়া-নেয়ার শিকার না হয়। নিউ ব্রিটেনে ধনী বাবা মায়েরা বিগত-যৌবন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হেফাজতে মেয়ের সবচে' বিপদজনক পাঁচটি বছর তাকে বন্দী করে রাখতো; শুধুমাত্র তার আত্মীয়রাই তার সাথে দেখা করতে পারতো, সে বেরুতে পারতো না। বোর্ণিওর কিছু গোত্র তাদের অবিবাহিত কন্যাদের নির্বাসনে রাখতো। এ ধরনের আদিম লৌকিকতা থেকেই পরবর্তী ধাপে হিন্দু এবং মুসলমানদের 'পর্দা প্রথা' এসেছে, যা আবারো প্রমাণ করে যে, সভ্যতা এবং বর্বরতার ফারাক আসলে খুব একটা বেশি নয়।

শালীনতাবোধ (বস্ত্র পরিধান)-এর জন্ম হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং কৌমার্যের আগমনের পর। এখনো এমন অনেক গোত্র আছে যারা তাদের শরীর দেখাতে কোন ধরনের লজ্জাবোধ করে না; বরং কেউ কেউ কাপড় পড়ার কথা শুনলে লজ্জা পায়। পুরো আফ্রিকা হেসে উঠেছিলো যখন লিভিংস্টোন তার স্ত্রী আসবে বলে তাদের কিছুটা কাপড়-চোপড় পরতে বলেছিল। বেলোন্দার রাণী প্রায় নগ্নই ছিলো যখন সে লিভিংস্টোনের জন্য আদালত বসিয়েছিলো। আদিমদের ক্ষুদ্র একটি অংশ কোন লজ্জার কথা না ভেবেই জনসম্মুখে দেহ বিনিময় করে থাকে। শালীনতার চিন্তা প্রথম এসেছে নারীর ঋতুকালের লজ্জাকে ঘিরে। প্রাক-বিবাহ কৌমার্যের ভয়ানক বিধি-নিষেধের ফলে নারীর মধ্যে বিবাহ-উত্তর সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ববোধ শক্ত হয়। খরিদকৃত বিবাহে শালীনতার ব্যাপারে নারীর উপর এক ধরনের অর্থনৈতিক চাপ-ও থাকে; বাহ্যিক যৌনাচার বা অশালীন আচরণ তার স্বামীকে অপূরণীয় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে পারে। এখানেই পোষাকের জন্ম, যদি অলংকরণ বা প্রতিরক্ষার নামে ইতিমধ্যেই তার নারীকরণ না হয়ে থাকে। অনেক গোত্রেই বিয়ের পর মেয়েরা কাপড় পড়তে শুরু করে; এতে বোঝানো হয়, সে এখন শুধুই তার স্বামীর সম্পত্তি এবং কারো কোন নাগরালির সুযোগ আর নেই। আগেকার মানুষ 'পেঙ্গুইন আইল' এর লেখকের সাথে একমত নয় যে, বস্ত্রে বরং কামোদ্দীপনা বাড়ে। সতীত্বের অবশ্য বস্ত্রের সাথে সম্পর্ক নেই; কিছু ভ্রমণকারীর ভাষ্যমতে আফ্রিকার নীতিবোধ বস্ত্রের পরিমাণের সাথে ব্যস্তানুপাতে লোপ পায়। এটি পরিষ্কার যে, মানুষ কিসে লজ্জা পাবে বা না পাবে তা নির্ভর করে তার আঞ্চলিক লোকাচার বা প্রথার উপর। কিছুদিন আগেও চীনের রমণী পা দেখাতে লজ্জা পেতো, আরবের রমণী চেহারা দেখাতে আর টুয়ারেগ রমণী মুখের হা দেখাতে; কিন্তু প্রাচীন মিশরের রমণী, উনিশ শতকের ভারত এবং বিশ শতকের বালি রমণীরা (বিকৃত মানসিকতার পর্যটক আসার পূর্বে) তাদের বুক দেখাতে কোন কুণ্ঠা বোধ করতো না।

এভাবে সমাপ্তি টানা উচিৎ হবে না যে, সকল প্রকার নীতিবোধই আসলে অর্থহীন কারণ এটি স্থান-কালের ভেদাভেদে ভিন্ন হয় এবং ভালো হয় যদি আমরা আমাদের সকল নীতিবোধ এই মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে ইতিহাস থেকে এর ভঙ্গুরতা বা অরক্ষিত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি। নৃতত্ত্বের অল্প জ্ঞান হবে ভয়ানক জ্ঞান। একথাটি সারগর্ভে সত্যি— অ্যানাটোল ফ্রান্স যা শ্লেষের সাথে বলেছেন-"প্রথা কিংবা নীতিবোধ হচ্ছে একটি গোত্রের সকল পছন্দের যোগফল"; আর গ্রীকদের জন্য অ্যানাকারসিসের কথাটি— কিছু গোত্রের সকল ভালো প্রথা এক করা হলে এবং অন্যান্য গোত্রের সকল খারাপ প্রথা তার থেকে বাদ দিলে, কিছুই আর বাকি থাকে না। কিন্তু এতে নীতিবোধের অ-কার্যকারীতার প্রমাণ হয় না; এতে শুধু এটুকুই বোঝা যায় যে, সামাজিক শৃংখলা বা বিন্যাস কত ভিন্ন ভিন্ন পথে সুরক্ষিত আছে। সর্বোপরি, সামাজিক শৃংখলাটিই প্রয়োজনীয়; খেলাটি খেলবার জন্য যা হোক কিছু একটি আইনের প্রয়োজন; জীবনের সাদামাটা পারিপার্শ্বিকতায়-ও মানুষকে জানতে হবে যে, অপরের কাছ থেকে কি আশা করা যায়। মতৈক্য, যার ভিত্তিতে সমাজের সকলে তাদের নীতিবোধের ব্যবহার করে, তা সেসব রীতিনীতির মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নীতিবোধের আপেক্ষিকতা আবিস্কার করে আমরা যদি তাকে বীরোচিত প্রত্যাখ্যান করি, তাতে আমাদের মনের অপরিপক্কতার প্রতিফলন ঘটবে; আরেক যুগ সময় পেলে আমরা হয়তো বুঝতে শুরু করবো যে, লোকাচার বা সামাজিক প্রথাগুলো হচ্ছে শত প্রজন্মের জমা করা অভিজ্ঞতা এবং এতে সেই বিচক্ষণতার শিক্ষা আছে যা কলেজের এ স্বল্প শিক্ষার চে'ও অনেক মূল্যবান। আগে হোক্ পরে হোক, সবার মধ্যেই এ উপলব্ধি জাগে যে, যা আমরা বুঝতে পারিনা তা-ও সত্যি হতে পারে। সমাজ যেসব অভ্যাস, লোকাচার, প্রথা বা বিধানের জটিল বুনটে তৈরী, তা আসলে শত শতাব্দী জুড়ে কোটি মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় গড়া; কোন ব্যক্তির এক জীবনে তা উপলব্ধির আশা করা ঠিক নয়, বিশ বছরে তো নয়-ই। আমরা ন্যায্যত শেষ করতে পারি এভাবে যে, লোকাচার আপেক্ষিক এবং অপরিহার্য। (লেখক বোধহয় তৎকালীন তরুণদের অশালীনতায় ভীষণ ক্ষেপেছিলেন।)

পুরোনো এবং মূল প্রথাগুলো যেহেতু শত বছরের গ্রহণ-বর্জনের দলগত পরীক্ষা পেরিয়ে টিকে আছে, কাজেই কৌমার্য এবং শালীনতার কিছু উপযোগিতা, কিছু উত্তরজীবী গুণাগুণ অবশ্যই আছে। যতই তাদের ইতিহাসে আপেক্ষিতার প্রমাণ থাকুক, তাদের শরীরে নারীর কেনা-বেচার গন্ধ থাকুক, নারীর স্নায়ুবৈকল্যে তার প্রভাব থাকুক। বস্ত্র ধারন ছিলো এক ধরনের কৌশলগত পশ্চাদপসরণ যা নারীকে, যেখানে তার স্বাধীনতাটুকু ছিলো, আরো চিন্তিতভাবে তার সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে, অথবা তাকে জয় করবার জন্য পুরুষকে আরো গুণান্বিত হতে বাধ্য করেছে; এবং কামনার সামনে উত্থিত দেয়ালটির কারণেই পুরুষের মনে রোমাঞ্চকর ভালোবাসার জন্ম নিয়েছে যার ফলে পুরুষের চোখে সে আরো বেশী মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। কৌমার্যের আগমনের সাথেই প্রাকৃতিক

যৌনতার স্বভাব-ধর্ম এবং সরলতা বিনষ্ট হয়েছে; কিন্তু, কম বয়সের যৌনাচার এবং কম বয়সের মাতৃত্বকে নিরুৎসাহিত করে নারীর অর্থনৈতিক পরিপক্কতা এবং যৌণ বয়োঃপ্রাপ্তিতার দূরত্ব কমিয়েছে, যা সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে বেড়েই যাচ্ছিল। (ব্যাখ্যা : শিকারী বা কুড়িয়ে খাওয়া সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ ছিলো কম। নারী অর্থনীতিতে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, যতটা পুরুষ। চাষাবাদ এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে নারীর অর্থনৈতিক সংলগ্নতা বা অবদান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। প্রাক্-বিবাহ কৌমার্যপ্রথার ফলে নারীর বিয়ের বয়স বা শারিরীকভাবে ব্যবহৃত হবার বয়স পিছিয়ে পড়ে। তাতে নারী সামাজিকভাবে আরো কিছুটা পরিপক্ক হয়ে উঠবার সময় পায়, যাকে লেখক অর্থনৈতিক পরিপক্কতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।) কৌমার্যপ্রথার ফলেই নারী শারিরীক ও মানসিকভাবে আরো কিছুটা বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে; কৈশোর এবং প্রশিক্ষণপর্ব দীর্ঘায়িত হয়েছে যাতে পুরো জাতি আরেক ধাপ এগুতে পেরেছে।

সম্পত্তি এবং তার ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির পর ব্যাভিচার তুচ্ছ পাপ থেকে মহাপাপে পরিণত হলো। যত আদিম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমরা জানি, তাদের অর্ধেক এ ব্যাপারে কোন গুরুত্বই দেয় না। সম্পত্তির প্রাচুর্য শুধুমাত্র নারীর সতীত্ব-ই দাবী করেনি, পুরুষের মনে নারীর প্রতি এক ধরনের স্বত্বাধিকারে জন্ম দিয়েছে, তার-ও কারণ হচ্ছে তার শরীর ও আত্মা উভয়ের মালিক ছিলো সে। সতীদাহ ছিলো এ মনোভাবের শেষ ধাপ; নারীকে প্রভূর অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে কবরে-ও যেতে হতো। পিতৃতান্ত্রিকতায় নারীর ব্যাভিচারকে চুরির শামিল বলে ধরা হতো; বলা যায়, এটি ছিলো স্বত্বাধিকারের লংঘন। এ অন্যায়ের জন্য গোত্রভেদে কম-বেশি বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত ছিলো— সরল গোত্রগুলোতে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়া ইন্ডিয়ানদের কিছু গোত্রে অপরাধীর পেট কেটে নারীভুঁড়ি বের করে ফেলা পর্যন্ত। শতাব্দী জোড়া শাস্তির বিধানের ফলে অবশেষে নারীর মনে সতীত্বের পাথর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ব্যাপারে নতুন এক চেতনার জাগরণ হয়। অনেক ইন্ডিয়ান গোত্রে স্বামীর প্রতি নারীর সততার মাত্রা দেখে দখলদারেরা বিস্মিত হতো; কিছু পুরুষ পরিব্রাজক স্বপ্ন দেখতো যে, একদিন ইউরোপ, আমেরিকার নারীরা জুলু বা পাদুয়ান স্ত্রীর মত সততা দেখাতে শিখবে।

বেশিরভাগ আদিম সমাজের মত পাপুয়ান সমাজেও বিবাহবিচ্ছেদে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা ছিলো না। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সম্পর্ক বড়জোর কয়েক বছর টিকতো। স্কুলক্রাফ্ট্ বলেন, "বৃদ্ধ এবং মধ্য-বয়েসীদের একটি বড় অংশের অসংখ্য স্ত্রী-সন্তান দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকতো যাদেরকে সে চিনতোও না।" তারা "ইউরোপীয়দের একটিমাত্র সন্তান থাকতো বলে তার জীবন নিয়ে হাসাহাসি করতো; তারা মনে করে, ভালো আত্মার তৈরি বলে তারা সুখী; মেজাজ এবং স্বভাবে সমমনা না হলে তারা একসাথে থাকে না।" চেরোকিরা বছরে তিন-চারবার স্ত্রী পাল্টাতো; রক্ষণশীল সামোয়ারা তিন বছরের মত এক স্ত্রীর সাথে থাকতো। চাষাবাদের স্থায়ী বন্দোবস্তে এসে দাম্পত্য কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হলো।

পিতৃতান্ত্রিকতায় এসে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে উঠলো অর্থনৈতিক লোকসানের শামিল, কারণ তাতে একটি লাভজনক দাস হারাতে হতো। চাষাবাদের মাধ্যমে পরিবার যখন সমাজের উৎপাদনশীলতার একক হয়ে উঠলো, পরিবারের আকারের উপর ফলন নির্ভর করতো বলে দাম্পত্য দীর্ঘজীবী হতে লাগলো; শেষ সন্তানের বেড়ে ওঠা পর্যন্ত দাম্পত্য চালিয়ে যাওয়া দরকার হয়ে পড়লো। ততদিনে নতুন আরেক রোমাঞ্চকর সম্পর্কের জন্য আর কোন শক্তি বাকী থাকতো না এবং পিতা-মাতা রূপে নারী-পুরুষের সম্পর্ক একই কাজের মাধ্যমে, একই সূত্রে গাঁথা হয়ে থাকলো। শুধুমাত্র নগরায়ণের আবির্ভাবের পর যখন পরিবারের আকার এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব লোপ পেলো, তখনই বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপকতা আবার বৃদ্ধি পেলো।

সাধারণ অর্থে, ইতিহাসের সকল পুরুষই অধিক সন্তান চেয়েছে এবং সে কারণে সে বলে এসেছে যে, মাতৃত্ব ঐশ্বরিক। অন্যদিকে নারী, যে সন্তান উৎপাদনের আসল কষ্টখানি ভোগ করে, বরাবরই এ গুরুভারের বিরুদ্ধে গোপনে বিদ্রোহ করে এসেছে এবং সন্তানের উৎপাদন কমানোর লক্ষ্যে সহস্র পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আদিম পুরুষেরা জনসংখ্যা সীমিত রাখার পক্ষপাতী ছিলো না; সাধারণ অবস্থায় সন্তান লাভজনক এবং পুরুষের একমাত্র দুঃখ ছিলো যে, সবগুলো কেন ছেলে-সন্তান নয়। নারীই আবিষ্কার করেছে গর্ভপাত, শিশুহত্যা বা জন্ম-নিরোধক দ্রব্যাদি— কারণ আদিম সমাজেও ক্ষণে ক্ষণে শেষেরটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গর্ভ নিরোধনে 'আদিম' এবং 'সভ্য' নারীর মন-মানসিকতার এ মিল সত্যিই বিস্ময়কর; সন্তান লালন-পালনের বোঝা থেকে মুক্তি, সুন্দর স্বাস্থ্য ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষা, জারজ সন্তানের জন্ম থামানো কিংবা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য গর্ভ নিরোধনের প্রয়োজন পড়ে। মাতৃত্বে অনীহা দেখানোর সবচে' সহজ উপায় হলো বাচ্চা লালন-পালনের অজুহাত দেখিয়ে পুরুষকে ঠেকিয়ে রাখা। চেইনী ইন্ডিয়ান মায়েরা একটি রীতি চালু করেছিলো যে, এক বাচ্চার বয়স দশ বছর না হলে তারা অন্য বাচ্চা নিতে চাইতো না। নিউ ব্রিটেনে বিয়ের প্রথম দু'চার বছর মেয়েরা বাচ্চা নিতো না।

ব্রাজিলের গুয়েকুরু সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল কারণ, মেয়েরা ত্রিশের আগে বাচ্চা নিতে চাইতো না। পাপুয়াদের মধ্যে ঘন ঘন গর্ভপাতের ঘটনা ঘটতো; এক নারীর ভাষায়,"বাচ্চা মানেই বোঝা, আমরা তাদের ভারে ক্লান্ত। আমরা মরে যাচ্ছি।" কিছু মাউরী উপজাতি ভেষজ তৃণ-লতা ব্যবহার করতো অথবা গর্ভধারণ ঠেকানোর জন্য জরায়ুকে কৃত্রিমভাবে ঘুরিয়ে দিতো।

গর্ভপাতে ব্যর্থ হলে, বাকি ছিলো নবজাতক হত্যা। বেশিরভাগ আদিম গোত্রেই নবজাতক হত্যা বৈধ ছিলো যদি সেটি হতো বিকলাঙ্গ, রোগা, জারজ বা জন্ম দিতে গিয়ে যদি তার মা মারা যেতো। বহুগোত্রই নবজাতকের হত্যা করতো, যদি শিশুটির জন্ম একটু ব্যতিক্রমী হতো বা প্রক্রিয়ার কিছুটা এদিক-ওদিক হতো, যেন জীবন নির্বাহের জন্য যত লোক প্রয়োজন, জনসংখ্যা সেখানটায় ঠেকিয়ে

রাখবার জন্য যেকোন যুক্তিই গ্রহণযোগ্য : তাই বন্ডেই উপজাতিরা জন্মের সময় যেসব বাচ্চার মাথা আগে বেরুতো (এটাই স্বাভাবিক!), তাদের মেরে ফেলতো; কামচাডালেরা ঝড়ো-আবহাওয়ায় জন্মানো বাচ্চাদের মেরে ফেলতো; মাদাগাস্কার উপজাতিরা সেসব বাচ্চাদের ডুবিয়ে মারতো বা জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো যারা মার্চ-এপ্রিল, বুধবার বা শুক্রবার কিংবা মাসের শেষ সপ্তাহে জন্মাতো (২০১২ সালে এ হিসেবে ১৯৮ দিনই হত্যার দিন)। কিছু গোত্রে বিশ্বাস ছিলো যে, জমজ সন্তান প্রসবের অর্থ হচ্ছে মেয়েটি ব্যভিচার করেছে, কারণ কোন পুরুষই একসাথে দুটো সন্তানের জন্ম দিতে পারে না; কাজেই তাদের একটি বা উভয়কেই মেরে ফেলা হতো। পশুচারকদের মধ্যে নবজাতক হত্যা আরো একটু প্রকট ছিলো কারণ লম্বা সফরে শিশুদের কারণে সমস্যা হতো। ভিক্টোরিয়ার বাঙ্গেরাং উপজাতি জন্মের সময় অর্ধেক সংখ্যক নবজাতককে হত্যা করে ফেলতো; প্যারাগুয়ের চাকোর লেঙ্গুরা গোত্রে পরিবার-প্রতি সাত বছরে একটি সন্তানের অনুমতি ছিলো; এবিপোনেরা জন্মানো মাত্র সব সন্তানকে হত্যা করে ঘর প্রতি একটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তানের লালন পালন করে তাদের জনসংখ্যার অবস্থা ফ্রান্সের অর্থনীতির মত বানিয়ে ফেলেছিলো। যেখানে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ছিলো, বেশিরভাগ গোত্রই সকল নবজাতকের হত্যা করতো বা খেয়ে ফেলতো। সাধারণত কন্যা সন্তানই বেশিরভাগ সময় হত্যার শিকার হতো; কখনো কখনো হত্যার পূর্বে তাকে নিপীড়ন করা হতো যাতে পরজন্মে সে বালক সে জন্মায়। এর মধ্যে কোন হিংস্রতা বা অনুশোচনার ব্যাপার ছিলো না কারণ জন্মানোর সাথে সাথে মা তার বাচ্চার জন্য সহজাত কোন ভালোবাসা অনুভব করতো না।

প্রথমে কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারলে তারপর তার জীবন শংকামুক্ত হতো; সহসাই পিতামাতার সরল ভালোবাসার সূচনা হতো এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদিম বাবা মায়েরা আধুনিক উচ্চ সমাজের গড়পড়তা বাবামায়ের চে' বেশি স্নেহে সন্তান লালন-পালন করতো। টিনজাত দুধ বা তরল খাবার ছিলো না বলে বাচ্চাকে মায়েরা দুই থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত স্তন্যদান করতো, কখনো কখনো বারো বছর পর্যন্ত; এক পর্যটক এক বাচ্চার উল্লেখ করেন, যে মায়ের দুধ ছাড়বার আগে ধূমপান করতে শিখে গিয়েছিলো; মাঝেমধ্যেই বালকেরা খেলা বা কাজের মধ্যিখানে মায়ের কাছে বিশেষ প্রয়োজনে ছুটে যেতো। নিগ্রো মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পেছনে বয়ে নিয়ে কাজে যেতো এবং কখনো কখনো কাঁধের ওপর দিয়ে বাচ্চাকে স্তন্যদান করতো। আদিম নিয়ম-কানুনে প্রশ্রয় ছিলো, কিন্তু তা ধ্বংসাত্মক ছিলো না; কম বয়সেই বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া হতো যাতে সে তার বোকামী, ধৃষ্টতা বা কলহের ফল ভোগ করে; শিক্ষা দ্রুততর হতো। বাবা-মা ও সন্তান, উভয়ের ভালোবাসাই আদিম সমাজগুলোতে আরো বেশী জোড়ালো ছিলো।

আদিমকালের শৈশব ছিলো রোগশোক আর বিপদ-আপদে ভরা এবং মৃত্যুহার ছিলো অত্যাধিক। তারুণ্য ছিলো সংক্ষিপ্ত, কারণ অল্প বয়সেই বিয়ে বা

তদ্‌সংলগ্ন দায়িত্ববোধের জন্ম হতো এবং তারপর গোত্রগত কর্মকাণ্ড বা প্রতিরক্ষার কজে ব্যাক্তিটি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতো। নারীর জীবন খরচা হতো সন্তানের লালন-পালনে, পুরুষের জীবন যেতো তাদের ভরণপোষণে। যখন শেষ বাচ্চাটি বড় হতো, বাবা-মা ততদিনে ভেঙ্গে পড়তো; ব্যক্তি-জীবনের শুরুতে যেমন সময় ছিলো না, শেষেও কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। স্বাধীনতার মত ব্যক্তি-জীবনও সভ্যতার ফসল। সভ্যতার সূর্যোদয়ের সাথে কিছু নরনারী ক্ষুধা, সন্তান ধারণ বা যুদ্ধের বোঝা থেকে মুক্ত হলো এবং সৃষ্টি করলো অবসর, সংস্কৃতি বা শিল্পকলার।

৩. সামাজিক নীতিবোধ

দোষ গুণের প্রকৃতি - লোভ - অসততা - সহিংসতা - হত্যা - আত্মহত্যা - ব্যক্তির সামাজিকীকরণ পরার্থবাদ - আতিথেয়তা - আদব-কায়দা - নীতিবোধের গোত্রগত সীমাবদ্ধতা - আদিম বনাম আধুনিক নীতিবোধ - ধর্ম এবং নীতিবোধ

সন্তানকে শিক্ষাদানের অন্যতম একটি অংশ হচ্ছে তার মধ্যে নীতিবোধের জাগরণ ঘটানো। কারণ শিশু হচ্ছে নবজাত পশু, দিনে দিনে গোত্রগত রীতিনীতির উত্তরাধিকারগত শিক্ষায় সে মানুষ হয়ে ওঠে। একটি নবজাতক জৈবিকভাবে সভ্যতার জন্য সুসজ্জিত নয়, কারণ তার সহজাত প্রবৃত্তি গতানুগতিক বা সাধারণ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি, যা শহরের চে' জঙ্গলে বেঁচে থাকার ক্ষেত্র দরকারি। আজকে যাকে দোষ বলি সেগুলো একসময় ছিলো গুণ, যা অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো; ভাগ্যের পরিহাস, একে তখনই দোষ বলা হতো যখন কঠোর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে করতে এটি আমাদের রক্তের ভেতর ঢুকে গেলো; কাজেই দোষ আসলে মানুষের আচরণের আধুনিক কোন বিবর্তন নয়,সুদূর অতীতে চাপা পড়া অভ্যাসের একটি। কাজেই মানোস্তাত্ত্বিক রীতিনীতিগুলোর বহু কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে, সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের সাথে অপরিবর্তনশীল বা ধীর গতিতে পাল্টানো মানব প্রকৃতির একটি সমন্বয় ঘটানো।

লোভ, ছিনতাই, অসততা, হিংস্রতা, সহিংতা এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাণী এবং মনুষ্যকূলে এত প্রজন্ম ধরে আমাদের উপকার করেছে যে, আমাদের সকল আইন, সকল বিদ্যা, ধর্ম বা প্রথা মিলেও এদের মুছে দিতে পারে না; এমনকি আজকের দিনেও টিকে থাকার যুদ্ধে এসব দোষের কিছুটা গুণাগুণ-ও আছে। পশু অতি-ভক্ষণে বিশ্বাসী কারণ সে জানে না পরের খাবার কবে মিলবে; এ অনিশ্চয়তা থেকেই লোভেই জন্ম। ইয়াকুটদের সম্বন্ধে জানতে পারা যায় যে, তারা একদিনে পনের কেজির বেশি মাংস খেতে পারতো; একইরকম গল্প এস্কিমো এবং অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের সম্বন্ধে-ও শোনা যায়। বেশিদিন হয়নি, সভ্যতার হাত ধরে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিৎ হবার ফলে এ জাতীয় লোভের সংবরণ হয়েছে; এখনও সম্পদ আহরণের পুনঃপৌনিক অতৃপ্তিতে এ স্বভাব প্রকাশ পায় যখন আধুনিক নরনারী স্বর্ণ কিংবা ধন-দৌলত জমা করে যাতে বিপদে পড়লে তা খাদ্যে পরিণত করা যায়। পানীয়ে লোভ এতটা প্রকট নয় যতটা প্রকাশ পায় খাদ্যে

কারণ মানুষ সর্বদাই জলাধারকে কেন্দ্র করে বসবাস করেছে। মদ্যপানের নেশা ছিলো সার্বজনীন; তবে তা লোভের কারণে ততটা নয়, যতোটা শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে, দুঃখ ভুলে থাকতে বা যে পানি পাওয়া যায় তা খাবার অযোগ্য বলে।

অসততা লোভের মত ততটা পুরোনো নয়, কারণ ক্ষুধা সম্পদের চে' বেশি বায়সী। সাধারণ বর্বরেরা সবচে' বেশী সৎ। হটেন্‌টট্‌দের একজন, কোলবেনের মতে,"তাদের মুখের কথা অলংঘনীয়, তার দুর্নীতি বা ইউরোপীয়দের বিশ্বাসভঙ্গের কিছুই জানে না।" আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বেড়ে গেলে, এসব কাঁচা সততা উধাও হয়ে যায়; ইউরোপীয়রা এসে হটেন্‌টট্‌দের অসততার শিক্ষা দিয়েছে। সাধারণ অর্থে, সভ্যতার জাগরণের সাথে অসততার বৃদ্ধি ঘটেছে, কারণ সভ্য সমাজে অসততার পুরস্কারটি বৃহত্তর; চুরি করবার জিনিসের সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষায় মানুষের বুদ্ধি-ও বেড়েছে। আদিম সমাজে সম্পত্তির আগমনের পাশাপাশি মিথ্যা এবং চৌর্যবৃত্তির-ও আমদানি হয়েছে।

সহিংসাজনিত অপরাধ লোভের সমবয়সী; খাবার, জমি এবং সঙ্গী নিয়ে দ্বন্দ্ব প্রত্যেক প্রজন্মে পৃথিবীকে রক্তাক্ত করেছে, সভ্যতার আলোর পেছনে অন্ধকার পটভূমির সৃষ্টি করেছে। আদিম মানুষ হিংস্র কারণ তাকে তা-ই হতে হয়েছে; জীবন তাকে একটি হাত মারের জন্য উদ্ধত রাখতে এবং হৃদয়কে হত্যার জন্য তৈরি রাখতে শিখিয়েছে। নৃতত্ত্বের সবচে' কালো অধ্যায় হলো আদিম মানুষের নিপীড়নের গল্প— ব্যথা দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ উপভোগ করা। এরকম হিংস্রতার বেশিরভাগ যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট; গোত্রের ভেতর আচার-ব্যবহার ছিলো নিরীহ, আদিম মানুষেরা একে অন্যের সাথে, এমনকি দাসের সাথে, ভদ্রলোকের দয়ালু আচরণ করতো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক হত্যার দীক্ষা পাবার পর শান্তির সময়েও হত্যা করতে শিখে গেলো সে; বিপুল সংখ্যক আদিম মানুষের যুক্তিতে কোন সমস্যার মীমাংসা ততক্ষণ ঘটে না যতক্ষণ কোন এক বিরোধকারী মারা না পড়ে। হত্যার ঘটনায় অনেক আদিম গোত্রেই কম ভীতির সৃষ্টি হতো যা এখনকার সমাজে হয়ে থাকে। ফুয়েজিয়ানদের মধ্যে হত্যার শাস্তি ছিলো হত্যাকারীকে নির্বাসনে রেখে দেয়া যতদিন তার লোকেরা এ অপরাধের কথা ভুলে না যায়। কাফিররা মনে করতো হত্যাকারী অপরিস্কার এবং তার মুখ কালো চারকোলে এঁকে দেয়া হতো; কিছুক্ষণ পর সে মুখ ধুয়ে বাদামী রং মাখিয়ে নিলে আবার তাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হতো। ফুটুনার আদিমেরা, আমাদের-ই মতো, খুনীকে বীরের দৃষ্টিতে দেখতো। এমন অনেক গোত্র ছিলো যেখানে নারী পুরুষকে বিয়ে করতে চাইতো না যদি না সে কারণে বা অকারণে, অন্তত একটি খুন করে থাকে; এখান থেকেই হত্যা করে মাথা কেটে নিয়ে আসার প্রথা চালু হয়েছে, যা ফিলিপিন্‌স্ দ্বীপে আজো চালু আছে। যে ডাইক সবচে' বেশি কাটা-মাথা নিয়ে আসতো, সে গ্রামের যে কোন নারীকে চাইতে পারতো; মেয়েরাও এই ভেবে তার জন্য পাগল হয়ে যেতো যে তাকে বিয়ে করে সে সাহসী এবং বলধারী সন্তানের মা হতে পারবে। এটি সিন্‌জের নাটক 'প্লেবয় অব্ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড'- এর বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

খাদ্য যেখানে দুর্মূল্য, জীবন সেখানে সস্তা। এস্কিমো সন্তানদের অবশ্যই তার বাবা-মাকে হত্যা করতে হতো যখন তারা বৃদ্ধ, অকেজো এবং নিষ্ফল হয়ে পড়ে; একাজে অপারগতাকে সন্তানসুলভ দায়িত্বের অবহেলা বলে ধরা হতো। আদিম সমাজে, এমনকি নিজের জীবনটিকেও সস্তা মনে হতো; জাপানীরা নিজেকে হত্যার ব্যাপারে অদ্বিতীয়। অপরাধের শিকার হয়ে যদি কেউ আত্মহত্যা করতো বা নিজের অঙ্গহানি করতো, অপরাধীও তখন আত্মহত্যা বা অঙ্গহানি করতে বাধ্য ছিলো; হারা-কিরি এতটাই পুরোনো। আত্মহত্যার জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণও যথেষ্ট ছিলো : উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান কিছু রমণী স্বামীর খিস্তিখেউড়ে আত্মহত্যা করতো; ট্রবিয়ান্ড দ্বীপের এক যুবক আত্মহত্যা করেছিলো কারণ তার স্ত্রী সমস্ত তামাক খেয়ে ফেলেছিলো।

লোভকে মিতব্যয়িতায়, সহিংসতাকে তর্কে, হত্যাকে মামলায় এবং আত্মহত্যাকে আশাবাদী দর্শনে রূপান্তরের কাজটি করেছে সভ্যতা। ক্ষমতাবানেরা যখন সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা অতি দুর্বলকেও আইনের বাইরে পরাস্ত করবে না, সেটি ছিলো সভ্যতার ইতিহাসে বিরাট এক অগ্রগতি। কোন সমাজই টিকে থাকতে পারতো না যদি সে, অন্য সমাজের প্রতি যে আচরণ করে, নিজের সমাজের ভেতরে, ব্যাক্তিস্তরে একে অন্যের প্রতি সেই একই আচরণ প্রদর্শন করতো; বহির্মুখী প্রতিযোগিতায় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শেষ হয়ে যায় না; এতে ইচ্ছার একত্রীকরণ হয়, বা গোত্রের কাঁধে স্থানান্তর হয়। বাকী সব সমান থাকলে, গোত্রগত প্রতিযোগিতায় জয় নির্ধারণ হয় গোত্রের সাথে ব্যাক্তি বা পরিবারের সংযুক্তির ভিত্তিতে। সেজন্য সমাজের কাজ হচ্ছে ব্যাক্তির হৃদয়ে একটি নৈতিকতার সৃষ্টি করা যা গোপন-চুক্তির মত কাজ করে জীবন যুদ্ধের তীব্রতা কমায়। যেসব অভ্যাস বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দলগত সুবিধার সৃষ্টি করে, সমাজ তাদের বলে 'গুণ' এবং তাদের উৎসাহ দেয়, আর অন্যগুলোকে 'দোষ' নামে আখ্যায়িত করে নিরুৎসাহিত করে। এভাবে একক ব্যক্তি বাহ্যিক কারণবশত সীমাবদ্ধ হয় এবং পশু হয়ে উঠে নাগরিক।

আধুনিক মানুষের মনে সামাজিক অনুভূতির জাগরণ ঘটানো যতটা কঠিন, আদিম সমাজে ততটা কঠিন ছিলো না। জীবন যুদ্ধের কারণেই সাম্প্রদায়িক প্রীতির সৃষ্টি হতো, কিন্তু জমির যুদ্ধের সূচনায় ব্যক্তি-সত্তা জেগে ওঠে। পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নে আদিম মানুষেরা আধুনিক মানুষের চে' বেশী উৎসুক ছিলো; সমষ্টিগত বিবাদ-আপদ বা আগ্রহের বিষয় বেশি থাকায় তার মধ্যে সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তাও বেশি ছিলো; অন্যের থেকে নিজেকে আলাদা করবার কারণ ছিলো কম। আদিম মানব হিংস্র ও লোভী ছিলো; কিন্তু গৃহে ছিলো দয়ালু ও সহৃদয়, অপরিচিতের সাথে ভাগাভাগিতে কিংবা আতিথেয়তা এমন পর্যায়ে গিয়েছিলো যে, অনেক গোত্রে স্ত্রী এবং কন্যা দিয়ে পর্যটকদের আপ্যায়ন করা হতো। এ উপহার ফিরিয়ে দেয়াটা ছিলো জঘন্য এক অপরাধ; মন্ত্রণাকারী বা তার স্ত্রী উভয়েই রেগে যেতো; মিশনারীরা এ কারণে মারাত্মক সমস্যায় পড়তো।

অনেক সময় পরবর্তী খাতিরদারি নির্ভর করতো প্রথম ভোজনের নৈপুণ্যের ভিত্তিতে। আদিম মানুষদের স্বাধিকারবোধ ছিলো, তবে তার মধ্যে প্রণয় বা যৌন ঈর্শাকাতরতা ছিলো না; এ ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যাথা ছিলো না যে, তার স্ত্রী বিয়ের আগে অন্য লোকদের 'জানতো' অথবা বিয়ের পর অতিথির সাথে শুয়েছে, কিন্তু তার প্রভু হিসেবে সে কখনো সহ্য করতে পারতো না যে তার স্ত্রী তার অগোচরে অন্যের সাথে মেলামেশা করছে। আফ্রিকায় কিছু স্বামী সুবিধা লাভের আশায় অপরিচিতের কাছে স্ত্রীকে ধার দিত।

আধুনিক সমাজের মত আদিম সমাজেও শিষ্টাচারের জটিল সব বিধান ছিলো। প্রতিটি গোত্রে আনুষ্ঠানিক প্রীতি-সম্ভাষণ বা বিদায়ী সম্ভাষণের রেওয়াজ ছিলো। দেখা হলে দু-ব্যক্তি নাকে নাক ঘষতো, একে অপরকে শুঁকে দেখতো অথবা আলতো প্রহার করতো; যেমনটা আমরা দেখে অভ্যস্ত, চুম্বনের প্রথা কোথাও ছিলো না। কিছু হিংস্র গোত্র বর্তমান গড়পড়তার চে' বিনয়ী ছিলো; আমরা শুনেছি, মুন্ডু-কাটা ডাইকেরা গৃহ-জীবনে ছিলো 'ভদ্র এবং শান্তিকামী', সাদাদের রূঢ় বা উচ্চস্বরে কথা বলাকে মধ্য আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা নিম্ন শ্রেণীর বংশ বা আদিম সভ্যতার চিহ্ন বলে মনে করতো।

প্রায় সব গোত্রই মনে করে যে, অন্য গোত্রের লোকজন তাদের চে' নিকৃষ্ট। আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা মনে করতো, তারা বাছাইকৃত সন্তান, উন্নত আত্মারা মানবজাতির জন্য উদাহরণস্বরূপ বিশেষভাবে তাদের সৃষ্টি করেছে। ইন্ডিয়ান এক গোত্র তাদের ডাকতো,"একমাত্র মানুষ" বলে; আরেক গোত্র নিজেদের সম্বন্ধে বলতো,"মানুষের মধ্যে মানুষ"; ক্যারিবিয়রা বলতো "তারাই মানবজাতি"। এস্কিমোরা বিশ্বাস করতো যে, ইউরোপীয়রা গ্রীনল্যান্ডে এসেছে শিষ্টাচার বা মানবীয় গুণাবলী শেখার জন্য। নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবার কারণেই আদিম মানুষেরা কখনো তার নীতিবোধে অন্যদেরকে দীক্ষিত করার কথা ভাবেনি; সে ভাবতো, অন্য গোত্রের চে' নিজেদের উন্নত রাখতেই এসব নীতিবোধের প্রয়োজন। তার জানা সকল বিধি-নিষেধ বা ঐশিকবাণী শুধু তার গোত্রেই ব্যবহার করতো; অন্যের সাথে সে যতদূর যাওয়া অসম্ভব, যেতে পিছপা হতো না।

ইতিহাসে দেখা যায়, নৈতিক বিকাশ সেভাবে খুব একটা ঘটেনি যে, নীতিশাস্ত্রের উন্নতি হয়েছে, বরং নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিম মানুষের নীতিবোধের চে' আধুনিক নীতিবোধের শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই প্রশ্নাতীত নয়, যদিও তাদের বিষয়-বস্তু, চর্চা কিংবা কার্যক্ষেত্র বিপুলাংশেই ভিন্ন। আধুনিক নীতিবোধের ব্যবহারের ক্ষেত্র অনেক বড়, কিন্তু তীব্রতা আগের চে' কম। (যদিও মধ্যযুগের পর জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবে নীতিবোধের ক্ষেত্র-পরিসর গুটিয়ে এসেছে।) গোত্র যখন রাষ্ট্র নামক বৃহত্তর এককে সংঘবদ্ধ হয়েছে, নীতিবোধ গোত্রের সীমানা ছাপিয়ে অন্য গোত্রে পৌঁছে গেছে; যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি এবং অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে জোট বাঁধার মাধ্যমে গোত্রগুলো এক হতে লাগলো এবং সীমান্তের ফাঁক গলে নীতিশাস্ত্রের অবাধ বিচরণ হতে লাগলো। কিছু মানুষ

আদেশনামা জারি করতে লাগলো সমস্ত ইউরোপবাসীর নামে, তারপর সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের নামে এবং শেষ পর্যন্ত সকল মানুষের নামে। সম্ভবত সবসময়ই এমন কিছু আদর্শবাদী ব্যক্তি ছিলো যারা সব মানুষকে তাদের নিকট প্রতিবেশীরূপে ভাবতে ভালোবাসতো এবং সম্ভবত সকল প্রজন্মেই সেসব ব্যক্তিরা যুদ্ধ বা জাতীয়বাদের বুনো ডাকে নিস্ফল চিৎকার দিয়ে বেড়াতো। একসময় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলো— এমনকি তুলনামূলক সংখ্যার-ও বৃদ্ধি ঘটেছিলো। কূটনীতিতে আসলে কোন নীতি নেই; রাজনীতিতে নিয়ম বলে কিছু নেই; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা আছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, কিছু বিধিনিষেধ, আইন বা বিশ্বস্ততা ছাড়া এজাতীয় বিনিময় এগুতে পারে না। ব্যবসা যখন জলদস্যুতায় গিয়ে ঠেকলো, আমাদের নীতিবোধের শীর্ষেও স্থান নিল দস্যুবৃত্তি।

খুব কম সমাজই তাদের নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি বা রাজনীতির মত যুক্তিযুক্ত বিষয়কে ঘিরে সীমাবদ্ধ রেখেছে। কারণ প্রকৃতি ব্যাক্তিকে সেই শক্তি দান করেনি যে সে নিজের আগ্রহ গোত্রগত চিন্তায় সীমাবদ্ধ রাখবে, বা সেসব বিরক্তিকর নীতিমালায় লালিত-পালিত হবে যার প্রতিষ্ঠায় কোন দৃশ্যমান কোন বলের প্রয়োগ নেই। বলা যেতে পারে, শক্তিশালী স্বপ্ন বা ভয়ভীতির দ্বারা সামাজিক স্বার্থকে ব্যাক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য এবং একজন অদৃশ্য পাহারাদার বসানোর জন্য, সমাজ ধর্মের আবিস্কার না করলেও ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ভূগোলবিদ স্ট্রাবো উনিশশ' বছর আগে এ ব্যাপারে সবচে' আধুনিক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন :

"একজন দার্শনিক যুক্তি দিয়ে কখনোই একদল উচ্ছৃংখল জনতা বা অন্তত একদল রমনীকে শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না; সেখানে ধর্মীয় ভীতির-ও প্রয়োজন আছে, এবং বিস্ময়কর কিছু একটা ও প্রাচীন কাহিনীর প্রয়োজন আছে। বজ্রপাত, পৃষ্ঠপোষকতা, ত্রিশূল, মশাল, সাপ-ঈশ্বরের হাত— এগুলো হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহমান কাহিনী এবং প্রাচীন ধর্মতত্ত্বের পুরোটাই কাহিনী। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাগণ এসব বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে যাতে যুযুর ভয়ে সরল-মনা মানুষেরা ঠিক থাকে। কাহিনীর ধর্মই এমন এবং এসব কাহিনী যেহেতু আমাদের সামাজিক ও মানব সম্প্রদায়গত পরিকল্পের ভিতর, সর্বোপরি সত্য ঘটনার ইতিহাসের ভিতর জায়গা করে নিয়েছে, আমাদের পূর্বজরা শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে এদেরকে এঁটে দিয়েছে এবং পরিপক্কতার বয়স পর্যন্ত একে ব্যবহার করেছে; এবং তারা বিশ্বাস করতো যে, পদ্যের মাধ্যমে জীবনের সকল স্তরকে শৃংখলাবদ্ধ করা সম্ভব। কিন্তু বহু বছর পর আজ লিখিত ইতিহাস এবং সমকালীন দর্শন আমাদের সামনে উঠে এসেছে। দর্শন অবশ্য সামান্য কিছু লোকের জন্য, জনসমুদ্রে কবিতাই বেশি কার্যকরী।"

সহসাই নীতিবোধের ভেতর ধর্মের অনুমোদন বা অনুদান জমতে শুরু করলো, কারণ রহস্য এবং অলৌকিকতার যে গুরুভার, পরীক্ষা-লব্ধ বা বংশধারায় লব্ধ বিষয়ে তা থাকে না; বিজ্ঞানের চে' স্বপ্নের দ্বারাই মানুষকে সহজে শাসন করা যায়। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে প্রয়োগের জন্য ধর্মের উৎপত্তি, নাকি নীতিবোধ থেকেই ধর্মের আগমন?

৪. ধর্ম

নিরীশ্বরবাদী আদিম মানব

যদি আমরা ধর্মকে অলৌকিক শক্তির উপাসনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে শুরুতেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, কিছু লোকের দৃশ্যত কোন ধর্মই ছিলো না। আফ্রিকার কিছু পিগমী গোত্রের ধর্মীয় কোন প্রথা বা কৃত্যানুষ্ঠান ছিলো না; তাদের কোন টোটেম, পৌত্তলিকতা বা কোন দেবতা ছিলো না; মৃতদের কোন শেষকৃত্য ছাড়াই মাটি চাপা দেয়া হতো এবং এ ব্যাপারে আর কোন মাথাব্যথা দেখাতো না; তাদের কোন কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস-ও ছিলো না, যদি না আমরা, অন্যথা, অবিশ্বাস্য পর্যটকদের কথা বিশ্বাস করি। ক্যামেরুনের বামনরা শুধুমাত্র অমঙ্গলকর আত্মায় বিশ্বাস করতো কিন্তু তাদেরকে তুষ্ট রাখার কোন চেষ্টাই করতো না এ যুক্তিতে যে, চেষ্টা করেও লাভ নেই। সিলনের ভেয়দারা ঈশ্বর এবং অবিনাশী আত্মার সম্ভাবনা স্বীকারের বেশি আর এগোয়নি; তাদের কোন প্রার্থনা বা বলি দেবার বিধান ছিলো না। ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় আধুনিক দার্শনিকের মত তার হতবুদ্ধি-উত্তর:"সে কি একটি পাথরের উপর? একটি সাদা-পিঁপড়া পাহাড়ের উপর? গাছের উপর? আমি কখনো ঈশ্বরকে দেখিনি!" উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তার উপাসনা করতো না; এপিকুরুদের মত তারা ভাবতো যে, তাদের কর্মকাণ্ডে গুরুত্ব দেবার মত ততটা কাছে নেই ঈশ্বর। এক এ্যাবিপোন ইন্ডিয়ান বিমূর্ত আলোচনায় বিরক্ত হয়ে কনফুসিয়াসের ভাষায় বলেছেন: "আমাদের পিতামহ এবং প্র-পিতামহগণ শুধু পৃথিবী নিয়ে চিন্তাতে অভ্যস্ত ছিলো, ঘোড়ার জন্য জমিতে ঘাস এবং পানি আছে কিনা সে চিন্তাতেই ব্যাকুল ছিলো। স্বর্গে কি হয়েছে, স্রষ্টা কিংবা তারাদের পরিচালনা করছে কে, সে ব্যাপারে তারা কখনো ভাবতে যায়নি।" এস্কিমোদের যখনই জিজ্ঞেস করা হতো যে, স্বর্গ বা মর্ত্যের স্রষ্টা কে, তারা সবসময়ই বলতো, "আমরা জানি না।" এক জুলুকে জিজ্ঞেস করা হলো,"যখন তুমি সূর্যকে উদিত বা অস্ত যেতে দেখো এবং গাছদের বাড়তে দেখো, তুমি কি জানো কে এদের বানিয়েছে বা এদের পরিচালিত করছে?" তার সাধারণ উত্তর,"না, আমরা তাদের দেখি,কিন্তু কিভাবে এসেছে জানি না; আমাদের মনে হয় তারা আপনা-আপনিই এসেছে।"

কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম এবং ধর্ম সার্বজনীন বলে পুরোনো যে বিশ্বাস তা সারগর্ভে সত্যি। দার্শনিকের কাছ এটি ইতিহাস এবং মনোস্তত্ত্বের বিশিষ্ট ঘটনাগুলোর একটি; সে এতেই পরিতৃপ্ত নয় যে, সকল ধর্মেই প্রচুর আগড়ম-বাগড়ম আছে, ববং সে এ বিশ্বাসের প্রাচীনত্ব এবং অবিনশ্বরতায় মুগ্ধ। মানুষের এ অবিনাশ্য অনুরাগের উৎস কি?

৫. ধর্মের উৎস

ভয়- বিস্ময় - স্বপ্ন - আত্মা - সর্বপ্রাণবাদ

লুক্রেটিয়াস যেমনটি বলেছে, ভয় হচ্ছে দেবতার প্রথম মাতা। সর্বোপরি, মৃত্যুভয়। আদিম জীবন হাজারটি ভয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলো এবং কদাচিৎ তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হতো; বৃদ্ধ হবার অনেক আগেই সহিংসতা অথব দুরারোগ্য কোন ব্যাধি এসে বেশিরভাগ মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। কাজেই আদিম মানুষেরা মৃত্যুকে কখনো প্রাকৃতিক বলে ভাবেনি; সে ভাবতো এটি আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ। নিউ ব্রিটেনের আদিম গোষ্ঠীর ধর্মতত্ত্বে, মৃত্যু আসতো ঈশ্বরের কোন একটি ভুলের পরিপ্রেক্ষিতে। সর্বেশ্বর কাম্বিনানা তার বোকাটে ভাই কর্ভোভাকে বলেছিলেন,"মানুষের কাছে যাও এবং বলো গায়ের চামড়া খসিয়ে দিতে; এভাবেই তারা মৃত্যুকে এড়াতে পারবে। কিন্তু সাপদের বলো যে, অতঃপর তাদের মরতেই হবে।" কর্ভোভা বার্তাটি ওলট-পালট করে ফেললো; সে সাপদের কাছে গিয়ে অমরত্বের রহস্য ফাঁস করে দিলো আর মানুষদের উপর মৃত্যুর অভিশাপ চাপিয়ে দিলো। বহু গোত্রই ভাবতো যে, মৃত্যু হয় চামড়ার সংকোচনের ফলে এবং সাপের মত নরম হতে পারলেই অমর হওয়া সম্ভব।

মৃত্যুভয়, অবোধ্য বা আকস্মিক সব ঘটনার কারণ উদ্ধার, ঐশ্বরিক পথের সন্ধান এবং সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়েই ধর্মীয় বিশ্বাসের সূচনা হয়। প্রজনন-রহস্য এবং নিদ্রাকালীন স্বপ্ন, পৃথিবী এবং মানুষের উপর স্বর্গীয় বস্তুদের প্রভাব- এসব ব্যাপারে মানুষের মনে বিস্ময় এবং কৌতূহলের জাগরণ ঘটে। ঘুমের মধ্যে সে ভূত বা অশরীরীদের দেখে মুগ্ধ হতো, ভয়ে কুকড়ে উঠতো যখন স্বপ্নের মধ্যে মৃত ব্যক্তিদের শরীর অবিকল দেখতে পেতো। মৃত ব্যক্তিদের সে মাটি চাপা দিতো যাতে আর কোনদিন ফিরে আসতে না পারে; মৃতের সঞ্চয় বা রসদপাতি-ও তার সাথে কবর দেয়া হতো যাতে অভিশাপ দেবার জন্য সে আবার ফিরে না আসে; অনেক সময় মৃত্যুর পর সেই গৃহ সবাই ত্যাগ করতো এবং অন্য জায়গায় আশ্রয় নিতো; অনেক জায়গায় মরাকে ঘরের দরজা দিয়ে বের না করে দেয়াল ছিদ্র করে বের করা হতো, ঘরের চারপাশে তিনবার ঘোরানো হতো যাতে পরবর্তীতে তার আত্মাটি ঘরে ঢোকার পথ খুঁজে না পায়।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকেই আদিম মানুষদের ধারণা হলো যে, সকল জীবিত প্রাণীর ভেতর আত্মা বা একটি গোপন জীবন থাকে, যা রোগে, নিদ্রায় বা মৃত্যুতে আলাদা হয়ে পড়তে পারে। প্রাচীন ভারতের এক উপনিষদে আছে, "কাউকে রূঢ়ভাবে ঘুম থেকে জাগানো ঠিক না কারণ আত্মা যদি ভেতরে ঢোকার রাস্তা হারিয়ে ফেলে তাহলে সেটা ঠিক করা বড়ই কঠিন।" শুধু মানুষ নয়, সবকিছুরই আত্মা আছে; বহির্বিশ্ব মৃত বা অসংবেদী নয়, এটি প্রবলভাবে জীবন্ত; তা-ই যদি না হবে, প্রাচীন দর্শন মতে, তাহলে প্রকৃতির যা ঘটনা, যেমন- সূর্যের ঘূর্ণন, হানাদার বজ্রপাত, গাছের ফিসফিস, এগুলোর ব্যাখ্যা কি? বস্তু বা ঘটনার বিমূর্ত বা ব্যক্তির-উর্ধ্বে ব্যাখ্যার অনেক আগে এসেছে ব্যক্তি-নির্ভর মতবাদ; ধর্ম

এসেছে দর্শনের আগে। এজাতীয় সর্বপ্রাণবাদই হচ্ছে ধর্মের পদ্য এবং পদ্যের ধর্ম। এর সরলতম সংরক্ষণ দেখা যায় বিস্মিত সে কুকুরটির চোখে সে অবাক হয়ে এক টুকরো কাগজকে বাতাসে ভেসে যেতে দেখে, আর ভাবে, নিশ্চয়ই কাগজের আত্মাটি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে; একই অনুভূতির উন্নত সংস্করণ ধরা পড়ে কবির ভাষায়। আদিম মনে— এবং সকল সময়ের কবি-মনে— পাথর, বন, পাহাড়, নদী, সূর্য, আকাশ, চাঁদ, তারা সকলেই আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র বস্তু কারণ এরাই অন্তরাত্মার বাহ্যিক নিদর্শন। প্রাচীন গ্রীসে আকাশ ছিলো দেবতা ঔরানস্, চাঁদ হচ্ছে সেলীন্, পৃথিবী হচ্ছে গায়া, সমুদ্র হচ্ছে পোসাইডন্ আর জঙ্গলে সর্বত্র ছিলো প্যান্। প্রাচীন জার্মানদের মতে আগেকার জঙ্গলে বাস করতো জেনি, এল্ভ্, ট্রল্, দৈত্য, বামন ও পরী; ওয়েগণারের সুরে আর ইস্বেনের নাটকে এসব বন্য জন্তুরা টিকে আছে। আয়ারল্যান্ডের সাধারণ মানুষেরা এখনও পরীর গল্পে বিশ্বাস করে; এদের উল্লেখ ছাড়া কোন কবি বা নাট্যকার আয়ারল্যান্ডের পুনর্জাগরিত সাহিত্যে স্থান নিতে পারে না। তবে, সর্বপ্রাণবাদে বিচক্ষণতা এবং সৌন্দর্যের ছাপ আছে, সকল বস্তুকে জীবন্ত ভেবে যত্ন করা ভালো। চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য সংরক্ষণশীল সবচে' সংবেদনশীল লেখক লিখেছেন,

"প্রকৃতি বহু জীবিত সত্তার ভান্ডার হিসেবে নিজেকে উন্মোচন করতে শুরু করেছে, এদের কিছু দৃশ্যমান, কিছু অদৃশ্য, কিন্তু সবার মধ্যে আত্মার একটি অংশ আছে, শারিরীক একটি অংশ আছে এবং এ দুটির মিলনেই রহস্যময় অস্তিত্বের সূচনা... বিশ্বের সর্বত্রই দেবতা! শক্ত এবং ভঙ্গুর, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র, স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে গোপন ফন্দিতে ছুটে চলা সকল বস্তু, প্রতিটি গ্রহ এবং প্রতিটি পাথর থেকে একটি অস্তিত্বের আভাস ভেসে আসে। ঈশ্বর-সুলভ শক্তির এরকম সংখ্যাধিক্যে আমরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ি।"

৬. উপাসনার বস্তু

সূর্য- তারা - পৃথিবী প্রজনন - প্রাণীকূল - টোটেমের উপাসনা - মনুষ্য-দেবতায় অবতরণ - প্রেতের উপাসনা - পূর্বজদের উপাসনা

যেহেতু সবকিছুরই প্রাণ আছে, অথবা সবার ভেতরেই ঈশ্বর লুক্কায়িত আছে, কাজেই ধর্মীয় উপাসনার জন্য উদ্দীষ্ট বস্তু ছিলো অসংখ্য। এর ছয়টি গোত্রে পড়ে: আস্মানী, পার্থিব, প্রজননগত, প্রাণীকূল, মানব এবং ঐশ্বরিক। আমাদের পক্ষে কখনোই জানা সম্ভব নয় যে, কোন্ গোত্রের বস্তুকে সবার আগে পূজা দেয়া হয়েছে। সম্ভবত প্রথম দিককার একটি হচ্ছে চাঁদ। যেভাবে আমাদের লোকগীতিগুলো,"চাঁদের মানুষ" নিয়ে কথা বলে, আদিম লোকগাঁথাগুলোতেও চাঁদকে দেখা যায় সাহসী এক পুরুষ হিসেবে, যে পৃথিবীর সকল নারীকে প্ররোচিত করে রজঃস্রাব ঘটাতো। চাঁদ ছিলো নারীর প্রিয় দেবতা, সে ছিলো তাদের রক্ষাকর্তা। এ মলিন গোলকটি দিয়ে সময় নির্ধারণ হতো; ভাবা হতো যে, সে

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, বৃষ্টি এবং তুষারপাত ঘটায়; এমনকি ব্যাঙেরাও বৃষ্টির জন্য তার কাছে প্রার্থনা করতো। আমরা জানি না আদিম ধর্মে কখন আকাশের ঈশ্বর হিসেবে সূর্য চাঁদকে প্রতিস্থাপিত করেছে। সম্ভবত এটি তখনই হয়েছে যখন চাষাবাদ শিকারকে প্রতিস্থাপন করেছে এবং সূর্যের অবস্থানের দ্বারা শস্য রোপন বা তোলার ঋতু নির্ধারণ হয়েছে এবং সূর্যের তাপ-ই মাটির উর্বরতার উৎস বলে বোঝা গেছে। তারপর পৃথিবী হলো দেবী আর সূর্য হলো দেবতা, যার রশ্মিতে সকল জীবিত সত্ত্বার জন্ম হয়। এ সরল সূত্রের রেশ ধরে সূর্য-উপাসনা পৌঁছে যায় প্রাচীন পৌত্তলিক বিশ্বাসে এবং পরবর্তী বহু দেবতা আসলে সূর্যের-ই আরেক রূপ। বিজ্ঞ গ্রীকরা অ্যানাসাগোরাস্‌কে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলো কারণ সে মনে করতো যে, সূর্য কোন দেবতা নয়, আগুনের সাধারণ এক গোলক, যা আকারে পেলোপনেসাসের সমান। মধ্য যুগে সূর্য-উপাসনার কিছুটা অবশেষ দেখা যেতো সাধুদের চিত্রে মাথার চারদিকে সূর্যের আভার অংকনে এবং এ যুগেও জাপানের বেশিরভাগ নাগরিক তাদের সম্রাটকে সূর্যের প্রতিমূর্তি বলেই মনে করে। পুরোনো এমন অন্ধবিশ্বাস কমই আছে যা এখনো কোথাও না কোথাও জীবিত নেই। সভ্যতা আসলে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের শ্রম এবং দৈবাৎ পাওয়া এক ফসল; মূল জনগণ যুগ থেকে যুগে সামান্যই পাল্টায়।

সূর্য এবং চন্দ্রের মত, প্রতিটি তারা-ও ছিলো, বা তাদের ভেতরে নিহিত ছিলো, একজন দেবতা এবং আত্মার ডাকে সাড়া দিয়েই এরা বিচরণ করে বেড়াতো। খ্রীস্টানধর্মে এসে এসব আত্মারা হয়ে গেলো দেবদূত বা গাইডিং এঞ্জেল; কেপলার-ও এদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতো। আকাশ নিজেই ছিলো বিরাট এক দেবতা; বৃষ্টি দেয়া বা বন্ধ করার জন্য তার উপাসনা করা হতো। বহু আদিম গোত্রেই 'আকাশ' শব্দটি 'ঈশ্বর' শব্দের সমার্থক ছিলো; লুবারি এবং দিন্‌কা গোত্রে ঈশ্বরের অর্থ বৃষ্টি। মোঙ্গলদের প্রধান দেবতা ছিলো তেঙ্গরি-আকাশ; চীনে তি-আকাশ; ভারতের বেদগ্রন্থে দিয়াসূস পিতার— পিতৃ-আকাশ; গ্রীকদের জিয়ুস-আকাশ, "মেঘের শাসক"; পারস্যে আহুরা-নীল আকাশ (ইংরেজী-অ্যাযার); আমাদের মধ্যে এখনও প্রাণ রক্ষার্থে 'স্বর্গ'কে ডাকা হয়। বেশিরভাগ আদিম পুরাণে জগতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর মিলনস্থল।

যেহেতু পৃথিবী ছিলো একজন দেবী, তার সকল অভিমুখেই মানুষ এক-একজন দেবতার দেখা পেতো। গাছের-ও ঠিক মানুষেরই মতো প্রাণ ছিলো, গাছ কাটা ছিলো খুনের শামিল; উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানরা মনে করে, শ্বেতাঙ্গরা গাছ কেটে ফেলাতেই তাদের পরাজয় বা বিলুপ্তি হয়েছে, কারণ গাছের আত্মাই 'লাল মানব'দের রক্ষা করতো। মলুক্কা দ্বীপে ফলধারী গাছকে গর্ভধারিণীরূপে বিবেচনা করা হতো; এমন শোরগোল, আগুন বা অন্যান্য বিরক্তিকর কাজ নিষিদ্ধ ছিলো যার ফলে এদের শান্তি বিনষ্ট হতে পারে; নয়তো, ভীত-সন্ত্রস্ত নারীর মত সময়ের আগেই ফলটি খসিয়ে দিতে পারে। অ্যামবয়নাতে আবাদি ধানক্ষেতের আশেপাশে বিকট শব্দ করা নিষিদ্ধ ছিলো, যাতে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়ে না

পড়ে। প্রাচীন গলরা কিছু বিশেষ জঙ্গলের গাছকে পূজা করতো; ইংল্যান্ডের ড্রুয়িড যাজকেরা ওক গাছে আশ্রিত মিশলটো পরগাছাকে পবিত্র মনে করতো— এগুলো একটি ধর্মীয় আচারের ইঙ্গিত দেয়। গাছ, ঝর্ণা, নদী বা পাহাড়ের প্রতি এ জাতীয় ভক্তি-ই হচ্ছে এশিয়ার সবচে' পুরোনো ধর্ম। অনেক পাহাড় ছিলো পুণ্যস্থান, বজ্রধারী দেবতার বাসভূমি। দেবতা বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাকালে ভূমিকম্প হতো : ফিজিবাসী মনে করতো, দেবতা পাশ ফিরে শু'লে এমন হয়; সামোয়ারা এ সময় মাটি আঁকড়ে ধরে মাফুই দেবতাকে থেমে যাবার অনুরোধ করতো যাতে পৃথিবী ভেঙ্গে খান খান হয়ে না পড়ে। প্রায় সব জায়গাতেই পৃথিবী ছিলো মহা-মাতা; আমাদের ভাষা, যা মাঝেমধ্যে আমাদের আদিম বা অবচেতন বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে, আজও দুটি শব্দের গাঢ় সম্পর্কের আভাস দেয়— ম্যাটার (ম্যাটেরিয়া) মাটি এবং মাদার (মেটের) মাতা। ইশ্‌তার এবং সিবেল, দিমিতার এবং সেরেস্, আফ্রোদিতি, ভেনাস এবং ফ্রেয়া- এরা প্রাচীন ভূ-দেবীর তুলনামূলক পরবর্তী সংস্করণ, যাদের উর্বরতায় উর্বর ছিলো মাটি; তাদের জন্মে বা বিবাহে তাদের মৃত্যুতে বা পুনর্জন্মে শস্যক্ষেত্র পল্লবিত হতো, বিনষ্ট হতো বা বসন্তের আগমন হতো। এইসব দেবত্বের স্ত্রী-সূচক লিঙ্গে উল্লেখ বা স্ত্রী লিঙ্গে অবতরণ-ই প্রমাণ করে যে, চাষাবাদের সাথে নারীর যোগাযোগ বেশ পুরোনো বা প্রাথমিক। চাষাবাদ যখন মানব জীবনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। এ সম্পর্কিত দেবীরাও সর্বোচ্চ আসনে স্থান পেলো। বেশিরভাগ দেব-শাসন ছিলো দেবীর হাতে তার; যখন পুরুষ-শাষিত সমাজ-ব্যবস্থা চালু হলো, স্বর্গেও প্রতিফলন ঘটলো এবং দেবতাদের আগমন বেড়ে গেলো।

আদিম বর্বরের কবি-মন যেমন গাছের বেড়ে ওঠাতে অলৌকিকতার আভাস পায়, কাজেই গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্ম নেবার ব্যাপারটিকে সে অতি-প্রাকৃত কোন ঘটনা বলে মনে করে। বর্বর জরায়ু চেনে না, শুক্রানু বিষয়ক জ্ঞান-ও তার নেই; সে শুধু বাহ্যিক কাণ্ডটাই দেখে এবং তার উপর দেবত্ব আরোপ করে; জন্মদাত্রীর ভেতরে শুভ এক আত্মা আছে এবং তার উপাসনা করা উচিৎ, কারণ এ অলৌকিক সৃষ্টিশীল শক্তিই কি সবচে' মুগ্ধকর নয়? মাটির চে'ও তাদের ভেতর বেশি উর্বরতা বা বর্ধনের শক্তি থাকে; কাজেই এরাই হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির মূর্ত প্রকাশ। প্রায় সকল আদিম সমাজই কোন এক ধর্মীয় প্রথায় প্রজননশক্তির উপাসনা করেছে; শুধু নিম্ন শ্রেণীর সমাজই নয়, একেবারে উচ্চশ্রেণীর জাতিরাও সর্বতোভাবে এর চর্চা করেছে; মিশর এবং ভারত, ব্যাবিলন এবং আসিরিয়া, গ্রীস এবং রোমে আমরা এর চর্চা দেখতে পাই। প্রাচীন দেব-দেবীদের মধ্যে যৌন-মিলনের চরিত্রগুলো এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হতো; এর পেছনের কারণটি মনের অশ্লীলতা নয়, কারণটি হচ্ছে নারী ও পৃথিবীর উর্বরতাকে তখন প্রবল অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখা হতো। সাপ এবং ষাঁড়ের মত কিছু প্রাণীকে 'উপাসনা করার কারণ হচ্ছে, মনে করা হতো, এরা বংশবৃদ্ধির ঐশ্বিক শক্তি নিয়ে জন্মেছে। ইডেনের গল্পে সাপ ছিলো উদ্ধত পুংলিঙ্গের প্রতীক,

ভালো মন্দের জ্ঞানের শুরুই হয়েছে যৌনতার জাগরণ দিয়ে; এখানে সম্ভবত নিষ্কলঙ্কতা এবং স্বর্গসুখ বিষয়ক একটি বিশেষ প্রবাদের সূচনা করা হয়েছে।

মিশরীয়দের গুবরে পোকা থেকে শুরু করে হিন্দুদের হাতি পর্যন্ত, প্রকৃতিতে এমন প্রাণী কমই আছে যাকে কোথাও না কোথাও দেবতা বানিয়ে পূজো করা হয়নি। ওজিব্ওয়া ইন্ডিয়ানরা তাদের বিশেষ ঐশ্বরিক প্রাণীকে এবং যে বংশের লোকেরা এর পূজো করতো, তাদের 'টোটেম' নামে ডাকতো; এবং এই বিভ্রান্তিকর শব্দটি নৃতত্ত্বে 'টোটেমবাদ' নামে স্থান পেলো। এতে বোঝানো হতো, একটি নির্দিষ্ট বস্তুর উপাসনা করা— সাধারণত একটি প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ— যা একটি গোত্রে ঐশ্বিকরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। বিশ্বের বিভিন্ন যোগাযোগহীন প্রান্তে বিভিন্নরকম টোটেমবাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ান থেকে আফ্রিকার উপজাতি, ভারতের দ্রাবিড় থেকে অস্ট্রেলিয়ার উপজাতি। গোত্রের সদস্যদের এক করার কাজে ধর্মীয় বস্তু হিসেবে টোটেম বেশ সহায়তা করেছে; সবাই ভাবতো যে, এ টোটেমের দ্বারা তারা আবদ্ধ অথবা এর থেকেই তাদের জন্ম। ইরোকুয়িসরা আধা-ডারউইনের মতো বলতো যে, তারা ভালুক, নেকড়ে বা হরিনের সাথে রমনীদের মিলনে জন্ম নিয়েছে। টোটেম-বস্তু বা প্রতীক হিসেবে— আদিম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা পরিচয়ের চিহ্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো; ইহজাগতিকতার চক্রে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে এটি ম্যাসকট বা সৌভাগ্যদায়ী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে, যেমন— বিভিন্ন দেশের সিংহ বা ঈগল, ভ্রাতৃসুলভ শৃংখলার এলক বা মুজ্ (বৃহৎ হরিণ বিশেষ), এবং সেসব বোবা প্রাণী যা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর হাতি-সুলভ অসাড়তা এবং খচ্চর-সুলভ উচ্ছৃংখলতার প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রীস্টান ধর্মের জন্মলগ্নে ঘুঘু, মাছ বা ভেড়ার প্রতীকী ব্যবহার টোটেম ভক্তির নিদর্শন; এমনকি শূকরের মত নীচু জাতের প্রাণীও একসময় আদি ইহুদিদের টোটেম ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই টোটেম প্রাণীটি ছিলো অস্পৃশ্য— নিষিদ্ধ, ধরা ছোঁয়া বারণ; বিশেষ ধর্মীয় কারণে একে খাওয়া যেতো। ঈশ্বর বা দেবতাকে খেয়ে ফেলার রীতি-ও ছিল।

কল্পনাপিয়াসী ফ্রয়েডের মতে, টোটেম ছিল ঈশ্বরের আরেক শারিরীক রূপ, যার অসীম শক্তির জন্য মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো ও ঘৃণা-ও করতো, এবং বিদ্রোহীর বেশে হত্যা ও ভক্ষণ-ও করতো। ডার্খেইম ভেবেছিলেন যে, টোটেম হচ্ছে বংশের প্রতীক, সর্বময় ক্ষমতা এবং বিরক্তিকর আধিপত্যের কারণে একইসাথে শ্রদ্ধা এবং ঘৃণার পাত্র (কাজেই 'পবিত্র' এবং 'অপরিষ্কার'); এবং ধর্মীয় অনুভূতি আসলে কর্তৃত্বশালীর প্রতি সাধারণের অনুভূতির অনুরূপ। আবিসিনিয়ার গালারা যে মাছের পূজা করতো, সে মাছই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্ষণ করতো এবং বলতো "খাওয়ার পর তার আত্মা যেন আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়ায়।" গালাদের মধ্যে গস্পেল্ পাঠ করতে গিয়ে মিশরীয়রা বিস্মিত হয়েছিলো কারণ এ সাধারণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এক আচরণের সাথে 'সিরিমনী অব্ দ্য মাস্'-এর ভয়ানক মিল।

আরো অনেক ধর্মীয় প্রথার মতো, টোটেম পূজার উৎপত্তি-ও সম্ভবত ভয় থেকে; মানুষ পশু-পূজা করতো কারণ পশুরা শক্তিশালী এবং তাদেরকে প্রশমিত করে রাখতে হতো। শিকারের কারণে যখন বন খালি হয়ে গেল এবং চাষাবাদের তুলনামূলক নিশ্চয়তা নিশ্চিৎ হলো, পশু-পূজার পরিমানও কমে গেলো, যদিও এটা কখনোই থেমে যায়নি; প্রথমদিককার মনুষ্য-দেবতার হিংস্রতা সম্ভবত পশু-দেবতার কাছ থেকে ধার নেয়া হয়েছে। সকল ভাষার রূপকথার গল্পগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা চোখে পড়ে যেখানে মেটামর্ফোসিস্ বা শারিরীক রূপান্তরের জনপ্রিয় সব গল্প থাকে— দেবতা কিভাবে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো বা আগে পশু ছিলো। পরবর্তীতে এসব পাশবিক গুণাগুণ একগুঁয়ের মত দেবতার চরিত্রে আটকে থাকলো, যেভাবে গ্রাম্য নাগরের গায়ে আস্তাবলের গন্ধ বিশ্বাসীর মতে আটকে থাকে; এমনকি, হোমারের মত জটিল মনোস্তাত্ত্বিকের কল্পনাতেও 'গ্লকোপিস এথেনের' ছিলো প্যাঁচার চোখ আর 'হেরে বুপিসে'র গরুর চোখ। মিশর এবং ব্যাবিলনের দেবতা বা রাক্ষসদের মানুষের মাথা আর পশুর দেহে একই রূপান্তর এবং একই স্বীকারোক্তির আভাস মেলে যে, বহু মনুষ্য-দেবতাই একসময় ছিলো পশু-দেবতা।

শুরুর দিকে বেশিরভাগ দেবতাই ছিলো মৃত আদর্শ ব্যক্তি। স্বপ্নে মৃত ব্যক্তির আগমনের স্মৃতি তাকে উপাসনা করবার কারণ হিসেবে যথেষ্ট ছিলো, কারণ উপাসনা ভয়ের সন্তান না হলেও, ভাই তো বটেই। যেসব মানুষ জীবদ্দশায় অনেক ক্ষমতাধর ছিলো এবং ভয়ের পাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলো, মৃত্যুর পর তাদেরই উপাসনা হতো। অনেক আদিম গোত্রেই দেবতা শব্দের অর্থ ছিলো 'মৃত মানুষ'। এখনও ইংরেজী শব্দ স্পিরিট এবং জার্মান শব্দ গেইস্ট অর্থ প্রেতাত্মা এবং আত্মা। খ্রীস্টানরা যেমন সেইন্ট বা সন্ন্যাসীদের সাহায্য কামনা করতো, গ্রীকরা তাদের মৃত পূর্বজদের সাহায্য প্রার্থনা করতো। মৃতরা যে আসলে জীবিত এবং অন্য এক ধরনের জীবন যাপন করে, এ বিশ্বাস এতোটাই কঠিন ছিলো যে, আদিম মানুষেরা কখনো কখনো তাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই বার্তা পাঠাতো; এ জাতীয় এক চিঠি পাঠানোর জন্য এক গোত্রের নেতা তার ভৃত্যকে চিঠিখানি পড়ে শোনায় এবং 'বিশেষ প্রেরণে'র স্বার্থে তার মাথাটি কেটে আলাদা করে ফেলে; প্রথম চিঠিতে ভুল ত্রুটি বা কিছু বাদ পড়ে গেলে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় চিঠি পাঠিয়ে দিতো।

ক্রমান্বয়ে প্রেতাত্মার পূজা থেকে পূর্বজদের পূজা শুরু হয়। সকল মৃত ব্যক্তিকেই ভয় করা হতো এবং তাদের প্রসন্ন রাখতে হতো, নয়তো তারা অভিশাপ দিতো বা জীবিতদের অনিষ্ট করতো। পূর্বজ-পূজা সমাজের স্থায়িত্ব, সামাজিক নিয়মান্ত্রিকতা, রক্ষণশীলতা বা শৃঙ্খলা এমনভাবে নিশ্চিৎ করলো যে, এটি সহসাই বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। মিশর, গ্রীস বা রোমে এ রীতির চলন ছিলো, এখনও চীন ও জাপানে এ রীতি গভীরভাবে চালু আছে; বহু জাতি কোন দেবতার পূজা করতো না, কিন্তু পূর্বজদের পূজা করতো। পূর্বজ-পূজার পদচিহ্ন রূপে অবশিষ্ট আছে গোরস্থানের যত্ন নেয়া এবং কবর জোয়ারতি

অথবা মৃত ব্যক্তির জানাজায় সমবেত হওয়া এবং প্রার্থনা করা। প্রজন্মগত মতবিরোধের পরও বৃহদ্ পরিবারকে এক করে রাখার ক্ষেত্রে পূর্বজ পূজা বিরাট ভূমিকা রেখেছে এবং আদিম সমাজগুলোতে অদৃশ্য এক কাঠামোর সৃষ্টি করেছে। আর যখন বাধ্যবাধকতা থেকে উপলব্ধির জন্ম হয়েছে, ভয় রূপ নিয়েছে ভালোবাসার। ত্রাসের থেকে জন্ম নেয়া পূর্বজ-পূজা পরবর্তীতে সম্ভ্রমের অনুভূতি জাগিয়েছে এবং অবশেষে ধর্মানুরাগ বা ভক্তির জন্ম দিয়েছে। দেবতাদের একটি সাধারণ প্রবণতা থাকে প্রথমে রাক্ষস রূপে আবির্ভাবের, পরে দয়ালু পিতারূপে প্রতিষ্ঠার; ভক্তেরা তখন দেবতাটিকে নিরাপত্তা, শান্তি বা নৈতিকতার আধার বলে মনে করে এবং আগেকার হিংস্র মুখটিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত বা নমনীয় করে তোলে। দেবতাদের মেজাজের উন্নয়নের ধীর গতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সভ্যতার উন্নয়নের ধীর গতি।

মনুষ্যদেবতার ভাবনাটি উন্নয়নের এক সুদীর্ঘ পথের শেষ ধাপ; চারপাশের সমস্ত কিছু এবং এক সমুদ্র পরিমাণ আত্মা-প্রেতাত্মার ভেতর থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে অবশেষে মনুষ্য দেবতার আবির্ভাব হয়েছে। পরিচয়হীন এক নিরাকার আত্মার ভয় বা উপাসনা থেকে সরে গিয়ে মানুষ নাক্ষত্রিক বস্তু, ফলনদার উদ্ভিদ এবং বংশবৃদ্ধিগত প্রজনন ক্ষমতার উপাসনা করতে শুরু করে। তারপর আসে পশু-পূজা এবং পূর্বজ-পূজার যুগ। ঈশ্বরকে পিতা বলার কারণ সম্ভবত পূর্বজ-পূজা; এটি মূলত বোঝায় যে, মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই শারীরিক ভাবে জন্ম লাভ করেছে। আদিম ধর্মতত্ত্বে মানুষ এবং দেবতার মধ্যে মৌলিক বা শক্ত কোন তফাৎ নেই; যেমন, আগেকার গ্রীকদের মধ্যে পূর্বজরা ছিলো দেবতা-প্রতীম এবং সকল দেবতাই ছিলো গ্রীক বংশোদ্ভূত পূর্বজ। উন্নয়নের পরবর্তী ধাপটি হচ্ছে, অসংখ্য পূর্বজদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে পরিচিত কিছু পূর্বজদের উপাসনার জন্য আলাদা করা; কাজেই ক্ষমতাধর রাজাগণই হলো দেবতা, কখনো কখনো তাদের মৃত্যুর পূর্বেই। কিন্তু এ ধাপে পা দেবার সাথে সাথে আমরা লিখিত/ঐতিহাসিক সভ্যতায় পদার্পণ করেছি।

৭. ধর্মের পদ্ধতিসমূহ

যাদুকলা-উদ্ভিদের ফলন বিষয়ক ধর্মীয় কৃত্য-ফেসটিভল্ অব লাইসেন্স (বিয়ের অনুমতি)-পুনরুত্থিত দেবতাদের কাহিনী- যাদু এবং কুসংস্কার- যাদু এবং বিজ্ঞান-পুরোহিত।

প্রকৃত ধরণ বা অস্তিত্বের উদ্দেশ্য না জানা এক পৃথিবী আত্মা-প্রেতাত্মার মাঝে পড়ে আদিম মানুষ চেষ্টা করেছে এদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং এদের সহায়তা পেতে। সর্বপ্রাণবাদ, যা ছিলো আদিকালের ধর্মের মূলবস্তু, তার সাথে যুক্ত হয়েছিলো যাদুকলা, যাকে বলা যায় আদিম লোকাচারের অন্তরাত্মা। পলিনেশীয়রা একগাদা যাদুকলায় বিশ্বাস করতো, তাদের ভাষায় 'মানা'; তারা ভাবতো যাদুকরেরা এসব অবিশ্বাস্য যাদুশক্তি আয়ত্ব করতে পারতো। যে

প্রক্রিয়ায় এসব আত্মাকে, বা পরবর্তীতে দেবতাগণকে মানুষের মঙ্গলে কাজ করবার জন্য পরামর্শ দেয়া হতো, তাকে বলা যায় 'সহানুভূতি আদায়ের যাদু'— মানুষ একটি কাজ আংশিক বা পূর্ণরূপে করে আত্মাদের দেখিয়ে দিতো যে তাঁর কি করা উচিৎ। বৃষ্টি দেয়ার জন্য যাদুকরেরা গাছের ওপর থেকে পানি ঢেলে মাটি ভিজিয়ে দেখিয়ে দিতো। খরার সম্ভাব্য আগমনে কাফিররা এক মিশনারীকে খোলা ছাতা নিয়ে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলো। সুমাত্রায় এক বন্ধ্যা নারী গর্ভধারণের আশায় শিশুর ছবি এঁকে পেটে চেপে ধরেছিলো। বাবর দ্বীপপুঞ্জে মা হতে ইচ্ছুক এক নারী লাল সুতার এক পুতুল বানিয়ে তাকে স্তন্যদানের ভান করছিলো, সাথে এক যাদুমন্ত্র পাঠ করছিলো; তারপর সে গ্রামে খবর ছড়িয়ে দিলো যে সে গর্ভবতী এবং তার বন্ধুরা তাকে সাধুবাদ জানাতে এসেছিলো; খাঁটি করুন বাস্তবতা ছাড়া আর কেউ এ স্বপ্ন ভাঙ্গার সাহস করবে না। বোর্নিওর ডিয়াকদের এক যাদুকর সন্তান-সম্ভবা এক মায়ের ব্যথা দূর করবার জন্য নিজের শরীর দুমড়ে-মুচড়ে হবু-বাচ্চাটিকে যাদুবলে বের হয়ে আসতে বলছিলো; মাঝে মধ্যে একটি পাথর মায়ের পেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে মাটিতে ফেলছিলো এ আশায় যে, বাচ্চাটিও তারে অনুসরণ করবে। মধ্যযুগে এক যাদুটোনার রীতি ছিলো এমন যে, শত্রুর মোমে-বানানো-মূর্তিতে আলপিন গেঁথে দেয়া হতো; পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানরা লোকের পুত্তলিকা বানিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতো আর তাদের ভাষায় এটি ছিলো আত্মার জ্বলন। আধুনিক জনতা ও আদিম এ যাদুকলার উর্দ্ধে ভাবেন না।

উদাহরণ সৃষ্টি করে দেবতাদের পরামর্শ দেবার এ পদ্ধতি বিশেষত ব্যবহৃত হতো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে। আদিকালের জুলু ডাক্তারগণ কোন প্রতাপ-পুরুষ মারা গেলে তার যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে, গুড়ো করে মাঠে ছিটিয়ে দিতো। কিছু জাতি 'মে মাসের রাজা-রানী' নির্বাচন করতো, কোথাও 'হুইটসান্ বর কনে' নির্বাচিত হতো, জনসম্মুখে তাদের বিয়ে দেয়া হতো যাতে ফসলের মাঠের টনক নড়ে এবং শস্য উৎপাদন করে। কিছু অঞ্চলে বিয়ের পর জনসম্মুখে মিলিত হবার রীতি ছিলো যাতে, মাটি যদি অসার পিন্ড-ও হয়ে থাকে, তার সত্যিকারের দায়িত্ব বুঝতে না পারার কোন কারণ না থাকে। জাভাতে প্রজারা ধানক্ষেতের মধ্যে তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতো। আদিম মানুষেরা মাটির উর্বরতায় নাইট্রোজেনের ভূমিকা বুঝতো না; গাছের লিঙ্গ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিলো না, তারা উর্বরতার ব্যাপারটিকে নারীদের উর্বরতার সাথে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে। আমাদের এখনকার ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও তাদের সেই কাব্যিক বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ফেসটিভল্ অব্ প্রমিস্কুইটি (বাছবিচারহীনতার উৎসব), সাধারণত বীজ বপনের ঋতুতে অনুষ্ঠিতব্য, যা আগেকার নীতিবোধের স্মৃতিচরণ করে (আগেকার তুলনামূলক যৌন স্বাধীনতার স্মৃতি বহন করে), আংশিকভাবে অক্ষম পুরুষের স্ত্রীদের গর্ভধারণে সহায়তা করে এবং আংশিকভাবে পৃথিবীকে পরামর্শ দেয় তার শীতের জীর্ণতা ছেড়ে বসন্তের বস্ত্র পরিধানে, নিবেদিত বীজ গ্রহণ করবার জন্য

এবং ফসলে ভরে তুলতে নিজেকে প্রস্তুত করবার জন্যে। এ জাতীয় উৎসব অসংখ্য গোত্রেই পালিত হতো। তবে প্রধানত কঙ্গোর ক্যামেরুনদের মধ্যে, কাফির, ইটেনটট্ এবং বান্টুদের মধ্যে। বান্টুদের সম্বন্ধে এইচ, রাউলী বলেন, "তাদের ফসল কাটার উৎসবটি বাক্কুর ভোজন উৎসবের অনুরূপ ... এটি প্রত্যক্ষ করে লজ্জিত না হয়ে উপায় নেই... নব দীক্ষিতদের শুধু যে যৌনাচারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয় তা-ই নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাধ্য করা হয়, এমনকি দর্শনার্থীদেরকেও উৎসবে যোগদানে উৎসাহ দেয়া হয়। খোলামেলা বেশ্যাবৃত্তির চর্চা চলে, পারিপার্শ্বিকতার বিচারে মনে হয় ব্যভিচারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। এ উৎসবে অংশগ্রহণ ছাড়া কেউই তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের অনুমতি পায় না। ঐতিহাসিক সভ্যতার ভেতরেও এমন উৎসবের আর্বিভাব লক্ষ্য করা যায় : গ্রীকদের বাকীক উৎসব, রোমের সেটারনালিয়া, মধ্যযুগের ফ্রান্সের ফিটে দেস্ ফোউস্, ইংল্যান্ডের 'মে ডে' এবং সমকালীন কার্নিভাল বা মাদ্রি গ্যাস' উৎসবে।

অন্যান্য জায়গায়, যেমন— পনি বা গুয়াইয়াকুইল্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মাটির উর্বরতার উৎসব ছিলো আরেকটু কম চিত্তাকর্ষক। রোপনের ঋতুতে জমির উপর একটি মানুষ বা পরবর্তীতে একটি পশুকে বধ করা হতো যাতে তার রক্তে মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। ফসলের আগমনে মনে করা হতো যে, মৃত মানুষটির পুনরুত্থান হয়েছে; তার মৃত্যুর আগে ও পরে তাকে দেবতার সম্মাননা দেয়া হতো; এবং এখান থেকেই ধারণা এসেছে, হাজারো রূপে, সার্বজনীন সে লোক গাঁথার, যেখানে দেবতারা তার জাতির জন্য মারা যায় এবং পরবর্তীতে বিজয়ীর বেশে আবার ফিরে আসে। যাদুকলার চারপাশ কবিতায় মোড়া এবং কাব্যে রূপান্তর করে তাকে ধর্মতত্ত্বে স্থান দিয়েছে। উর্বরতার উৎসবের মধ্যে সৌর বিষয়ক কল্পকাহিনীর সংযোগ ঘটেছে; দেবতার মরা এবং বাচার গল্প শুধুমাত্র শীত-বসন্তে পৃথিবীর রূপ পরিবর্তনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সূর্যের শারদীয় বা বাসন্তিক আনাগোনা এবং দৈনন্দিন দিবারাত্রির পরিবর্তনেও ব্যবহৃত হয়েছে। রাত্রির আগমন ছিলো এই নাটকের বিয়োগাত্মক এক অংশ; প্রতিদিন সূর্যদেব জন্মাতো এবং মারা যেতো; প্রতিটি সূর্যাস্ত ছিলো ক্রুসিফিকশান্ (যীশুকে ক্রুশে চড়ানো) এবং প্রতিটি সূর্যোদয় ছিলো রিজারেক্শান (যীশুর পুনরুত্থান)।

মানুষ বলি দেবার প্রথা, যার বহুবিধ প্রকারভেদের মধ্যে এটি হচ্ছে জমির উর্বরতা সম্বন্ধীয়, প্রায় সকল অঞ্চলে কোন এক সময় প্রচলিত ছিলো। মেক্সিকো উপসাগরের ক্যারোলিনা দ্বীপে একটি ধাতব ফাঁপা মূর্তি পাওয়া গেছে যার ভেতর দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত মানব শরীরের জ্বলে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ এখনো লেগে আছে। সবাই মোলোকের গল্প শুনেছে যাকে ফিনিশীয়, কার্থোজিনীয় বা কখনো কখনো অন্যান্য সেমিট্রা মানব-বলির পূজা দিতো। রোডেশিয়াতে এখনো এরকম প্রথা চালু আছে। সম্ভবত নর ভক্ষণের সাথে এর কোন একটা সংযোগ আছে; মানুষ হয়তো ভেবেছে যে, ঈশ্বরের স্বাদজ্ঞান-ও তাদের মত। ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন অন্যান্য বিশ্বাসের চে' কম গতিতে পাল্টায় এবং ধর্মীয় প্রথা পাল্টাতে যেমন

অন্যান্য লোকাচারের চে' বেশি সময় লাগে, তাই মানুষের নরভক্ষণ উঠে যাবার পরও ঈশ্বরের নরভক্ষণ জারি ছিলো। তদুপরি, ধীরে ধীরে বিকশিত নীতিবোধ ধর্মীয় কৃত্যের পরিবর্তন করেছে; ধীরে ধীরে দেবতারা স্বয়ং পূজারীদের নম্রতা গ্রহণ করেছে এবং নরমাংসের পরিবর্তে পশুর মাংসেই সন্তুষ্ট থেকেছে; তাই ইফিজেনিয়ার জায়গায় হরিণ এসেছে আর ইব্রাহিমের সন্তানের জায়গায় দুম্বা। কালান্তরে দেখা গেছে, ঈশ্বরের ভাগ্যে পশু ও জুটতো না; পুরোহিতেরা আসলটা খেয়ে ফেলতো, নৈবেদ্য হিসেবে থাকতো শুধু হাড়গোড়ের অবশেষ।

আগেকার মানুষ যেহেতু বিশ্বাস করতো যে, যে প্রাণীটিকে খেতো সে প্রাণীর শক্তি তার শরীরে স্থাপিত হতো, তাই সে এক সময় দেবতাদের খাওয়া শুরু করলো। কোন কোন ক্ষেত্রে সে কোন একটিকে দেবত্ব দান করে, তাকে খাইয়ে মোটা তাজা করে, তারপর তার বিসর্জন দিতো এবং তার মাংস খেতো, রক্ত পান করতো। খাদ্যাভাব দূর হবার পর যখন সে কিছুটা মানবিক হয়ে উঠলো। তখন সে দেবতার ছবি এঁকে তাকে খেতে লাগলো। মেক্সিকোতে শস্য, বীজ বা শাক সবজি দিয়ে ঈশ্বরের মুখাবয়ব বানানো হতো, তাকে বলিকৃত শিশুর রক্ত দিয়ে পিষে মন্ড বানানো হতো এবং তারপর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে ঈশ্বরকে খাওয়া হতো। একই রকম কৃত্যানুষ্ঠান আরো অনেক আদিম গোত্রে দেখা যায়। অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত এর আগে উপবাস করতো; পুরোহিত যাদুমন্ত্রের সাহায্যে খাবারের মধ্যে ঈশ্বরের অবয়ব ফুটিয়ে তুলতো।

যাদুকলা শুরু হয়েছে অন্ধ বিশ্বাস দিয়ে, আর শেষ হয়েছে বিজ্ঞান দিয়ে। সর্বপ্রাণবাদ থেকে অদ্ভুৎ কিছু বিশ্বাস, অদ্ভুৎ কিছু সমীকরণ বা প্রথার জন্ম হয়েছিলো। কুকিরা তাদের যুদ্ধের সময় এই বলে উৎসাহ দিতো যে, যে কটা শত্রুকে সে হত্যা করতে পারবে। পরজন্মে সবাই তার দাস হয়ে থাকবে। অপরপক্ষে, বান্টুরা কাউকে হত্যা করলে নিজের মাথা কামিয়ে তাতে ছাগবিষ্ঠা লেপে দিতো যাতে মৃতের আত্মা ফিরে এসে তার মাথায় ঢুকে বিরক্ত করতে না পারে। প্রায় সকল আদিম মানুষই অভিশাপের সত্যতা এবং "কুনজর"-এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার বিশ্বাস করতো। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা নিশ্চিৎ ছিলো যে, একজন সত্যিকারের যাদুকর একশ' মাইল দূরের মানুষকেও অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলতে পারে। মানুব ইতিহাসের প্রথম দিকেই ডাইনীবিদ্যার সূচনা হয়েছে এবং কখনোই যেটি পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। ফ্যাটিশবাদ বা ভুতাশ্রিত ক্ষমতাধর মূর্তির পূজা শুরু হয়েছে তার ও আগে (ফ্যাটিশবাদের উৎপত্তি : পর্তুগীজ ফেইটিকো অথবা ফেব্রিকেইট নির্মাণ করা, ফেক্টিশিয়াস অভিসন্ধিমূলকভাবে সৃষ্ট। যেহেতু তাবিজ কবচ কাজ করে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা বা প্রেতের বিরুদ্ধে, কিছু মানুষকে বিভিন্ন তাবিজের ভারে কুজো হয়ে থাকতে দেখা যায়। যাতে যে কোন সময় যে কোন ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। ভুতাশ্রিত মূর্তির বিবর্তনে আজকাল যাদুকরী রেলিক বা পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের চল্ এসেছে; অর্ধেক ইউরোপ বাসীকে কোন না কোন ধরনের তাবিজ তুমার পড়তে দেখা যায় যা তাদেরকে

আধ্যাত্মিক সহায়তা দান করে। সভ্যতার প্রতিটি ধাপেই আমরা দেখতে পাই যে, সভ্যতা নামক কঠিন বস্তুটির গঠন কতটা হাল্কা এবং অগভীর এবং বর্বরতা, কুসংস্কার ও জ্ঞানহীনতাকে চেপে রাখা এক আগ্নেয়গিরির মুখে কত আশংকাজনক তার অবস্থান। আধুনিকতা হচ্ছে মধ্যযুগের উপর চেপে বসানো এক টুপি, যার কদর্যতা ঢাকা থাকলেও অবিনশ্বর।

দার্শনিকেরা মানব সমাজে আধ্যাত্মিক সাহায্য বা তৃপ্তির প্রয়োজনীয়তা সাবলীলতার সাথে স্বীকার করে এবং নিজেকে এই বলে সান্তনা দেয় যে, সর্বপ্রাণবাদ থেকেই কাব্যের জন্ম আর যাদুবিদ্যা থেকে নাটক বা বিজ্ঞানের। প্রাকৃতিক রহস্যের অতিরঞ্জনকারী থেকে তুখোড় বিজ্ঞানী পর্যন্ত এই দৌড়ে, ফ্রেজার দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের বিজয়গাঁথার শিকড়টি অবাস্তব যাদুর ভিতের উপর-ই দাঁড়িয়ে আছে। যাদু যখন ব্যর্থ হতো, যাদুকর তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার সন্ধান বরতের যা দিয়ে আশানুরূপ ফল পেতে ঐশিক শক্তিদের সাহায্য করা যায়। ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক উপাদানের আধিপত্য নিশ্চিত হলেও যাদুকর তার স্থান শক্ত রাখার জন্য জনসাধারণেই কাছে সে রহস্য গোপন রাখতো এবং যাদুকলা বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ভান করতো। আজকালকার অনেক ওঝা বা চিকিৎসক প্রাকৃতিক আরোগ্যকে যাদুকরী মন্ত্র বা যাদুকরী চিকিৎসা পত্রের ফলাফল বলে একইভাবে চালিয়ে দেন। এভাবেই যাদুকর থেকে জন্ম নেয় চিকিৎসক, রসায়নবিদ, ধাতু-বিশারদ এবং জ্যোতির্বিদ্।

তবে তার আগে, যাদুকর থেকে জন্ম নেয় ধর্মীয় পুরোহিত। সময়ের অগ্রগতির পাশাপাশি ধর্মীয় প্রথা যখন সংখ্যায় এক জটিতলায় বাড়তে থাকে, তখন তা সাধারণের জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং নতুন এক শ্রেণীর জন্ম হয় যারা তাদের বেশিরভাগ সময় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা অনুষ্ঠানে ব্যয় করতো। যাদুকররূপী পুরোহিতগণ ধ্যান বা দীক্ষিতদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বা দেবতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জানতে পারতো এবং মানুষের স্বার্থে সে ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিবর্তন করতে পারতো। যেহেতু এ জাতীয় জ্ঞান ও দক্ষতা আদিম মানুষের কাছে নির্ধারণ করতো, কাজেই উপাসনালয়ের ক্ষমতা রাষ্ট্রের ক্ষমতার মতোই শক্তিশালী হয়ে উঠলো. তদ্-পরবর্তী সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত পুরোহিতেরা যোদ্ধাদের সাথে পাল্লা দিয়ে জনতার উপর রাজত্ব বা শাসন করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, মিশর, জুডিয়া বা মধ্যযুগের ইউরোপের কথা বলা যায়।

পুরোহিতেরা ধর্মের প্রবর্তন করেনি, তারা শুধু তার ব্যবহার করেছে, যেমনভাবে কূটনীতিকেরা সামাজিক প্রনোদনা বা প্রথার ব্যবহার করে থাকে; কোন ধর্মযাজকের আবিষ্কার বা চাতুর্য থেকে ধর্ম আসেনি, ধর্ম এসেছে নাছোড়বান্দা ভয়, নিরাপত্তাহীনতা, মানুষের আশা এবং একাকীত্ব থেকে। পুরোহিতরা কুসংস্কার বরদাস্ত করেছে এবং কিছু জ্ঞানের পরিধি গুটিয়ে যেখানে তার একচ্ছত্য আধিপত্য খাটিয়েছে; কিন্তু এটাও সত্যি যে, পুরোহিতেরা কুসংস্কারের পরিমানটা কমিয়ে

এনেছে এবং কখনো কখনো তার প্রতি নিরুৎসাহিত করেছে; জ্ঞানের সূচনা হয়েছে তার হাতে; একটি জাতির বর্ধিষ্ণু সংস্কৃতির ভান্ডার ও বাহক ছিলো পুরোহিত; সবলের হাতে দুর্বলের নিষ্পষণে সান্তনা দিয়েছে; তার মাধ্যমেই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পকলা বা চারুকলার চর্চা হয়েছে; তার হাত ধরেই মানুষের মনোস্তাত্ত্বিক গঠনে আতিপ্রকৃত বা আধ্যাত্মিকতার সরবরাহ হয়েছে। পুরোহিত যদি না থাকতো, আমরাই তাকে সৃষ্টি করতাম।

৮. ধর্মের নৈতিক দায়িত্ব

ধর্ম এবং শাসন-ট্যাবু (নিষিদ্ধ)-যৌনতা বিষয়ক ট্যাবু-ধর্মের পিছিয়ে পড়া-ইহজাগতিকতায় পরিবর্তন।

ধর্ম মানুষের নীতিবোধক দুটি অস্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত করে : ধর্মীয় কাহিনী এবং নিষেধাজ্ঞা। ধর্মীয় কাহিনীগুলো কিছু আধ্যাত্মিক প্রথার প্রত্যাশা করে যেমনটি সমাজ বা ধর্ম যাজকেরা আকাঙ্ক্ষা করে এবং যাদের ব্যাপারে স্বর্গীয় স্বীকৃতি আছে। ব্যক্তির উপর তার প্রভু কিংবা তার গোত্র যে নিষেধাজ্ঞাগুলো আরোপ করে। ধর্ম তার স্বর্গীয় স্বপ্ন এবং ভয়ভীতির দ্বারা তা মেনে চলতে উৎসাহ দেয়। মানুষ আদতে বাধ্যগত, ভদ্র বা সদ্গুণ সম্পন্ন নয়; প্রাচীন বাধ্যবাধকতা মানুষের মধ্যে বিবেকের জন্ম দেয়; ঈশ্বরের ভয়ের মত এমন আর কোন শক্তি নেই যে নিঃশব্দে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিকূল এসব গুণাগুণ মানুষের মধ্যে প্রোথিত করে। সম্পদ এবং বিবাহ বিষয়ক নীতিমালা অনেকটাই ধর্মীয় অনুমোদনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অবিশ্বাসের যুগে এদের কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়তে দেখা যায়। শাসন ব্যবস্থা বা সরকার, যেটি সামাজিক নির্মাণ কৌশলগুলোর মধ্যে সবচে' কৃত্রিম এবং প্রয়োজনীয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মভক্তি এবং ধর্মযাজকের সাহায্য চায়, যেমনটি নেপোলিয়ান এবং মুসোলিনির মতো চালাক শাসকেরা বুঝতে পেরেছিলো; সে কারণেই "সকল শাসকতন্ত্রের মধ্যেই ধর্মীয় শাসনের অনুগামিতার প্রবণতা দেখা যায়।" আদিম দলনেতার ক্ষমতা যাদু এবং মায়াবিদ্যার সাহায্য পেলে বেড়ে যায়; এমনকি আমাদের সরকার ও "পিলগ্রিমস্ গড্" এর বাৎসরিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রাণতা উৎপন্ন করার চেষ্টা করে।

পালিনেশীয়রা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার নাম দিয়েছিলো ট্যাবু। আদিকালে উন্নততর সমাজগুলোতে এসব ট্যাবু পালিত হতো, যা সভ্যতার আগমনে আইনের পরিণত হয়। এরা সচরাচর না বোধক : কিছু বস্তু বা কাজ ছিলো 'ঐশ্বরিক' এবং 'অপরিস্কার'; এ দুটি শব্দ মিলে একটি নির্দেশ নাই দেয় : "অস্পৃশ্য"। কাজেই আমাদেরকে বলা হলো যে, 'আর্ক অব কভেনেন্ট' বা ইহুদীদের আইনের দলিল ভরা সিন্দুক ছিলো ট্যাবু আর উজ্জাহ্ সেটির পতন ঠেকাতে ধরতে গিয়েও মরে গেলো। ডিওডোরাস আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, প্রাচীন মিশরীয়রা দুর্ভিক্ষে নিজেদের মাংস খেতে পারে কিন্তু তাদের টোটেম প্রাণী খেয়ে ট্যাবু ভঙ্গ করতে চাইতো না। বেশিরভাগ আদিম গোত্রেই অসংখ্য জিনিস ট্যাবু করা ছিলো;

কিছু শব্দ এবং নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিছু দিন বা ঋতুকাল ট্যাবু করা ছিলো যখন কাজ করা যেতো না। খাদ্যের ব্যাপারে আদিম মানুষের কিছু অজ্ঞতা এবং সমস্ত জ্ঞান ঈশ্বরিক ট্যাবুর দ্বারা প্রকাশিত হতো; স্বাস্থ্যবিধির পুরোটাই ছিলো ধর্মের হাতে-বিজ্ঞান বা ইহজাগতিক ঔষধের কোন ভূমিকাই ছিলো না।

আদিম ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞার প্রিয় বিষয় ছিলো নারী। যখন-তখন হাজারটা নিষেধাজ্ঞায় সে ছিলো অস্পৃশ্য, বিপদজনক এবং 'অপরিষ্কার'। সকল লোক-কাহিনীর জনকেরা ছিলো ব্যর্থ স্বামী, কারণ এরা সবাই একমত ছিলো যে, নারী হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া; এটি শুধু ইহুদী বা খ্রীস্টানদের দৃষ্টিকোণে নয়, অন্যান্য শত ধর্মেও অনুরূপ দৃষ্টিকোণ লক্ষ্য করা যায়। সবচে' কঠিন ট্যাবু ছিলো রজঃসৃত নারীর উপর; এ সময় যে ব্যক্তি বা বস্তু তাকে স্পর্শ করতো যে সমস্ত গুণাগুণ হারিয়ে ফেলতো। বৃটিশ গায়ানার মাকুসী গোত্র এ সময় তাদের গোসল করতে বারণ করতো যাতে পানি বিষাক্ত করে না ফেলে। এসময় তাদের জঙ্গলে যাওয়া বারন ছিলো, নয়তো মুগ্ধ সাপেরা তাদের কামড়ে দেবে। এমনকি সন্তান প্রসব করাটাও নোংরা ব্যাপার ছিলো এবং প্রসবের পর বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে নিজেকে আবার পবিত্র করে তুলতে হতো। রজঃস্রাব ছাড়াও নারীর গর্ভকাল বা সন্তান প্রতিপালনের সময় যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ ছিলো। সম্ভবত : এসব নিষেধাজ্ঞা নারী নিজেই চালু করেছে তার সুবিধা বা আত্মরক্ষার জন্য এবং তার সেটা ভালো মনে হয়েছে বলে; কিন্তু উৎস খুব সহজেই হারিয়ে যায়, আর সহসাই নারী নিজেকে আবিষ্কার করলো 'অপবিত্র' এবং 'অপরিস্কার'-রূপে। শেষে সে ও পুরুষের দৃষ্টি ভঙ্গি মেনে নিলো এবং রজঃস্রাব বা গর্ভকালীন সময়ে নিজেকে নিয়ে লজ্জায় পড়লো। এ ধরনের ট্যাবু থেকেই, আংশিকভাবে, শালীনতাবোধ, পাপবোধ, যৌনতার প্রতি অপরিচ্ছন্নতার বোধ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসীদের কৌমার্য্যবোধ এবং নারীর অধীনস্ততার বোধ জন্ম নেয়।

ধর্ম থেকে নীতিবোধের জন্ম হয়নি। তবে এটি নীতিবোধ গঠনের একটি মাধ্যম; এটি পরিস্কার যে, ধর্ম ছাড়াও নীতিবোধ টিকে থাকা সম্ভব এবং কালেভদ্রে এরা পারস্পরিক তফাৎ এবং তীব্র প্রতিরোধ উপেক্ষা করেও এগিয়ে গেছে। আদিতম সমাজ এবং পরবর্তী কিছু সমাজেও নীতিবোধের জাগরণ ধর্মের সাহায্য ছাড়াই ঘটেছে; ধর্ম তখন সমাজের কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা নিয়ে সময় ব্যয় না করে যাদুকলা, কৃত্যানুষ্ঠান এবং প্রাণ বিসর্জনের কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা নিয়ে সময় ব্যয় না করে যাদুকলা, কৃত্যানুষ্ঠান এবং প্রাণ বিসর্জনের দিকে বেশি মনোযোগ দেয়; ভালো মানুষ খুঁজতে তখন কে ধর্মীয় অনুষ্ঠান দায়িত্বের সাথে পালন করলো এবং কে বেশি অর্থ সহায়তা দিলো সে বিচার করে। সত্যিকার অর্থে, ধর্ম কখনো নিরঙ্কুশ ভালোর কামনা করে না (যেহেতু তেমন কিছু আসলে নেই) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা চাপে যেসব কর্মকাণ্ড মহৎ বলে পরিচিতি লাভ করেছে তাদের কামনা করে; আইনশাস্ত্রের মত এটিও পূর্বেকার রায়ের সাক্ষ্য টানে এবং পরিস্থিতি বা নীতিবোধ পাল্টে গেলে ধর্মের সেসব বানীও হারিয়ে যায়। কাজেই

গ্রীক দেবতাদের মধ্যে ভাইবোনের বিয়ের চল থাকলেও নাগরিক একে ঘৃণা করতে শিখে গিয়েছিলো; আজও চার্চ এক নৈতিকতার কথা বলে নিরন্তর লড়ে যাচ্ছে যা শিল্পবিপ্লবের ফলে উড়ে গেছে। সবকিছুর পর আর্থিব শক্তির-ই জয় হয়; নীতিবোধ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক আবিষ্কারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং ধর্ম অবলীলায় মানিয়ে নেয় নীতিবোধের সাথে। নগরায়নের ফলে সমকালীন জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার সাথে চার্চ ক্রমান্বয়ে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। ধর্মের নৈতিকতা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের সংরক্ষণ করা নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য নয়।

কাজেই প্রত্যেক সভ্যতার উন্নত পর্যায়ে ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি উত্তেজনা বিরাজ করে। ধর্মের শুরু হয় নাজেহাল এবং বিভ্রান্ত মানুষের মাঝে যাদুকরী সাহায্য দানের মাধ্যমে; মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও নীতির ঐক্য এনে, যা তখন কূটনীতি এবং শিল্পকলার জন্য বেশ মানানসই বলে মনে হয়, ধর্ম তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়; সামাজিক নীতিবোধ এবং শিল্পীমনের সাথে মতানৈক্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজেকে হত্যা করে। জ্ঞান যখন নিরন্তর পাল্টায় বা বৃদ্ধি পায়, ধর্ম তখন ভূ-প্রাকৃতিক উদাসীনতার ধীরে ধীরে পাল্টায় এবং সেজন্যই জ্ঞানের সাথে ধর্মতত্ত্বের সংঘাত ঘটে। সাহিত্যে পুরোহিত সুলভ খবরদারিত্বকে তখন ধৃষ্টতার শিকল বা ঘৃণিত প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয়; মনোজাগতিক ইতিহাস তখন 'বিজ্ঞান ও ধর্মের যুদ্ধে'র রূপ নেয়। শিক্ষা ও নীতিবোধ, বিবাহ ও বিচ্ছেদ, আইন এবং শাস্তির যেসব বিধান প্রথমে যাজকের হাতে ছিলো তা হাতছাড়া হয়ে পড়ে; ইহজাগতিক এবং সম্ভবত ঈশ্বরবিদ্বেষী, নতুন আইন চালু হয়। বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন প্রাচীন ধর্মতত্ত্বকে পরিত্যাগ করে এবং কিছুটা দ্বিধার পর মনোস্তাত্ত্বিক নীতিবোধের দ্বারা চালিত হয়; সাহিত্য এবং দর্শন হয়ে পড়ে ধর্মবিদ্বেষী। স্বাধীনতার আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে মানুষ তখন সকল কার্যের কারণ খুঁজতে থাকে এবং প্রতিটি ধারনা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে তার মোহমুক্তি ঘটে। ধর্মীয় বিধিনিষেধের অভাবে যে কোন কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে ভোগবাদী উচ্ছৃংখলায় পরিণত হয়; শান্ত্বনামূলক বিশ্বাসের অভাবে জীবন তখন সচেতন দরিদ্র কিংবা সম্পদে ক্লান্ত ব্যক্তির জীবনের মতো বোঝা হয়ে ওঠে। শেষে শরীর এবং আত্মার মত সমাজ এবং ধর্ম উভয়ের যুগপথ মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে শাসিতের সমাজে আরেক পুরাণ জন্ম নেয়, মানব মনে নতুন আশা, উদ্দীপনায় নতুন সাহসের যোগন হয়, এবং শতাব্দীভর বিশৃংখলার পর আরেক সভ্যতার জন্ম হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

সভ্যতার মনোস্তাত্ত্বিক উপাদান

১. সাহিত্য

ভাষা-এর পশুজাগতিক-এর মনুষ্য জাগতিক উৎস-এর উন্নতি-এর ফলাফল- শিক্ষা- দীক্ষাদানের প্রথা- লেখার আবিষ্কার-কাব্য।

কথাতেই সূচনা, কারণ কথা দিয়েই মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবে আলাদা করেছে। 'নামবাচক বিশেষ্য' নামের অদ্ভুত ধ্বনি বা শব্দগুলো ছাড়া চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিলো বিশেষ এক বস্তু বা বিশেষ এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি পর্যন্ত, যা আমরা দেখে বা শুনে মনে রেখেছি বা বুঝতে পেরেছি; নির্দিষ্ট একটি বস্তু থেকে আলাদা করে তার গোত্র বা শ্রেণী বলতে কোন কিছুকে বোঝা বা বোঝানো যেতো না; বস্তু থেকে গুণাগুণ বা গুণাগুণ থেকে বস্তুকে আলাদা করা যেত না। নামবাচক বিশেষ্য ছাড়া এই মানুষটি বা অন্য আরেকটি মানুষ সম্বন্ধে ভাবা যেতে পারে; কিন্তু শুধু মানুষ নিয়ে ভাবা যায় না কারণ চোখ দেখে একজন মানুষ, 'মানুষ' দেখে না। মনুষ্যত্বের শুরু তখনই যখন কোন এক উদ্ভট, খেয়ালি আধা-পশু, আধা-মানব যোগাসনে বসে তার মগজের বারোটা বাজিয়ে প্রথম নাম-বাচক বিশেষ্য বা গোত্রের সকলকে বোঝায় এমন একটি ধ্বনি আবিষ্কারের চেষ্টা করলো : "বাড়ী", যা দিয়ে জগতের সকল বাড়িকে বোঝায়, 'মানুষ' যা দিয়ে সকল মানুষকে বোঝায়, 'আলো', যা দিয়ে স্থলে বা জলে অদৌবধি জ্বলে ওঠা সকল আলোকে বোঝায়। ঠিক সে মুহূর্ত থেকেই মানবজাতির মানসিক বিকাশ নতুন এক অন্তহীন রাস্তায় এগুতে লাগলো। শব্দ বা পদের সাথে ভাবনার সে সম্পর্ক, যেমনটা আছে যন্ত্রের সাথে কাজের ফলাফলের বেশিরভাগই নির্ভর করে যন্ত্রের সংখ্যা বা আধুনিকতায়। যেহেতু সকল উৎসই ধারণা লব্ধ, আর ধারণা কখনোই সন্দেহের উর্দ্ধে নয়, কাজেই কথা বলা শুরু হয়েছে কিভাবে তা ভাববার জন্য কল্পনার অবাধ বিচরণের অনুমতি আছে। সম্ভবত ভাষার প্রথম রূপ যাকে বলা যায় ইঙ্গিতের সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান তা ঘটেছিলো পশুতে পশুতে ভালোবাসার ডাকে। এভাবে দেখলে, বন-জঙ্গল, তৃণভূমি নিরন্তর বাগাড়ম্বরে মুখর। সতর্কবাণী বা হুংকার, শাবকের জন্য মায়ের ডাক, নিষ্পাপ বা যৌন আনন্দের বকবক বা প্যাঁকপ্যাঁক, গাছে গাছে বানর ও পাখিদের কিচির মিচির শুনেই বোঝা যায় যে,

প্রাণীকূল বহুদিন ধরে মানুষের সুমহান বাণী তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলো। ফ্রান্সের কালোনের কাছাকাছি এক জঙ্গলে পশুদের মাঝে বেঁচে থাকা বন্য এক কিশোরীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিলো যে কুৎসিৎ আর্তনাদ আর হুংকার দেয়া ছাড়া আর কোন ভাষা জানতো না। বনজঙ্গলের এসব গালগল্প বা বাক্যালাপ আমাদের অর্ধ-শিক্ষিত কানে অর্থহীন শোনায়; আমরা সেই দার্শনিক পুডল-কুকুর রিকেটের মত, যে এম. বার্গেরেটকে বলেছিলো : "আমার মুখের সব শব্দেই কিছু একটা বোঝা যায়; কিন্তু আমার মনিব বেশিরভাগই আবোল তাবোল বকেন।"

কবুতরের বাকবাকুম আর তার কাজের মধ্যে অদ্ভুত এক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন হুইটম্যান ও ক্রেইগ; মোরগ মুরগি আর ঘুঘুর করা বারোটি শব্দ, কুকুরের পনেরটি আর গবাদিপশুর বাইশটি শব্দ ডুপন্ট আলাদা করে চিনতে পেরেছেন; গার্নার দেখেছেন যে, বানরেরা তাদের দিনভর আড্ডা চালিয়ে যায় বিশটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আর কিছু ইঙ্গিতের মাধ্যমে; পরিমিত এই শব্দভান্ডার থেকে কয়েক ধাপ এগুলেই সেই সরল মানুষটার দেখা পাই যে মাত্র তিনশ' শব্দের এক অভিধান দিয়ে কথা বলা শুরু করেছিলো।

ভাবের আদান-প্রদানে ইঙ্গিত ছিলো প্রারম্ভিক, পরবর্তীতে বলতে শেখা; এবং শব্দ যখন হার মেনে যায়, ইঙ্গিত আবার সামনে চলে আসে। উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষা ছিলো এবং ভিন্ন গোত্রের নারী-পুরুষের বিবাহে দম্পতিদের প্রায়শ দেখা যেত বাক্যে নয়, ইঙ্গিতেই ভাবের আদান-প্রদান বা যোগাযোগ হতো; লুইস মর্গান তার পরিচিত এক দম্পতিকে তিন বছর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কাজ চালাতে দেখেছে। কিছু ইন্ডিয়ান ভাষায় ইঙ্গিতের ব্যবহার এত প্রকট ছিলো যে, আরাপাহোস গোত্রের লোকদের পক্ষে অন্ধকারে কথা বলা ছিলো প্রায় অসম্ভব এক ব্যাপার, যেমনটা আধুনিক অনেক মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত মানুষের ভাষার প্রথম শব্দ ছিলো ভাব-প্রকাশক বা বিস্ময়সূচক শব্দ, যা পশুরাও ব্যবহার করে থাকে; তারপর নির্দেশনামূলক শব্দ, যার সাথে নির্দেশক ইঙ্গিতও থেকে থাকবে; এরপর অনুকরণমূলক শব্দ যা পরে ঐ বস্তু বা কর্মের নামরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অগুণতি শতাব্দীজুড়ে ভাষাগত বিভিন্ন জটিলতা এবং পরিবর্তনের পরেও সকল ভাষাতেই শত শত অনুকরণমূলক শব্দ রয়ে গেছে রো রো (গর্জন), রাশ (ছুটে যাওয়া), মার্মার (গুঞ্জন), ট্রেমর (কাঁপন), গিগল্ (ফিকফিক করে হাসা), গ্রোউন (যন্ত্রণায় কাতরানো), হিস্ (সাপের ফোঁসানো), হীভ্ সেবনে (টানা), হায় (গুণগুন করা), ক্যাকল্ (মুরগীর কককক করা) ইত্যাদি। ভাষা তার জরুরি অবস্থা বা এমার জন্মিতে এখনও সংশিষ্ট অনুকরণীয় ধ্বনির আশ্রয় নেয়। ইংরেজ চীনে গিয়ে তার প্রথম আহারে বসে আঙ্গুলে ম্যাক্সন গাম্ভীর্য এবং রক্ষণশীলতার বজায় রেখে মাংসের ধরন জানতে চাইলো, "কোঁয়াক কোঁয়াক?" মহানের উৎসাহের সঙ্গে চীনের উত্তর "ভাউ ভাউ"। প্রত্যেক ভাষার মূল শব্দগুলোর সম্ভবত এভাবেই সূচনা হয়েছে। রেনান হিব্রু ভাষার সকল শব্দকে পাঁচশ মূল শব্দে নামিয়ে এনেছে, স্কিট প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় শব্দকে চারশ মূল

শব্দে নিয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ডিভাইন (স্বর্গীয়) ল্যাটিন ডিভাস <ডিউস < গ্রীক থেয়স্ <সংস্কৃত দেভা, যার অর্থ ঈশ্বর; জিপসিদের এক ভাষায় ঈশ্বরবোধক শব্দটি হয়েছে ডেভেল।' সংস্কৃত মূল ভিদ (জানা)> গ্রীক্ ওইডা > ল্যাটিন ভিডিও দেখা > ফ্রেঞ্চ ভয়ের দেখা > জার্মান উইসেন (জানা) > ইংরেজী উইট্ (বোধবুদ্ধি); সংস্কৃত মূল থেকে বিভিন্ন সংযোজন এসেছে, যেমন— টর্, ইক্, আল এবং লি (= লাইক, অনুরূপ)। সংস্কৃত 'আর' (লাঙ্গল দেয়া)> ল্যাটিন আরার রাশিয়ান ওরাটি ইংরেজী ইয়ার, অ্যারাবল্, আর্ট, ওর্ এবং সম্ভবত আরিয়ান (আর্য্য, লাঙ্গল চালক)।

সরলতার দৃষ্টিকোণ বিচারে, আদিম মানুষের ভাষাও যে আদিম হবে তেমন কোন কথা নেই; গঠন এবং শব্দভান্ডারের দিক থেকে অনেকগুলো বেশ সরল, কিন্তু কিছু আছে আমাদেরই মত জটিল আর শব্দে পরিপূর্ণ এবং চীনের ভাষার চে' সুবিন্যস্ত। প্রায় সমস্ত আদিম ভাষাই ইন্দ্রিয় নির্ভর ও স্বতন্ত্র বস্তুতে সীমাবদ্ধ এবং সার্বজনীন ও বিমূর্ত বিষয়াগুলোতে দুর্বল। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের কুকুরের লেজের জন্য একটি নাম এবং গরুর লেজের জন্য আরেকটি নাম ছিলো; কিন্তু শুধু লেজের জন্য আলাদা কোন শব্দ ছিলো না। তাসমেনিয়রা একেক প্রজাতির গাছের একেক নাম রেখেছিলো। কিন্তু শুধু 'গাছ' বলতে কোন শব্দ ছিলো না; কালো ওক্ গাছ, সাদা ওক্ গাছ, লাল ওক্ গাছের জন্য চোকতাও ইন্ডিয়ানদের তিনটি শব্দ ছিলো, কিন্তু শুধু ওক্ গাছের কোন নাম ছিলো না, 'গাছ' শব্দটিও ছিলো না। সন্দেহ নেই যে, পরিচয়বাচক শব্দ থেকে নামবাচক শব্দ আসতে বহু প্রজন্ম গত হয়েছে। বহু গোত্রে রঙ্গিন বস্তুর নামের থেকে রঙের নাম আলাদা করা হয়নি; বহু বিমূর্ত বস্তু বা ভাবের নাম নেই যেমন— কণ্ঠস্বর, যৌনতা, প্রজাতি, স্থান, আত্মা, প্রবৃত্তি, কারণ, পরিমাণ, আশা, ভয়, বস্তু, সচেতনতা ইত্যাদি। বিমূর্ত পদ বা শব্দগুলো চিন্তার উন্নতির সাথে সমাহারে বৃদ্ধি পায়; এরা সূক্ষ্ম বিচারের অস্ত্র এবং সভ্যতার পদচিহ্ন।

কথার এত গুণ যে, আদিম মানুষ শব্দকে মনে করেছে স্বর্গীয় আর্শীবাদ বা ঐশিক কোন বস্তু; শব্দ হয়ে উঠলো যাদুকলার বিষয়; সবচে' শ্রদ্ধেয় যখন সবচে' অবোধ্য; এখনও রহস্যজনক কথাবার্তা চালু আছে যেখানে কথা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তারা যে শুধু চিন্তাভাবনা সহজ করেছে তাই নয়, সামাজিক সংগঠনকে উন্নত করেছে; শিক্ষা, জ্ঞানদান এবং শিল্পজ্ঞান বিকাশের একটি মাধ্যম যোগান দিয়ে এক প্রজন্মকে অন্য প্রজন্মের সাথে মানসিকভাবে জোড়া দিয়েছে; যোগাযোগের নতুন এক পথ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মাধ্যমে একটি উপদেশ বা বিশ্বাস একদল লোককে একটি সমসত্ত্ব এককে পরিণত করে। ভাবনার বহন ও বিচরণের জন্য নতুন এক রাস্তা উন্মোচিত হয়েছে, ভাবনার গতির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে এবং জীবনের ক্ষেত্র ও উপাদানের বৃদ্ধি করেছে। নামবাচক শব্দের মত এমন কোন আবিষ্কার কি আর আছে যে ক্ষমতা ও যশে এর সমান হতে পেরেছে?

চিন্তার বৃদ্ধিতে শব্দের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপহার হলো শিক্ষা। সভ্যতা হচ্ছে শিল্প ও প্রজ্ঞা, আচার-ব্যবহার ও নতিবোধের এক রত্নভান্ডার যেখান থেকে ব্যক্তি তার

বিকাশের সাথে সাথে পুষ্টি আদায় করে; প্রতি প্রজন্মে জাতিগত শিক্ষা দীক্ষার পুনর্প্রতিষ্ঠা না হলে, সভ্যতা হঠাৎ মরে যেতে পারে। সভ্যতা শিক্ষার কাছে জীবনের তরে ঋণী।

আদিম মানুষের শিক্ষাতে কোন আতিশয্য ছিলো না; পশুর মত তাদের কাছেও শিক্ষা মানে চরিত্রের দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের পুনঃপ্রচার, জীবনের পথে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কটি ছিলো বেশ স্বাস্থ্যবান। এরকম সরাসরি হাতে খড়ির ফলে আদিম শিশুর বিকাশ দ্রুততর হতো। ওমাহা গোত্রে বালকের বয়স যখন দশ বছর তখন সে তার বাবার সকল বিদ্যা রপ্ত করে ফেলতো, জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো; এলিউট্ বালকেরা কখনো কখনো দশ বছর বয়সেই তার সংসার সাজিয়ে বসতো, অনেক সময় বিয়েও করে ফেলতো। নাইজেরিয়ার শিশুরা ছয় থেকে আট বছর বয়সে পিত্রালয় ত্যাগ করে নিজের জন্য ছাউনী বানাতো, পশু বা মৎস্যশিকারে নিজের খাদ্য নিজেই নিশ্চিত করতো। সাধারণত যৌন জীবন শুরু হবার সাথে সাথেই পিতা-পুত্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতি ঘটতো; শুরুতে এই অকাল পরিপক্কতার পরে কিন্তু জীবন হয়ে উঠতো স্থবির, নিশ্চল। এ জাতীয় জীবন-ব্যবস্থায়, বালক বারো বছর বয়সে হয়ে উঠতো যুবক আর পঁচিশে বৃদ্ধ। এর মানে এই নয় যে, আদিমদের মন বরাবরই ছিলো শিশুর মত; এতে এটুকুই বোঝা যায় যে, আদিম সমাজে আধুনিক শিশু মনের দরকার ও ছিলো না, সুযোগ ও ছিলো না; সুরক্ষিত এবং সুদীর্ঘ শৈশব কৈশোরের সুযোগটি সে পেতো না যেখানে কৃত্রিম ও অস্থিতিশীল সমাজকে যুঝতে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বৃহত্তর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পরিপূর্ণ হস্তান্তরের দরকার হয়।

তবে, আদিমের পারিপার্শ্বিক তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিলো; তখন মনের ক্ষিপ্রতা নয়, সাহস ও দৃঢ় চরিত্রের প্রয়োজন ছিলো। আদিম বাবা প্রশিক্ষণ দিতো চারিত্রিক দৃঢ়তার, আধুনিক বাধা দেয় বুদ্ধি ও মেধার। বিদ্বান নয়, তার ছিলো মানুষ করে তোলার মাথাব্যথা। কাজেই দীক্ষিত করার প্রথা, যেটা পার না করে আদিম সমাজে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়া যেতো না, সেখানে আমরা দেখতে পাই জ্ঞান নয়, সাহসের পরীক্ষা নেয়া হতো; এসব প্রথার মমার্থ ছিলো, নবীনকে যুদ্ধ এবং সংসারের কষ্টকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করা, পাশাপাশি তীব্র ব্যথা ভোগের মাধ্যমে হাড়গিলে বৃদ্ধদের পরিতৃপ্ত করা। দীক্ষাদানের প্রথা কোন কোন জায়গায় "এতটাই ভয়ংকর ও বিতৃষ্ণাকর ছিলো যে, এটি দেখা বা বলার মত নয়।" কাফিরদের মধ্যে (নমনীয় একটি উদাহরণ) যে কিশোর বিয়ে করতে চাইতো তাকে দিনের বেলা কঠিন সব কাজ দেয়া হতো আর রাতে নিদ্রাহীন জাগরণে বাধ্য করা হতো। যতদিন সে ক্লান্তিতে ধসে না পড়ে; এবং এ বিষয়টি আরো কিছুটা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে যখন-তখন নির্দয় প্রহার করা হতো যাতে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়। কিশোরদের একটি বড় অংশ এতে মরেই যেতো; কিন্তু এ অমানবিক ব্যাপারটিকে দার্শনিকরূপী বৃদ্ধরা সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের পরোক্ষ মাধ্যম হিসেবেই দেখতেন। দীক্ষাদানের এ

অনুষ্ঠানগুলোতে কৈশোরের অবসান হতো এবং বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হতো; কনেও ভাবতো যে, কষ্ট সহ্য করার পরীক্ষাটি বরের পাশ দিয়ে আসা উচিৎ। কঙ্গোর অনেক গোত্রে দীক্ষাদানের প্রথা ছিলো খতনা কেন্দ্রিক; যুবক যদি ব্যথায় কুঁকড়ে উঠতো বা চিৎকার দিতো, তা হতো তার আত্মীয়দের জন্য চাবুকের মার; কনেটি, যে পাশ থেকে পুরো অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছে, সাথে সাথে সেই বরকে বাতিল করে দিতো এ মর্মে, সে কি একটি মেয়েকে বিয়ে করবে নাকি!

আদিম শিক্ষায় লেখালেখির ব্যবহার ছিলো না, বা থাকলেও খুবই কম। প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকা সাধারণ লোকজন আর কিছুতেই এতটা অবাক হতো না যতটা অবাক হতো ইউরোপীয়দের লেখার ক্ষমতায় কি করে এক টুকরো কাগজের উপর কিছু কালো আঁকিবুকি এঁকে দূর-দূরান্তের বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। অনেক গোত্র তাদের সভ্য দখলদারদের লেখা নকল তরে লিখতে শিখে ফেলেছে; কিন্তু উত্তর আফ্রিকার কিছু গোত্র তুলনামূলক একাকীত্বের কারণে, এবং ইতিহাস না থাকার মজাটি বুঝতে পেরে, লিখতে শেখার কোন প্রয়োজন অনুভব করেনি। লিখতে না পারার কারণে তাদের স্মৃতিশক্তি তুখোর; যেসব ঐতিহাসিক তথ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রথা মনে রাখার দরকার মনে করেছে তা মুখে মুখে সন্তান থেকে সন্তানে প্রবাহিত হয়েছে। এরকম লোক সঙ্গীত এবং মৌখিক ঐতিহ্যকে লেখার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের শুরু। সন্দেহ নেই যে, লেখার আবিষ্কার করতে গিয়ে বহু ঐশিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে যেহেতু অনেকের ধারণা ছিলো যে, এতে যে জাতি বা তার নীতিবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। মিশরে এক লোক কাহিনী প্রচলিত ছিলো যে, দেবতা থথ্ যখন রাজা থেমোসকে লেখা আবিষ্কারের কথা বললেন, তিনি এটিকে সভ্যতার শত্রু বলে ঘোষণা দিলেন। রাজাধিরাজ এর প্রতিবাদে বললেন, "বালক ও যুবকেরা, যাদেরকে এতদিন শিখতে ও মুখস্ত রাখতে বলপ্রয়োগ করা হতো, তারা এখন এসব অভ্যাস ছেড়ে দেবে, এবং তাদের স্মৃতিশক্তি ব্যবহারে অযত্ন করবে।"

আমরা এ চমৎকার খেলনাটির উৎসের ব্যাপারে শুধুমাত্র ধারনাই করতে পারি। যেরকমটি আমরা দেখতে পাবো, সম্ভবত মৃৎশিল্পের এক উপজাতি বা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে, কাঁদার পাত্রে 'ট্রেড মার্ক' বা ব্যবসায় ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে এর জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন গোত্রে লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে এক ধরনের লিখিত চিহ্নের দরকার দেখা দেয়েছিলো। যার প্রথম দিককার সংকেতগুলো ছিলো আগোছালো, ব্যবসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর সরলীকৃত ছবি এবং সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন। ব্যবসা যখন ভিন্ন ভাষাভাষীদের সংযুক্ত করলো, তখন সকলের বোধগম্য কিছু চিহ্ন বা সংকেতের দরকার হলো। সংখ্যাই সম্ভবত সবচে' পুরোনো লিখিত হরফ, বা সাধারণত হাতের আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আঁকা কিছু দাগ দিয়ে বোঝানো হয়; এখনও আমরা সংখ্যার ডিজিটগুলোকে আঙ্গুলই বলি। ইংরেজী ফাইভ্ (পাঁচ) জার্মান ফান্‌ফ্ গ্রীক পেন্টে যে উৎস থেকে এসেছে তার অর্থ হাত; কাজেই রোমান সংখ্যা দেখতেও আঙ্গুলের মত V দিয়ে বোঝাতো

প্রসারিত মুষ্টি, X দিয়ে প্রসারিত দুই মুষ্টির V পাশাপাশি অবস্থান। শুরুতে লেখা আজও জাপান এবং চীনে ছিলো চিত্রাঙ্কনের মত। কথা বলার সময় মানুষ যেমন শব্দে আটকে গেলে ইঙ্গিতের ব্যবহার করতো, লেখার ক্ষেত্রেও চিত্রের ছিলো তেমন ব্যবহার; আজ ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি হরফ এক সময় ছিলো কোন একটি ছবি, যা ব্যবসার ট্রেড-মার্ক হিসেবে বা এখনকার রাশিচক্রের সমূহের মত সেসময় ব্যবহৃত হতো। চীনাদের যেসব ছবি থেকে লেখার হরফগুলো এসেছে তাদের বলা হতো কু-ওয়ান, আক্ষরিক অর্থে 'ইঙ্গিতবহ' চিত্র। টোটেম খোদাই করা স্তম্ভগুলো আসলে পিকটোগ্রাফ বা চিত্র দিয়ে লেখা একটি বাক্য বা বাণী; ম্যাসনের মতে, গোত্রদের অটোগ্রাফ বা স্বাক্ষরিত স্ব-হস্তলিপি। কিছু গোত্র স্মরণশক্তির সাহায্যার্থে খাঁজ কাটা ছড়ি ব্যবহার করতো; অন্যেরা যেমন অ্যালগনকুইন ইন্ডিয়ানরা ছড়িতে খাঁজ কাটার পাশাপাশি প্রতিমূর্তির অংকন করতো যা টোটেম খোদাই করা স্তম্ভগুলোর ক্ষুদ্র সংস্করণ বা স্তম্ভগুলো ছিলো এ ছড়িগুলোর বৃহৎ সংস্করণ। পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানরা বিভিন্ন রঙের সুতোর গিঁট বা ফাঁস দিয়ে সংখ্যা এক ভারের জটিল সব হিসাব রাখতো। দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানের আদিবাসের রহস্যে কিছুটা আলোকপাত যখন আমরা দেখি যে, ইষ্টার্ণ আর্কিপেলাগো এবং পলিনেশীয় আদিবাসীরা অনুরূপ এক রীতির অনুসরণ করে। লাওসে যখন চীনাদের আদিম সরল জীবন যাপনের ডাক দেয়, যখন যে গীট দেয়া সুতার ব্যবহারে ফিরে যেতে বলেছিলো।

ক্ষণে ক্ষণে আদিম মানুষের মধ্যে লেখার আরো কিছু উন্নত সংস্করণ আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ সাগরের ইষ্টার দ্বীপে হায়রোগ্লিফিক্‌সের সন্ধান পাওয়া গেছে; ক্যারোলিন দ্বীপে একটি স্ক্রিপ্ট আবিষ্কৃত হয়েছিলো যাতে একান্নটি সিলেবল্ মুখের ভাষার নূন্যতম ছান্দস একক ও ইঙ্গিতবহ ছবি স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কাহিনীতে বলা আছে, কিভাবে ইষ্টার দ্বীপের পুরোহিতেরা লেখালেখির জ্ঞানটিকে নিজেদের মাঝে ধরে রাখতে চেয়েছিলো এবং প্রতি বছর সেসব ট্যাবলেট বা লিপিফলকের পাঠ শোনার জন্য জনতা ভীড় করতো; শুরুর দিকে লিখতে পারাটি ছিলো রহস্যজনক, পবিত্র এক বিষয়। নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, পলিনেশীয় এসব হায়রোগ্লিফ্ (ছবির মাধ্যমে লিখিত গুঢ়লিপি) ঐতিহাসিক কোন উন্নত সভ্যতা থেকে আসেনি। সাধারণ অর্থে, লেখা ছিলো সভ্যতার এক নিদর্শন; সভ্য এবং আদিম জাতির বিভেদকরণের প্রক্রিয়ায় সর্বনিম্ন অনিশ্চয়তার মাধ্যম।

সাহিত্যকর্মের সূচনা বর্ণেও নয়, শব্দে যদিও এদের নামের অর্থে অন্যথা বোঝায়; এটি এসেছে পুরোহিতের ঐশিক বাণী বা যাদুমন্ত্ররূপে, পুরোহিতের আবৃত্তির মাধ্যমে ছড়িয়েছে হৃদয় থেকে হৃদয়ে। কারমিনা, রোমানরা তাদের কাব্যের যে নাম দিয়েছিলো তার অর্থ লোকমুখের শ্লোক এবং যাদুমন্ত্র ওডে, গ্রীকদের কাব্য, বোঝাতে শুধুই যাদুমন্ত্র; উত্তর ইউরোপের রূন (প্রাচীন ঐন্দ্রজালিক বর্ণমালার এক লেখা) এবং লে (চারণ) কবির গান— উভয়েরই উৎস যাদুমন্ত্র সম্বন্ধীয়; জার্মান লিয়েড এর অর্থও অনুরূপ। ছন্দ ও ছড়া এসেছে প্রকৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের

ছন্দ থেকে এবং যাদুকর বা শামান (যারা লোকজনের আরোগ্যের জন্য ভালো ও মন্দ আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে) তাদের যাদুমন্ত্রের মাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্য এসব ছড়ার সৃষ্টি করেছে। গ্রীকদের মতে, প্রথম ষষ্ঠপদী ছড়া সৃষ্টির কৃতিত্ব ডেলফির পুরোহিতদের, যারা উপাসনায় ব্যবহারের জন্য ছড়ার আবিষ্কার করে। ক্রমান্বয়ে, পুরোহিত থেকে জন্ম নেয় কবি, বক্তা, ইতিহাসবিদ বক্তার কাজ ছিলো রাজা বা দেবতাদের সরকারি মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন, ইতিহাসবিদের কাজ ছিলো রাজ্যের সকল ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যধারণ, কবির কাজ রাজার অর্জনগুলো গানের মাধ্যমে ধারণ ও ধর্মীয় সঙ্গীতগুলো গেয়ে শোনানো, আর সুরকারের কাজ ছিলো জনগণের কাছে প্রেরিত রাজা বানীর উপর সুরের আরোপন। কাজেই ফিজি, অহিতি ও অন্যান্য জায়গায় সরাসরি বক্তা, লেখক নিয়োগ করা ছিলো যাদের কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়া এবং গোত্রের সমস্ত যোদ্ধাদেরকে তাদের জাতি ও পূর্বপুরুষের গৌরবের কথা শুনিয়ে যুদ্ধে প্ররোচিত করা : তৎকালীন চিত্রের সাথে একালের কিছু ইতিহাসবিদের কত কম তফাৎ! সোমালীদের, মধ্যযুগের মিনেসিংগার এবং ট্রবেডরদের মত, পেশাদার কবি ছিলো যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান গাইতো। ব্যতিক্রম ছিলো শুধু ভালোবাসার গানগুলোতে; এতে সাধারণত শারীরিক বীরত্ব, যুদ্ধ অথবা বাবা-মা ও সন্তানের সম্পর্ক বর্ণিত হতো। এখানে ইষ্টার দ্বীপের শিলালিপি থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরা হলো যেখানে যুদ্ধের কারণে বাবা তার মেয়েকে হারিয়েছেন :

আমার মেয়ের নৌকার পাল,
বিদেশির শক্তিতে কখনো ছিড়েনি।
আমার মেয়ের নৌকার পাল,
হণিটির ষড়যন্ত্রে কখনো ছিড়েনি।
বিষ মেশানো পানি খেতে, প্ররোচিত হয়নি
ওব্‌সিডিয়ান পেয়ালাতে।
আমার দুঃখ কি করে প্রশমিত হবে
যখন আমরা বিচ্ছিন্ন প্রবল সাগরের দূরত্বে?
ও আমার মেয়ে, ও আমার মেয়ে!
এ জলপথের শেষ আছে নাকি
পথের পরে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকি
ও মেয়ে, ও আমার মেয়ে!

২. বিজ্ঞান :

উৎপত্তি-গণিত-জ্যোতির্বিদ্যা-চিকিৎসাশাস্ত্র-শল্যশাস্ত্রত্ম।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য প্রমাণ বিচারে বিশেষজ্ঞ হার্বার্ট স্পেনসারের মতে, অক্ষরজ্ঞানের মত বিজ্ঞানেরও শুরু হয়েছে পুরোহিতের হাত ধরে, ধর্মীয়

অনুষ্ঠান নির্ধারণী জ্যোতি-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং দীর্ঘদিন ধরে পুরোহিতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিরূপে এটি মন্দিরেই সুরক্ষিত ছিলো। এক্ষেত্রে, শুধু ধারণা করা সম্ভব, বলা সম্ভব নয়, কারণ এখানে আবারো শুরুটা ধরা-না-দেয়া স্বভাবের। সভ্যতার মত বিজ্ঞান ও হয়তো চাষাবাদের সূত্রে জন্মেছে; জ্যামিতি, যেরকমটি তার নামে আভাস দেয়, ছিলো ভূমির মাপঝোক; শস্যকাল বা ঋতুর হিসেব করা দিয়ে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত, বর্ষপঞ্জিকার সৃষ্টি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম। নৌচালনায় এগিয়েছে জ্যোতির্জ্ঞান, ব্যবসায় গণিত আর ছোট খাট শ্রমশিল্পে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের গোড়াপত্তন।

কথা বলার শুরুটি সম্ভবত সংখ্যা গণনার মধ্য দিয়ে এবং বহু গোত্রে গণনার ব্যাপারটি এখনো বেশ সরল। তাসমেনীয়রা দুই পর্যন্ত গুণতে পারতো "পারমেরী, কাল্ বাওয়া, কারডিয়া"— যা" এক, দুই অসংখ্য"; ব্রাজিলের জুয়ারানী গোত্র আরেকটু বেশি গুণতে পারতো এক, দুই, তিন, চার, অগুনতি। নিউ হল্যান্ডারদের তিন, চারের ধারনা ছিলো না; তিনকে তারা বলতো "দুই-এক", চারকে দুই-দুই, দামারা উপজাতি চারটি লাঠির সাথে দুটি ভেড়ার বিনিময় করতো না, কিন্তু বিনা সংকোচে দু'বারে কাজটি করতো; প্রথমবার দুটি লাঠি এক ভেড়া, দ্বিতীয়বার তার পুনরাবৃত্তি। গণনা হতো আঙ্গুলের সাহায্যে; এ জন্যই ডেসিমাল (দশক) বা দশ ভিত্তিক গণনার প্রচলন হয়েছে। যখন কিছুকাল পর 'বারো' সংখ্যাটির ধারনা এলো, তখন সংখ্যার মজা বেড়ে গেলো কারণ এটি প্রথম ছয়টি সংখ্যা (১-৬) এর মধ্যে পাঁচটি সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য; এখান থেকেই ডুয়োডেসিমাল (দ্বাদশ) বা বারোভিত্তিক গণনার শুরু হয়েছে যা জেদের বশবর্তী হয়ে এখনও ইংরেজি মাপঝোকে টিকে আছে : বছরে বারো মাস, শিলিং এ বারো পেন্স, ডজনে বারোটি গ্রসে বারো ডজন বা বারো ইঞ্চিতে এক ফুট। অন্যদিকে, তেরো ছিলো দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে কুখ্যাত কারণ এটিকে কোন ভাবেই ভাগ করা যেত না। হাতের সাথে পায়ের আঙ্গুল জোড়া দিয়ে বিশের ধারণা এলো; ফ্রেঞ্চদের কোয়ার্টার ভিন্ট বা চার বিশে মিলে আশির ধারনা হলো। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ও মাপঝোকের কাজে লাগতো : হাত দিয়ে 'স্পান' বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে 'ইঞ্চি' (ফ্রেঞ্চভাষায় এ দু'টো একই শব্দ), কনুই দিয়ে 'কিউবিট' বাহু দিয়ে 'এল' বা এক পা দিয়ে মাপা হতো 'এক ফুট'। গণনায় আঙ্গুলের পাশাপাশি নুড়ির ব্যবহার বহু আগেই শুরু হয়েছে; এ্যাবাকায়ে নুড়ির ব্যবহার এবং গণনা বা 'ক্যালকুলেট' শব্দটির মূল 'ক্যালকুলাস' অর্থ ক্ষুদ্র পাথর এ থেকেই বোঝা যায় আদিম এবং আধুনিক মানুষের দূরত্ব কতটাই স্বল্প! থোরিউ এ আদিম সরলতার জন্য পাগান ছিলেন এবং এক সর্বগ্রাহ্য মনোভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ "সৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, হাতের দশ আঙ্গুলের চে' বেশি গুণবার প্রয়োজন কমই হয়; অথবা, চরম পর্যায়ে পায়ের আঙ্গুল যোগ করা যেতে পারে এবং বাকি সব ছুঁড়ে ফেলা যায়। আমি বলি, আমাদের কার্যক্রম দুই, তিনে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ, শতকে বা সহস্রে নয়, লক্ষের পরিবর্তে আধা ডজন এবং হিসাব নখের ডগায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ"।

স্বর্গীয় বস্তুদের গতিবিধির সাহায্যে সময়ের হিসেব করা দিয়েই জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রপাত। মেজার (বা মাপা) শব্দটি, মানথ্ (বা মাস) এবং সম্ভবত ম্যান /মজারার (পরিমাপক) এ শব্দগুলো দৃশ্যত এসেছে 'মুন' (চাঁদ) থেকে। বছরের ভাগে সময় মাপার বহু আগে থেকেই চাঁদের সাহায্যে সময় গণনা শুরু হয়ছে; পিতৃতুল্য সূর্য তুলনামূলক ভাবে নব-আবিষ্কার; এমনকি আজো ইস্টার উৎসবের গণনা হয় চাঁদের দশা দিয়ে। পালিনেশীয়দের চাঁদ ভিত্তিক তেরো মাসের বর্ষপঞ্জিকা ছিলো; যখন তাদের চন্দ্র বছর ঋতুর আগমন থেকে গর্হিতভাবে সরে আসতো, তারা একটি চন্দ্র মাস বাদ দিয়ে দিতো এবং ভারসাম্য রক্ষা করতো (ব্যাখ্যা : এক বছর বারো মাস, পরের বছর তেরো মাস ধরলে পঁচিশ চন্দ্র মাসে দুই বছরের চে' চার পাঁচদিন বেশি হয়, যার মাধ্যমে বছরের হিসাব রাখা সম্ভব)। কিন্তু মহাজাগতিক বস্তুদের এমন সুস্থ ব্যবহার ছিলো ভীষণ ব্যতিক্রম; জ্যোতিষবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যার চে' পুরোনো এবং ভবিষ্যতে তার চে' দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে; সাধারণ মানুষ সময় গণনার চে' ভবিষ্যৎ দর্শনে বেশি আগ্রহী। মানুষ এবং তার ভাগ্যের উপর তারার প্রভাব বিষয়ে হাজারো কুসংস্কার দানা বেঁধেছিলো; এসব কুসংস্কারের অনেকগুলো এখনো আমাদের সময়ে বেঁচে আছে। ১৯৩৪ সালের ৫ই মার্চ, নিউইয়র্ক টাউন হল প্রোগ্রামের এক বিজ্ঞাপনের অংশবিশেষ : "রাশিচক্র কর্তৃক। নিউইয়র্কের সর্ববিশিষ্ট সামাজিক ও পেশাদার গ্রাহকদের জ্যোতিষী। ঘন্টায় দশ ডলার।" এগুলো হয়তো কুসংস্কার নয়, বিজ্ঞানেরই মত আরেক রকম ভ্রম।

আদিম মানুষ পদার্থবিদ্যাকে সূত্রবদ্ধ করতে পারেনি, শুধু কিছুটা চর্চা করেছে; সে ক্ষেপনাস্ত্রের সম্ভাব্য পথের ধারনা করতে পারতো না, কিন্তু একটি তীরের নিশানা ভালোই লাগাতে পারতো; তার কোন রাসায়নিক সংকেত জানা ছিলো না, কিন্তু দেখামাত্র বলে দিতে পারতো কোন গাছ খাবার উপযুক্ত আর কোন গাছ বিষাক্ত, ঘা শুকাবার জন্য এদের ব্যবহার ও করতে জানতো। এখানেও সম্ভবত অন্য লিঙ্গের দরকার হবে, কারণ প্রথম ডাক্তার ও হয়তো ছিলো এক নারী; এজন্য নয় যে, প্রাকৃতিক ভাবেই তারা আমাদের যত্ন দানকারী, একারনেও নয় যে, তারা ধাত্রীর কাজে পরদর্শী, তারা আসলে মাটির খুব কাছে ছিলো যা তাদেরকে উদ্ভিদজগত সম্বন্ধে পুরুষের চে' বেশি জানতে সাহায্য করেছে এবং ঔষধশাস্ত্র, যা পুরোহিতের যাদুমন্ত্র থেকে একেবারে আলাদা, এরকম একটি শাস্ত্র গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। একেবারে আদিকাল থেকে আমাদের স্মৃতিকাল পর্যন্ত। নিরাময়ের দায়িত্বটা ছিলোই নারীর হাতে। শুধুমাত্র নারী যখন ব্যর্থ হতো, আদিম অসহায় লোকটি তখন চিকিৎসক, শামাল বা ওঝার দ্বারস্থ হতো।

এটি সত্যিই অবিশ্বাস্য যে, আদিম চিকিৎসকেরা রোগ বিষয়ক অদ্ভুত তত্ত্বের পরও কত শত রোগীর আরোগ্য করেছে। এসব লোকের কাছে রোগ মানে একটি অপার্থিব শক্তি বা আত্মা তার শরীরের উপর ভর করা এ বিশ্বাস অবশ্য একালের জীবানুতত্ত্বের চে খুব বেশি ভিন্ন কিছু নয়। আরোগ্য দেবার সবচে জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিলো যাদুমন্ত্রে সেই খারাপ আত্মাকে দূরে সরিয়ে দেয়া। এই চিকিৎসা যে কত

দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তার প্রমাণ মেলে গ্যাডারিন সোয়াইনের গল্পে। এখনো অনেকে মৃগীরোগকে কোন কিছুর ভর করা বলে মনে করে; সমকালীন ধর্ম-ও রোগমুক্তির জন্য মন্ত্র পাঠের পরামর্শ দেয় এবং বেশিরভাগ জীবিত মানুষই প্রার্থনাকে ঔষধের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করে। সম্ভবত আদিম এ রেওয়াজ, এবং সবচে' আধুনিক রেওয়াজও কাজ করতো আরোগ্যদানের ক্ষেত্রে সদপরামর্শের সহজাত ক্ষমতার কারণে। এসব আদি চিকিৎসকদের পদ্ধতিটি ছিলো তাদের সভ্য উত্তরসূরীদের থেকে অনেক বেশি নাটকীয় : ভর করা ভূতটিকে যে মুখোশ পরে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করতো, পশুর চামড়া পরিধান করে, চিৎকার, ক্ষেপার মত আচরণ, হাত-তালি এবং ঝুনঝুনি বাজিয়ে, ফাঁপা নলে ভুতটিকে চুষে টেনে বের করে আনতো; পুরোনো এক প্রবচন মতে "রোগী খুশী প্রতিকারকে যখন রোগ সারায় প্রকৃতি"। ব্রাজিলের বোরোরো জাতি সন্তানের অসুখে পিতাকে ঔষধ খাইয়ে এ বিজ্ঞানকে আরেক ধাপ উপরে তুলেছে, প্রায় সবক্ষেত্রে শিশুটিও সুস্থ হয়ে উঠেছে।

ঔষধী তৃণতলার পাশাপাশি আমরা তাদের ঔষধশাস্ত্রে রকমারী নিদ্রাকর ঔষুধের সন্ধান পাই যাতে ব্যথা প্রশমন ও অস্ত্রোপচার সম্ভব হতো। তীরের ফলায় ব্যবহৃত 'কিউআরার'- এর মত বিষ, ভাং, ওপিয়াম ও ইউকেলিপটাস্ ইতিহাসের চে' আদিম; আমাদের খুব জনপ্রিয় এক অনুভূতিনাশকের শিক্ষা এসেছে পেরুভিয়ানদের একাজে কোকার বীজের ব্যবহার থেকে। কার্টিয়ার বলে গেছেন কিভাবে ইরোকুয়িসরা হেমলক্ গাছের পাতা ও বাকল দিয়ে স্কার্ভির চিকিৎসা করেছে। আদিম শল্যবিদ্যা কয়েকরকম অস্ত্রোপচার ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানাতো। সন্তান-প্রসবের ব্যবস্থাপনায় ভালো দক্ষতা ছিলো; হাড়ভাঙ্গা ও ক্ষতের ক্ষেত্রে দারুনভাবে জোড়া দেয়া ও পট্টি বাধার জ্ঞান ছিলো। ওবসিডিয়ান পাথর বা চকমকি পাথরের ছুরি, মাছের দাঁতের সাহায্যে রক্ত বের করে দেয়া, ফোঁড়া ভেঙ্গে দেয়া, চামড়া বা পেশী নৈপুণ্যের সাথে কাটা যেত। খুলিতে ছোট্ট ছিদ্র করবার অভ্যাস প্রাচীন ডাক্তারদের, আদিম পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ান থেকে শুরু করে আধুনিক মেলানেশীর পর্যন্ত, সবার রপ্ত করা ছিলো; মেলানেশিয়াতে দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রে রোগী আরোগ্য লাভ করতো, যেখানে ১৭৮৬ প্যারিসের হোটেল ডিউতে এ অস্ত্রোপচারটি ছিলো জীবনের জন্য ভয়ানক হুমকিস্বরূপ।

আদিম অজ্ঞতায় আমরা হাসি আর একালের ব্যয়বহুল চিকিৎসায় নিজেদের সম্পূর্ণ করি। জীবনভর আরোগ্য দানের পর ড. অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস্ লিখেছেন : "স্বাস্থ্য রক্ষা বা জীবন বাঁচাতে, এমন কিছু নেই যা মানুষ করবে না, এমন কিছু নেই যা মানুষ অদৌধি করেনি। সবাই আত্মসমর্পণ করছে পানিতে অর্ধেক ডুবে থেকে, গ্যাসে অর্ধেক দমবন্ধ হয়ে, থুতনি পর্যন্ত চাপা দিয়ে বনতরীর দাসদের মতো গরম লোহায় শরীর ঝলসে। বড় মাছের মত ছুরির আঘাতে নিজেকে কুঁকড়ে, শরীরে সুঁই গেঁথে, চামড়ায় আগুন জেলে, সকল অখাদ্য গলাঃধকরণ করে এবং এত উৎসাহে সবটুকু খরচ করে যেন আগুনে ঝলসে যাওয়া বা বাষ্পে পুড়ে যাওয়াটা ছিলো বিশেষ এক অধিকার যেন ফোস্কা হচ্ছে আশির্বাদ আর জোঁকের কামড় হচ্ছে বিলাসিতা।"

৩. শিল্পকলা

সৌন্দর্যের অর্থ-শিল্পকলার অর্থ-আদিমের সৌন্দর্যবোধ-শরীরাংকন- প্রসাধন-উল্কি আঁকা-শরীরে গভীর দাগ বসানো-বস্ত্র অলংকরণ- মৃৎশিল্প-চিত্রকলা-ভাস্কর্য্য-স্থাপত্য শিল্প-নৃত্য-সঙ্গীত-সভ্যতার জন্য আদিম আয়োজনের সার সংক্ষেপ।

শিল্পকলার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্তির পরেও মানুষ এখনো তার উৎপত্তি ও ইতিহাস নিয়ে তর্ক করে। সৌন্দর্য্য কি?— কেন আমরা এতে মুগ্ধ হই? কেন আমরা এর সৃষ্টিতে সচেষ্ট হই? এখানে যেহেতু মনোস্তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ নেই, আমরা তাই সংক্ষেপে, কিছুটা দ্বিধান্বিত চিত্তে, এটুকু বলতে পারি যে, সৌন্দর্য্য হচ্ছে সেই গুণ যার সাহায্যে একটি বস্তু বা ভাব তার দর্শক বা গ্রাহককে আনন্দ দেয়। মূলত বস্তুটি দর্শককে এজন্য আনন্দ দেয় না যে, এটি সুন্দর, বরং দর্শক বস্তুটিকে সুন্দর বলে কারণ এটি তাকে আনন্দ দেয়; একটি বস্তু যখন কারো মনোস্কামনা পূরণ করে তখন তাকে সুন্দর মনে হয়; ক্ষুধার্তের কাছে খাবার সুন্দর— যদিও এটি আদতে সুন্দর কিছু নয়। সুন্দর বস্তুটি দর্শকের নিজের মতো সুন্দর নাও হতে পারে; আমাদের হৃদয়ের গোপন কোঠরে নিজের মত সুন্দর আর কিছুই নেই এবং শিল্পের শুরুটাই হয় নিজের এই সুন্দর শরীরটির প্রতি ভালোবাসা আর একে অলংকরণের মধ্য দিয়ে। অথবা ভালোলাগা বস্তুটি হতে পারে কাঙ্ক্ষিত সঙ্গী; আর তখন নান্দনিক মন উদ্দীপ্ত হয় কামনার তীব্রতায় এবং প্রেমিকার সকল বিষয়ে সে সৌন্দর্য্যের ক্ষরণ দেখতে পায় যে কোন রূপ যার সাথে প্রেমিকার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় যে কোন রং যা তার সাথে মানানসই, বা তাকে আনন্দ দেয় কিংবা তার কথা মনে করিয়ে দেয়। সকল অলংকার কিংবা পরিধেয় যা তার সঙ্গীর রূপ ধারণ করে। সকল আকৃতি সকল গতিময়তা যা তার প্রেমিকার অবয়ব কিংবা স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিফলন করে। অথবা ভালোলাগা বস্তুটি হতে পারে কাঙ্খিত পুরুষ; শক্তিসত্তার পূজো দেবার যে নাজুক অনুভূতি, যেখান থেকেই জন্ম নেয় মহিমান্বিত করার মানসিকতা— ক্ষমতাবানের পাশে থাকার পরিতৃপ্তি— সেটাই জন্ম দেয় সর্বোচ্চ অভিজাত শিল্পের। সবশেষে, প্রকৃতি নিজেও আমাদের সহযোগিতা পেলে সুন্দর ও মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে; শুধু এ কারণে নয় যে, প্রকৃতি নারীর সকল কমনীয়তা এবং পুরুষের শক্তিসত্তা, উভয়ের পূর্ণ আভাস দেয়, বরং এ কারণে যে, প্রকৃতির ভেতর আমরা আমাদের সকল অনুভূতি, সকল সম্ভাবনার প্রকাশ খুজে পাই, এর যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা স্মৃতির রোমন্থনে ভালোবাসার মানুষদের খুঁজে পাই, প্রকৃতির নীরব একাকীত্বে জীবনের সকল ঝড়-ঝাপটা থেকে এক বিন্দু মুক্তির স্বাদ পাই, তার সবুজ যৌবন, প্রবল পরিপক্কতা, "সুমিষ্ট ফলপ্রসূতা" আর শীতল বিদায়ের বিবর্তনে নিজের জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাই। একটু একটু করে বুঝতে পারি যে, সেই আমার মাতা আর মৃত্যুর পর তার কোলই আমার শেষ আশ্রয়।

সৌন্দর্য্যই শিল্পের স্রষ্টা; শিল্পকর্ম হচ্ছে বলা না বা ভাবের এমন এক বহিঃপ্রকাশ যাকে সুন্দর ও মহীয়ান বলে মনে হয় এবং সেজন্য এটি আমাদের

মাঝে আদিম সেই ভালোবাসার পুনঃকম্পনের সৃষ্টি করে যা একজন পুরুষ নারীর জন্য এবং একজন নারী পুরুষের জন্য অনুভব করে আসছে। শিল্পের ভাবনাটি হতে পারে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন মুহূর্তের স্মৃতিচারণ অনুভূতিটি হতে পারে উত্তেজনার এক বহিঃপ্রকাশ। শিল্পের রূপটি হতে পারে ছন্দময়, যা আমাদের প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে ওঠানামা করে, নাড়ীর রক্তের সাথে স্পন্দিত হয়, শীত-গ্রীষ্মের বর্ণ পরিবর্তন জোয়ার ভাটা কিংবা দিবারাত্রির সাথে তাল মেলায়; অথবা শিল্পটি তার সামঞ্জস্যে আমাদের মুগ্ধ করতে পারে, যাকে বলা যায় স্থিতিশীল ছন্দ যার প্রকাশে শক্তিসত্তার অনুভব হয়; যে কোন সামঞ্জস্য আমাদেরকে অনুপাতের আভাস দেয়— উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনুপাত নারী-পুরুষের অনুপাত, অথবা শিল্পটি রঙের মাধুরী ছড়াতে পারে, যা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে বা জীবনকে তীব্রতার করে; সবশেষে, শিল্পটি তার যথার্থতা বা সততায় আমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে কারণ প্রকৃতি বা বাস্তবতার স্পষ্ট অনুকরণের মাধ্যমে তা হয়তো বৃক্ষ বা প্রাণীজগতের সৌন্দর্য্য বা সময়ের ক্ষণস্থায়িত্বের আভাস দেয়, এবং ছুটে চলা সময়কে থামিয়ে দিয়ে আমাদের ধীর মস্তিস্কের জন্য দীর্ঘস্থায়ী আনন্দের সুযোগ করে দেয়। এ জাতীয় উৎসগুলোই জন্ম দেয় জীবনের মহান সব বাহুল্যের সঙ্গীত ও নৃত্য, সুর ও নাট্যকলা, মৃৎশিল্প ও চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সাহিত্য এবং দর্শনের। শিল্প ছাড়া দর্শনের কি মূল্য? শিল্প হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার আরো একটি প্রয়াস।

আদিম সমাজে সৌন্দর্য্যজ্ঞান যদি শক্তিশালী না হয়ে থাকে, তাহলে তার একটি কারণ এমন হতে পারে যে, যৌন কামনা এবং তার পূরণ করার মাঝে খুব কম সময় ব্যয় হওয়াতে বিষয়টির কাল্পনিক পরিবর্ধনের সুযোগ ছিলো না যা তার সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়াতে পারে। যাকে আমরা সৌন্দর্য্য বলি, আদিম মানব যেদিকে খেয়াল রেখে সঙ্গী নির্বাচনের কথা কখনো ভাবেনি; সে ভেবেছে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এবং বলিষ্ঠ বাহুর কন্যাকে কুৎসিত বলে বাতিল করবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। কোন স্ত্রী সবচে' সুন্দর এমন প্রশ্নের জবাবে ইন্ডিয়ান দলনেতা ভারী লজ্জায় পড়ে গেল কারণ এ বিষয়ে সে কখনো ভাবেনি। একজন বিচক্ষণ ফ্র্যাংকলিনের মত, তার জবাব, "সবার চেহারাই কম-বেশি সুন্দর, তবে অন্যান্য বিচারে সকল নারীই সমান।" আদিম মানবের সৌন্দর্য্যবোধ থাকলেও তা প্রায়শই আমাদের ধোকা দেয়, কারণ এটি আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ থেকে অনেকটাই ভিন্ন। রেইচার্ড বলেন, "যত নিগ্রো গোত্রকে আমি চিনি, সবাই নারীকে সুন্দর বলে যদি তার কোমর খানি সরু না হয়, এবং ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সমান প্রস্থের হয়; 'মই এর মত' উপকূলীয় এক নিগ্রোর ভাষায়।" আফ্রিকার পুরুষদের কাছে হাতির মতো কান আর ঝুলে থাকা ভুঁড়িই হচ্ছে নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতীক; পুরো আফ্রিকা জুড়ে স্থূলকায় নারীরাই সুন্দরী বলে বিবেচিত। মুঙ্গো পার্ক বলেন, নাইজেরিয়াতে "স্থূল এবং সৌন্দর্য্য প্রায় সমার্থক। সৌন্দর্য্যের মাঝামাঝি সারির দাবিদার হতে পারবে যদি সে দুই দাসের উপর দুই হাতের ভর না দিয়ে হাঁটতে না পারে; আর

সত্যিকারের সুন্দরী চলে উঠের পিঠে।" ব্রিফল্ট বলেন, "বেশিরভাগ আদিম পুরুষ নারীর সে বিষয়টিকে পছন্দ করে যা আমরা নারীর সবচে' জঘন্য বৈশিষ্ট্য বলে বিচার করি, সেটি হচ্ছে লম্বা, ঝুলে থাকা বুক।" ডারউইন বলেন "এটি ভালোই জানা আছে যে বহু হটেন্টট্ রমনীর শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ এক চমৎকার ভঙ্গিময় ঝুলে থাকে...;" এবং স্যার এন্ড্রু স্মিথের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুরুষ এই অদ্ভুত আকৃতি ভীষণ পছন্দ করে। তিনি এক নারীকে দেখেছিলেন যাকে সুন্দরী বলে মনে করা হতো এবং সে নারীর পশ্চাদ্‌ভাগ এতোটাই ভারী ছিলো যে, মাটিতে বসে সে আর উঠতে পারছিলো না, এবং মাটি ঘষতে সামনে যেতে হয়েছে যতক্ষণ না একটি ঢালু জায়গা পাওয়া যায়... বাটনের ভাষ্যমতে, সোমালি পুরুষদের সম্বন্ধে শোনা যায় যে তারা নারীদের এক সারিতে দাঁড় করিয়ে যার নিতম্ব সর্ববৃহৎ, তাকেই স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করতো। নারীর অন্যরূপ ছিলো নিগ্রো পুরুষদের সবচে' ঘৃণার বস্তু।

আসলে, এটাই হয়তো স্বাভাবিক যে, আদিম পুরুষ নারীর দৃষ্টিকোণে নয়, নিজের সাথে তুলনা করেই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতো। শিল্পের শুরু গৃহে। নারীর কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু আদিম পুরুষ আধুনিক পুরুষের মতোই দেমাগি বা অহংকারী ছিলো। প্রাণীজগতের মতো আদিম সমাজেও, সৌন্দর্য্যের নামে পুরুষেরাই সকল অলংকার পরিধান বা অঙ্গের কাটাছেঁড়া করতো। বনউইক বলেন, "অস্ট্রেলিয়াতে পুরুষেরাই একচেটিয়া সাজগোজ করে থাকে"; মেলানেশিয়া, নিউগিনি, নিউ ক্যারোলিনা, নিউ ব্রিটেন, নিউ হেনোভার এবং উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদেরও একই অবস্থা। কিছু কিছু গোত্রে, দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের চে' সাজগোজের পেছনেই বেশি সময় ব্যয় করা হয়। দৃশ্যত মানুষের প্রথম শিল্পকলাই হচ্ছে শরীরে কৃত্রিম রং মাখানো কখনো নারীকে আকৃষ্ট করতে, কখনো শত্রুকে ভয় দেখাতে। অস্ট্রেলিয়ার উপজাতিরা যখন তখন রং মাখানোর জন্য সাথে করে সাদা, লাল ও হলুদ রং বহন করতো; মজুদ শেষ হতে নিলে দূরত্ব বা বিপদের চিন্তা না করেই নতুন অভিযান চালাতো সাধারণ দিনে গালে, কাঁধে, বুকে রঙের কয়েকটি ফোঁটা দিলেই কাজ চলতো, কিন্তু উৎসবের দিনে সারা শরীর রঙিন করতে না পারলে সে নিজের নগ্নতায় লজ্জায় মরে যেতো।

কিছু গোত্রে শুধু পুরুষেরাই শরীরে রং মাখতে পারতো; অন্য কিছু গোত্রে, নারীরাও রং মাখতে পারতো, কিন্তু বিবাহিত নারীর ঘাড়ে রং মাখানো বারণ ছিলো। কিন্তু প্রসাধনের এ প্রাচীন শিল্প হস্তগত করাতে নারীরা খুব একটা পিছিয়ে ছিলো না। ক্যাপ্টেন কুক্ যখন নিউজিল্যান্ডে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়েছিলেন, নাবিকরা ডাঙ্গার অভিযান শেষ করে ফিরে এলে তিনি দেখেছেন যে, তাদের নাকে লাল কিংবা হলুদ রং লেগে আছে; সেখানকার হেলেনদের গায়ের রং তাদের নাকে লেগে ছিলো। মধ্য আফ্রিকার ফেল্লতা নারীরা দিনের কয়েক ঘণ্টা তাদের প্রসাধনে ব্যয় করতো : সারারাত মেহেদি মেখে হাত-পায়ের আঙুল বেগুনি রঙে সাজাতো; একেকটা দাঁত পর্যায়ক্রমে নীল, হলুদ ও বেগুনি রঙে রাঙাতো; চুলে দিতো

আকাশের নীল আর আঁখি পল্লবে এন্টিমনির সালফুবেট্। প্রতিটি বঙ্গো রমণী তার ভ্রূ ও চোখের পাতা ঠিক করবার জন্য হাত-ব্যাগে ছোট চিম্‌টা বহন করতো, তাতে আরো থাকতো চুলের পিন, কানের রিং বা ঘণ্টা, বোতাম এবং কব্‌জাদার দুল।

পেরিক্লিন গ্রিক্‌দের মত কিছু আদিম গোত্র চিত্রাংকনের পূর্ববর্তী ধাপ বা কিছু নকশা কাটার কাজ শুরু করলো, উল্কির আবিষ্কার করলো, শরীর চিঁড়ে দাগ বসানো বা বস্ত্র পরিধানের মত স্থায়ী সাজসজ্জার প্রচলন করলো। বহু গোত্রে নারী এবং পুরুষেরাও, রঙিন সুঁই-এর ব্যবস্থা শুরু করলো, এরা এমনকি ঠোঁটেও উল্কি আঁকতে লাগলো। গ্রিনল্যান্ডের মায়েরা তড়িথড়ি করে মেয়েদের উল্কি আঁকা শেষ করতো, যাতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি দেয়া যায়। বহুক্ষেত্রে, উল্কির দাগকেও কম দৃশ্যমান বা আকর্ষণীয় বলে মনে করা হতো এবং প্রত্যেক মহাদেশে বেশ কিছু গোত্র ছিলো যারা তাদের শরীরে গভীর করে দাগ কাটতো যাতে নিজেদের চোখে নিজেদের আরো সুন্দর মনে হয় অথবা শত্রুর চোখে আরো ভয়ংকর। থিওফির গটিয়ের যেভাবে দেখেছেন : "সাজার জন্য কাপড় না থাকাতে, নিজের চামড়াকেই সাজিয়েছে তারা।" পাথরের ছুরি বা ঝিনুকের খোলস দিয়ে চামড়া কাটা হতো এবং কখনো কখনো ক্ষতটিকে বড় করবার জন্য মাটির ফলা ঢুকিয়ে দেয়া হতো। টরেস প্রণালির উপজাতিরা উর্দি পরা সৈনিকের সামরিক চিহ্নের মত বড় বড় ক্ষত ধারণ করতো; অ্যাবিওকুটা গোত্র টিকটিকি, কুমির বা কচ্ছপের আদলে ক্ষত পরিধান করতো। জর্জ বলেন, "শরীরের এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাকি নেই রূপচচার নামে যাকে ঠিক করা হয়নি— রাঙিয়ে, বাঁকিয়ে, ছবি এঁকে, পুড়িয়ে, উল্কি এঁকে, পুনর্গঠন করে, লম্বা করে, ছোট করে, সকল উপায়ে চেষ্টা করা হয়েছে। বটকুডো গোত্রের নামটি এসেছে বটক (প্লোগ বা ছিপি) থেকে যা তারা আট বছর বয়স হলে কানে ও নিচের ঠোঁটে ছিদ্র করে লাগিয়ে দিতো এবং ছিদ্রটি বাড়তে বাড়তে ব্যাসে চার ইঞ্চি হওয়া পর্যন্ত বারবার চাকতিটি পাল্টে দিতো। হটেন্টট্ নারীরা তাদের যৌনাঙ্গের ক্ষুদাষ্ঠ টেনে ভীষণ লম্বা করে ফেলতো, শেষে এটি 'হটেন্টট্ এ্যাপ্রন্'-এ পরিণত হতো যা তাদের পুরুষেরা বেশ পছন্দ করতো। কান ও নাকের দুল ছিলো বাধ্যতামূলক; পিপ্‌স্‌ল্যান্ডের অধিবাসীরা ভাবতো, নাকের দুল ছাড়া মারা গেলে পরজন্মে বিরাট ভোগান্তি অপেক্ষা করছে। আধুনিক নারী বলতে ছাড়ে না যে, এগুলো ভীষণ বর্বারোচিত কাজ যখন সে নিজে কান ছিদ্র করে দুল পরে, ঠোঁটে ও গালে রং মাখে, ভ্রূ তুলে ফেলে, চোখের পাতার লোম ঝাঁকিয়ে ফেলে, মুখে, গলায় বা বাহুতে পাউডার মাখে এবং প্রায়শ পা টিপিয়ে নেয়। উল্কি-আঁকা নাবিক তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া আদিম মানুষকে শ্রদ্ধা-ভরা সহমর্মিতা জানায়; আর মূল ভূখণ্ডের ছাত্ররা তার পৈশাচিক অঙ্গহানির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়, তার গৌরবসূচক ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ঠাট্টা করে।

বস্ত্র তার মূলে, স্পষ্টত ছিলো এক অলংকরণ, যৌনতাকে উদ্দীপ্ত কিংবা নিরুৎসাহিত করতে ব্যবহৃত হতো, যতটা না ছিলো ঠান্ডা বা লজ্জা নিবারণের জন্য আবরণ বিশেষ। ক্যান্ত্রি বংশের লোকজনের নগ্ন শরীরে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ

চালানোর অভ্যাস ছিলো। ফুয়োজিয়ানদের বস্ত্রহীন শরীরে মায়ার বশবর্তী হয়ে ডারউইন যখন তাদের একটি লাল মোটা কাপড় দান করলেন, লোকেরা সেটিকে ছিঁড়ে ফালি ফালি করে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো। কুক তাদের সম্বন্ধে কালজয়ী এক কথা বলেছেন, তারা "নগ্নতা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলো, কিন্তু ভালো হবার ব্যাপারে উচ্চাভিলাষী ছিলো। যিশু সংঘের যাজক বা জেজুইট ফাদাররা পরিধেয় বস্ত্র দেয়াতে ওরিনোকো নারীরা একই আচরণ করেছে; তারা সেগুলোকে ছিঁড়ে গহনা বানিয়ে পরেছে এবং বলেছে যে, কাপড় পরলে তারা লজ্জায় পড়বে।" সচরাচর নগ্ন থাকা ব্রাজিলের এক উপজাতি সম্বন্ধে প্রাচীন এক লেখক লিখেছেন : "ইতোমধ্যে কেউ কেউ কাপড় পরতে শুরু করেছে, কিন্তু তার আয়তন এতই অল্প যে, তারা আসলে সততা রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, ফ্যাশন হিসেবে পরে, এবং পরে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে বলে, ...যেরকমটা অনেকেই দেখেছে যে, তারা মাঝেমধ্যে শুধুমাত্র নাভী পর্যন্ত ঢেকে, আর কিছু না পরে উপরে উঠে চলে আসে, বা অন্যেরা শুধুমাত্র মাথায় একটি টুপি পড়ে, বাকি সব ঘরে রেখে চলে আসে।" বস্ত্র যখন অলংকরণের চে' বেশি কিছু হয়ে উঠলো, তখন সে বিবাহিত নারীর বিশ্বস্ততার প্রতীকরূপে কাজ করলো এবং কিছুটা নারীমূর্তির অবয়ব ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করলো। যে কারণে আধুনিক রমণী বস্ত্র পরিধান করে, বেশির ভাগ আদিম রমণী ঠিক একই কারণে বস্ত্র পরিধান করা শুরু করেছিলো—এটা ঠিক নগ্নতাকে ঢাকবার জন্য নয়, তাদের নারীত্ব বা কমনীয়তার প্রকাশ বা পরিবর্ধনের জন্য। সবকিছুই পাল্টে যায়, ব্যতিক্রম শুধু নারী ও পুরুষ।

উভয় লিঙ্গ শুরু থেকেই বস্ত্রের চে' অলংকারকে বেশি পছন্দ করেছে। আদিম মানব কদাচিৎ জরুরি প্রয়োজনে বানিজ্য করেছে; এটি সাধারণেত সাজসজ্জা কিংবা বিনোদনের বস্তুতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। রত্নালংকার সভ্যতার বহু আদিম এক উপাদান; বিশ হাজার বছর আগেকার কবরেও খোলস এবং দাঁতে সাজানো গলার হার পাওয়া গেছে। এ ধরনের সাধারণ অফুকার দিয়ে শুরু হলেও সহসাই তা চিত্তাকর্ষক এক পর্যয়ে পৌঁছেছে এবং মানব জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছে। গালা রমণীরা তিন কেজি দুল পরতো এবং কিছু দিন্‌কা রমণী ত্রিশ কেজি অলংকার বহন করতো। রোদের তাপে আফ্রিকার বেলে রমণীর তামার দুল এত উত্তপ্ত হয়ে উঠতো যে, তাকে দাস নিয়োগ করতে হতো ছায়া দেয়া বা বাতাস করবার জন্য। কঙ্গোর ওয়েবুনিয়ার রানি গলাতে বারো কেজির তামার হার পরতেন; যখন তখন বিশ্রাম নেবার জন্য তাতে শুয়ে পড়তে হতো। দারিদ্র্যের কারণে যেসব রমণীর কপালে হাল্কা অলংকার জুটতো, তারা ধীরে ধীরে ভারী অলংকরণের কুশলী অনুকরণ শুরু করলো।

দেখা যাচ্ছে, শিল্পের প্রথম উৎপত্তি অনেকটাই মিলনের ঋতুতে পুরুষ পাখির বর্ণে বা পালকে সেজে ওঠার অনুরূপ; নিজেকে শ্রীমণ্ডিত করে রাখার আকাঙ্ক্ষা সার্বজনীন। নিজেকে এবং সঙ্গীকে ছড়িয়ে যেভাবে ভালোবাসার কিছু অংশ প্রকৃতির উপর উপচে পড়ে, একইভাবে ভালোবাসার প্রেরণা একক ব্যক্তি থেকে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। আত্মা তার অনুভবকে রঙে রাঙিয়ে এবং বিভিন্ন আকার

দিয়ে বস্তুরূপে প্রকাশ করতে চায়; শিল্পের শুরু তখনই যখন মানুষ কোন বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চায়। শিল্পের প্রথম বহিঃপ্রকাশ সম্ভবত মৃৎশিল্পে। রাষ্ট্র এবং বর্ণের মত, মৃৎশিল্পীর চাকা ঐতিহাসিক সভ্যতার অন্তর্গত; কিন্তু চাকা ছাড়াই আদিম মানব-অথবা বোধহয় মানবী— এ শ্রমশিল্পকে চারুশিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো; পানি আর আঙুলের দক্ষ ব্যবহারে সাধারণ কাঁদাকে দারুণ এক সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি দিয়েছিলো; দক্ষিণ আফ্রিকার বেরোঙ্গা অথবা পাবলো ইন্ডিয়ানদের মৃৎশিল্পগুলোর দিকে তাকাও। কুমোর যখন পাত্রগুলোর গায়ে রঙের নক্‌শা আঁকছিলো, তখন সে সৃষ্টি করেছে চারুশিল্পের। আদিমের হাতে চারুশিল্প তখনও আলাদা কোন শিল্পের রূপ নেয়নি; এটি মৃৎশিল্প এবং মূর্তিশিল্পের অংশ হিসেবেই টিকে ছিলো। আদিমেরা কাদার থেকে রং বানাতো, আন্দামানের লোকেরা গিরিমাটির সাথে তেল ও চর্বি মিশিয়ে তেল-রং বানাতো। আদিমেরা অস্ত্রপাতি, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ফুলদানির মত বিভিন্ন পাত্র, বস্ত্রাদি এবং ঘরবাড়িতে রং ব্যবহার করতো। আফ্রিকা ও ওশানিয়ার অনেক আদিবাসী তাদের গুহার দেয়ালে বা আশপাশের পাথরে শিকারের জীবজন্তুর ছবি এঁকে গেছে।

চারুশিল্পের মত ভাস্কর্য্যশিল্পও মৃৎশিল্প থেকে এসেছে; কুমোর একসময় বুঝতে পারলো যে, শুধু ব্যবহার্য জিনিসই নয়, বিভিন্ন বস্তুর অনুকরণে সে মূর্তি বানাতে পারে যা জাদুকরী তাবিজ হিসেবে অথবা শুধুমাত্র শোভাদানের কাজে আসতে পারে। এস্কিমোরা বল্‌গা হরিণের শিং এর সিন্ধুঘোটকের দাঁতের উপর বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের ছবি খোদাই করে গেছে। আদিম মানব তার গৃহে, টোটেমের খুঁটিতে বা কবরে এমন একটি ছবি আঁকতে বা খোদাই করতে চাইতো যা দেখলেই বোঝা যায় যে, যে তার উপাসনা করে বা একবরে কে শুয়ে আছে; প্রথমে হয়তো খুঁটির উপর শুধু চেহারা আঁকা হয়েছে, তারপর পুরো মুখ, এরপর পুরো শরীর; পূর্বজদের কবর চিহ্নিত করতে গিয়ে একসময় এটি ভাস্কর্য শিল্পে পরিণত হলো। ইস্টার দ্বীপের কবরগুলোর উপর এক-পাথরের বিরাট মূর্তি বসিয়ে মুখটি বন্ধ করে দেয়া হতো; এ ধরনের বহু ভাস্কর্য সেখানে পাওয়া গেছে, কিছু কিছু বিশ ফুট উঁচু, আর অনেকগুলো আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পরও বোঝা যায় যে, এরা প্রায় ষাট ফুট উচু ছিলো।

স্থাপত্যশিল্পের শুরু কীভাবে? আদমি ঘরবাড়ির প্রসঙ্গে 'স্থাপত্যশিল্প' শব্দটি ব্যবহার করা বোধহয় উচিৎ নয় কারণ স্থাপত্যশিল্প শুধু দালানকোঠা বোঝায় না, সুন্দর স্থাপনা বোঝায়। এটি শুরু হয়েছে, যখন কেউ একজন একটি দালান বানাতে চেয়েছে যা শুধু ব্যবহারে নয়, দর্শনেও হবে বিশিষ্ট। সম্ভবত স্থাপনাকে সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেবার ইচ্ছা জেগেছে গৃহকে ঘিরে নয়, কবরকে ঘিরে; কবরের স্মৃতিফলক যখন মূর্তিতে রূপ নিলো, কবর নিজেও তখন রূপ নিলো মন্দিরে। কারণ, আদিম মনে, জীবিতের চে' মৃতরাই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতাশালী; অধিকন্তু, মৃতের তো আর নড়াচড়ার দরকার ছিলো না, যেখানে জীবিতের প্রায়শই এদিক ওদিক ছুটতে হতো তার শেষ-নিবাসের জন্য ভালো একটি জায়গা খুঁজে পেতে।

বহু আগে, এবং সম্ভবত এসব খোদাই-কার্য বা কবর সাজানোর চিন্তাটি আসারও আগে, মানুষ তাল ও ছন্দে মজা পেতে শুরু করেছে এবং পশুপাখির কান্না বা মধুর ডাক, লাফ-ঝাঁপ বা লেজ নাচানোকে সঙ্গীত ও নৃত্যে রূপ দিয়েছে। পশুপাখির মত মানুষও হয়তো বলতে শেখার আগে গাইতে শিখেছে এবং গাইবার পাশাপাশি নাচতে শিখেছে। আর, নৃত্য ছাড়া অন্য কোন শিল্পই আদিম মানুষকে এতটা চিহ্নিত বা প্রকাশ করেনা। আদিম সরল রূপ থেকে সে এটিকে এমন হজারো জটিল জায়গায় নিয়ে গেছে যা সভ্য সমাজেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বড় উৎসবগুলো প্রধানত দলীয় এবং একক নৃত্যে উদ্‌যাপিত হতো। বড় যুদ্ধগুলো সামরিক স্তব বা গান এবং পদধ্বনি দিয়ে শুরু করা হতো, বড় ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠানগুলো ছিলো গান, নাটক ও নৃত্যের মিশ্রণ। এখন যাকে আমরা নিছক ছেলেখেলা বলে মনে করি, আদিম সমাজে তা হয়তো ছিলো মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তারা শুধু নাচার জন্য নাচেনি, বরং দেবতা বা প্রকৃতিকে কিছু একটা বোঝানোর জন্য নেচেছে; যেমন, সময়ে সময়ে অধিক জন্মদানের বিষয়টি মূলত সম্মোহনী নৃত্যের মাধ্যমেই নিশ্চিৎ করা হতো। স্পেনসারের মতে, যুদ্ধজয়ের পর দলনেতার গৃহে প্রত্যাবর্তনে তাকে স্বাগত জানানোর প্রথা থেকে নৃত্য এসেছে; ফ্রয়েডের মতে, নৃত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখের প্রাকৃতিক বহিঃপ্রকাশ এবং কামনাকে উদ্দীপ্ত করার দলগত পন্থা; যদি কেউ, এরকম নির্দিষ্ট করে, বলতে চায় যে, নৃত্য এসেছে ঐশ্বরিক কৃত্যানুষ্ঠান বা মূকাভিনয় থেকে এবং তিনটি উৎসকে এক করে নেয়, তাহলে আজ আমরা নৃত্যের উৎসের যে ধারণা করতে পারি, তার প্রকাশ পায়।

আমরা বোধহয় ধরে নিতে পারি যে, নৃত্য থেকেই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত এবং নাট্যকলার জন্ম। নৃত্যের ছন্দকে শ্রবণের রূপ দিতে গিয়ে এবং দেশপ্রেম বা সৃষ্টির আনন্দকে ছন্দের তারে প্রকাশ করতে গিয়ে সুরের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। বাদ্যযন্ত্রগুলো তাদের দৌরাত্মক ও সূক্ষ্মতায় সুনিপুণ না হলেও বৈচিত্র্যে ছিলো অসংখ্য : মেধারসবটুকু দিয়ে সে বানিয়েছে শিঙ্গা, তূর্য (ট্রাম্পেট্), ঘণ্টা (গং), টমটম, ঘণ্টা-দোলক (ক্ল্যাপার), ঝুনঝুনি, মন্দিরা, বাঁশি আর ঢাক ঢোল বানিয়েছে শিং, চামড়া, খোলস, হাতির দাঁত, তামা, পিতল, বাঁশ ও কাঠ থেকে; খোদাই করে, রং দিয়ে তাদের সাজিয়েছে। ধনুকের টান টান শর থেকে শ'খানেক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে— আদিমকালের বীণা থেকে শুরু করে বেহালা এবং আধুনিককালের পিয়ানো পর্যন্ত। গোত্রের মধ্যে পেশাদার গায়ক ও নৃত্যশিল্পী জেগে উঠেছিলো; সুরের ভাসাভাসা স্কেল বা ধাপ আলাদা করা গিয়েছিলো।

সুর, সঙ্গীত ও নৃত্যের সমন্বয়ে বর্বরেরা আমাদের জন্য নাটক ও গীতিনাট্যের সৃষ্টি করেছিলো। আদিম নৃত্য মূলত অনুকরণ- নির্ভর; এটি মানুষ ও প্রাণীদের গতিবিধির অনুকরণ করেছে, বিভিন্ন কার্য ও ঘটনার পুনর্গঠন করবার চেষ্টা করেছে। অস্ট্রেলিয়ার কিছু গোত্র একটি গর্তের চারপাশে গুল্ম বিছিয়ে তাকে ঘিরে যৌননৃত্যে মেতে উঠতো, এবং কিছু আধ্যাত্মিক ও যৌন ইঙ্গিত এবং লাফালাফির পর বর্শাগুলো গর্তের ভেতর প্রতীকী নিক্ষেপ করতো। একই দ্বীপের উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের গোত্রেরা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের একটি ঘটনা নাট্যস্থ করতো যা মধ্যযুগের নাটকের চে' রহস্যের এবং আধুনিক নাটকের চে' অনুরাগে কিছুটা হয়তো সরলতর: নর্তকেরা ধীরে ধীরে মাটিতে শুয়ে যেতো, গাছের ডালের নিচে মাথা লুকিয়ে ফেলতো এবং মৃত্যুর ভান করতো; তারপর আত্মার পুনরুত্থান বোঝাবার জন্য দলনেতার ইশারায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে উদ্দাম নৃত্যে মেতে উঠতো। একইভাবে হাজারো প্যান্‌টোমাইম্ (ইংরেজদের রূপকথার মূকাভিনয়) থেকে গোত্রগুলোর ঐতিহাসিক ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিক্ কর্মকাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যায়। এরকম মঞ্চাভিনয় থেকে যখন ছন্দের বিয়োগ ঘটলো, নৃত্য রূপ নিলো নাটকে এবং অন্যতম উর্ধ্বতন এক শিল্পের জন্ম হলো।

এভাবেই প্রাক্-সভ্যতার লোকজন সভ্যতার বিভিন্ন রূপ ও ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আদিম সংস্কৃতির এ সংক্ষিপ্ত জরিপের দিকে পেছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্র এবং লেখার আবিষ্কার ছড়া সভ্যতার বাকি সব উপাদানই তারা আবিষ্কার করে ফেলেছিলো। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সকল মাধ্যম তারা খুঁজে পেয়েছিলো : পশু বা মৎস্য শিকার, পশুচারণ বা চাষাবাদের জীবন, যাগাযোগ বা স্থাপনাশিল্প, শ্রমশিল্প, বাণিজ্য কিংবা হিসাব-বিজ্ঞান। রাজনৈতিক জীবনের সরল কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো : পরিবার, বংশ, সমাজ, গ্রাম, গোত্র; স্বাধীনতা ও শৃংখলা, যাদের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সভ্যতার পরিক্রমণ হয়, প্রথমবারের মত তাদের মধ্যে মীমাংসা এবং সমন্বয় হয়েছিলো; আইন ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা হয়। নীতিবোধের মৌলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় : শিশুর প্রশিক্ষণ, লিঙ্গগত প্রবিধান, সম্মাননা, শালীনতা, আচার-ব্যবহার ও বিশ্বস্ততার পত্তন হয়। ধর্মের ভিত প্রতিষ্ঠা হয়, নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা এবং গোত্রবদ্ধতায় বাধ্য করতে ধর্মীয় স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নগুলোর প্রয়োগ হয়। সুখের আবোল-তাবোল বোল থেকে জটিল ভাষার উদ্ভব হয়, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার গোড়াপত্তন হয়, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিমিত আগমন ঘটে। সর্বোপরি, এ ছিলো অবিশ্বাস্য সৃজনশীলতার এক ছবি, বিশৃংখলা থেকে উঠে আসা অপরূপ এক অবয়ব, পশু থেকে প্রাজ্ঞের পথে হাঁটার জন্য এক মানচিত্র। এসব তথাকথিত এবং তাদের শত-সহস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্ধের মত হাতড়ে ফেরা ছাড়া সভ্যতার সৃষ্টি হতো না। তাদের কাছে আমরা সর্বার্থে ঋণী—অলিখিত এবং দীর্ঘ এক বংশধারার চেষ্টায় পাওয়া সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ও সহজ এক জীবনের জন্য আমাদের এ প্রজন্মের নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করা উচিৎ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক সূচনা

১. আদি প্রস্তরযুগ

প্রাগৈতিহাসের উদ্দেশ্য—প্রত্নতত্ত্বের রোমাঞ্চ

কিন্তু আমরা কিছুটা বেফাঁস বলে ফেলেছি; সভ্যতার উপাদান সম্বন্ধে জানার জন্য যে আদিম সংস্কৃতিগুলোর কথা আমরা বলেছি তারাই যে আমাদের আদিপুরুষ, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আমরা যাদের সম্বন্ধে জানি তারা হয়তো উন্নত কোন সভ্যতার অধঃপতিত কিছু উত্তরসূরি, আর সে সভ্যতা হয়তো সুদূর কোন অতীতে বিলীন হয়ে গেছে যখন বরফের হিমবাহগুলো কর্কটক্রান্তি পর্যন্ত নেমে এসেছিলো। আমরা আসলে বুঝতে চেষ্টা করেছি সভ্যতা সাধারণ অর্থে কী করে জন্মায় এবং একটি অবয়ব ধারণ করে; এখনো আমাদের নিজেদের এই সভ্যতাটির প্রাগৈতিহাসিক উৎস খুঁজে বের করা বাকি আছে। এটি এমন এক ক্ষেত্র যা শুধু আমাদের উদ্দেশ্যের কিনারা পর্যন্ত পৌছাতে পারে; তাই যখন আমরা সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান চালাবো মানুষ ইতিহাসের আগে কী করে সভ্যতার জন্য তৈরি হচ্ছিল? কী করে জঙ্গলের বা গুহার মানুষ হয়ে উঠলো মিশরীয় স্থপতি, ব্যবিলনীয় জ্যোতির্বিদ, হিব্রু নবী, পারসি প্রশাসক, গ্রিক কবি, রোমান প্রকৌশলী, হিন্দু সন্ন্যাসী, চীনা জ্ঞানী এবং জাপানি শিল্পী, নৃতত্ত্ব থেকে প্রত্নতত্ত্ব হয়ে ইতিহাসের দিকে যেতে হবে।

সন্ধানীরা বিশ্বের সর্বত্র মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে : কারো চাই স্বর্ণ, কারো রৌপ্য, কারো লোহা, কারো বা কয়লা; তাদের মধ্যে অনেকে খুঁড়ছে জ্ঞানের সন্ধানে। মানুষের মধ্যে সে কী ব্যস্ততা সোমের তীর থেকে কবর খুঁড়ে আদি প্রস্তর যুগের চিহ্ন তুলে আনার, ঘাড়ে টান খেয়েও প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছাদে আঁকা জীবন্ত সব চিত্রের অধ্যয়ন করবার, চৌ কৌ তিয়েনের প্রাচীন খুলিগুলো তুলে আনবার, মহেঞ্জোদারো অথবা ইউকাতানের চাপাপড়া ধ্বংসাবশেষগুলো উদ্ধার করবার, মিশরের অভিশপ্ত কবর থেকে বিক্ষিপ্ত নিদর্শনগুলো ঝুড়িতে করে বয়ে আনবার, মিনোস্ এবং প্রিয়ামের প্রাসাদগুলো ওপরের মাটি সরিয়ে দেখবার, পার্‌সিপোলিস্ শহরের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচন করবার, কার্থেজের কিছু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্য আফ্রিকার মাটি খুঁড়ে দেখবার, জঙ্গলের ভেতর থেকে এ্যাংকার ওয়াতের রাজকীয়

মন্দিরগুলো পুনরুদ্ধার করবার! অথচ ১৮৩৯ সালে জ্যাক্‌স্ বাউচার ডি পারথেস্ ফ্রান্সের অ্যাবেভিলে প্রথম প্রস্তরযুগের কিছু ফ্লিন্ট (চকমকি পাথরের দ্রব্যাদি) পেয়েছিলেন; বিশ্ব তাকে বোকা বানাবার জন্য নয় বছর হেসেছে। ১৮৭২ সালে শ্রিমান্ তার নিজের টাকায় এবং প্রায় নিজহাতে ট্রয়ের সবচে' নবীন শহরটি পুনরুদ্ধার করেছিলেন; কিন্তু সারা দুনিয়া অবিশ্বাসীর হাসি হেসেছে। মানুষ অন্য কোন শতাব্দীতেই ইতিহাসে এতটা আগ্রহী ছিলো না যতটা ছিলো নবীন নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের সঙ্গী নবীন চ্যাম্পোলিয়নের অভিযাত্রার পরের শতাব্দীতে (১৭৯৬); নেপোলিয়ন ফিরেছে খালি হাতে, কিন্তু চ্যাম্পোলিয়ন ফিরেছে আদি ও বর্তমানের পুরো মিশরটাকে তার হাতের মুঠোয় ভরে। তারপর থেকে প্রতিটি প্রজন্ম একের পর এক নতুন সভ্যতা বা সংস্কৃতির আবিষ্কার করেছে এবং মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তার সীমানাকে দূর থেকে আরো দূরে নিয়ে গেছে। আমাদের এই খুনি জাতটির মধ্যে এই যে মহান কৌতূহল বা বোঝার জন্য বেপরোয়া আকঙ্ক্ষা বা ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা, এরচে' সুন্দর বোধহয় আর কিছু হয় না।

২. আদি প্রস্তর যুগের মানুষ

ভূতাত্ত্বিক পটভূমি— আদি প্রস্তর যুগের শ্রেণীসমূহ

বিপুল পরিমাণ লেখা হয়েছে— আদিম মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যা করবার জন্য এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ঢাকবার জন্যে। আদি এবং নব প্রস্তর যুগের মানুষের সম্বন্ধে বলবার জন্য আমরা বিজ্ঞানের অন্য এক কল্পনাপ্রবণ শাখার দ্বারস্থ হব; আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আদি প্রস্তর যুগ' ও 'নব প্রস্তর যুগে'র সংস্কৃতিগুলো আমাদের সমকালীন জীবনে কী অবদান রেখেছে তা উদ্ধার করা।

যে চিত্রটি আমাদের এ গল্পে পটভূমিরূপে স্থাপন করা উচিৎ তা হচ্ছে, আজকের পৃথিবী, যা আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য দিব্যি সহ্য করে যাচ্ছে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পৃথিবীর : সে এমন এক পৃথিবী যা বারংবার হিমায়িত হতে হতে হাজার বছরের জন্য বর্তমান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলকে তুন্দ্রা অঞ্চল বানিয়ে ফেলেছিলো, হিমালয়, আল্পস্ ও পিরামিডের মত বড় বড় পাথরের স্তূপ্ তৈরি করেছিলো এবং শেষে ধেয়ে আসা হিমবাহের দ্বারা জমিতে লাঙ্গর দিয়েছিলো। সাম্প্রতিক ভূ-তাত্ত্বিক মতবাদ অনুযায়ী, প্রথম বরফযুগ এসেছে ৫,০০,০০০ বছর আগে, আর শেষ বরফযুগ এসেছে ২৫,০০০ বছর আগে। আমরা এখন হিমবাহ পরবর্তী যুগে আছি, যার সমাপ্তি কবে হবে তা সঠিকভাবে হিসাব করা হয়নি। আমরা যদি সমকালীন বিজ্ঞানের অনিশ্চিৎ তত্ত্বগুলোকে মেনে নিই তাহলে বলা যায়, যে প্রাচীনগুলো অসম্ভব অভিযোজনশক্তি দিয়ে এরকম তুন্দ্রাচ্ছন্ন শতাব্দীগুলো পার করে বেঁচে ছিলো, তাদের মধ্যে একটি পরে কথা বলা শিখে নিয়ে মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আন্তঃহিমবাহ যুগে, যখন বরফ কিছুটা

পিছিয়ে যাচ্ছিলো (এবং আমরা যতটুকু জানি, এর বহু আগেই), এই অদ্ভুত প্রাণীটি আগুন আবিষ্কার করেছে, পাথর এবং হাড় থেকে অস্ত্র ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার শিল্প রপ্ত করেছে এবং এভাবে সভ্যতার আগমনের পথটি পাকা করে বেঁধেছে।

১৯২৯ সালে ডব্লিউ, সি, পোই, চীনের এক নবীন জীবাশ্মবিদ্, পিকিং থেকে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে চৌ কৌ তিয়েনে এক গুহায় একটি খুলির সন্ধান পেয়েছেন যাকে অ্যাবে ব্রুইল ও এলিয়ট স্মিথের মত বিশেষজ্ঞরা মানুষের খুলি বলে মনে করেছেন। খুলিটির পাশেই আগুনের চিহ্ন পাওয়া গেছে এবং পাথর কেটে তৈরি করা কিছু হাতিয়ার; কিন্তু মানুষের ব্যবহার্য এসব হাতিয়ারের সাথে মিশে ছিলো কিছু প্রাণীর হাড়গোড় যা জানামতে দশ লক্ষ বছর আগেকার আদি প্লেইস্টোসিন যুগের প্রাণীর। এই পিকিং খুলিই আমাদের জানামতে সবচে' পুরোনো মানব-জীবাশ্ম ; আর তার সাথে পাওয়া হাতিয়ারগুলো ইতিহাসের সবচে' পুরোনো মানব-সৃষ্ট বস্তু। সাসেক্স, ইংল্যান্ডের পিল্টডাউনে ১৯১১ সালে ডওসান্ ও উড্ ওয়ার্ড কিছু সম্ভাব্য মানবাবশেষ পান যা এখন 'পিল্ট-ডাউন ম্যান' বা 'ইউয়ানথ্রপাস্ (প্রভাত মানব) হিসেবে পরিচিত; এর বয়স ধরা হয়েছে খ্রি.পূ. ১০,০০,০০০ —১,২৫,০০০ সাল। জাভাতে ১৮৯১ সালে পাওয়া খুলি ও উরুর অস্থি এবং হেইডেনবার্গে ১৯০৭ সালে পাওয়া চোয়ালের হাড়ের উৎস বা বয়স নিয়েও একইরকম অনিশ্চয়তার কথা আছে। সবচে' পুরোনো এবং সন্দেহাতীত মানব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ১৮৫৭

	বছর পূর্বে	
প্রথম বরফ যুগ	৫০০,০০০	
	৪৭৫,০০০	প্রথম আন্তঃহিমবাহ যুগ
দ্বিতীয় বরফ যুগ	৪০০,০০০	
	৩৭৫,০০০	দ্বিতীয় আন্তঃহিমবাহ যুগ
তৃতীয় বরফ যুগ	১৭৫,০০০	
	১৫০,০০০	তৃতীয় আন্তঃহিমবাহ যুগ
৪র্থ (শেষ) বরফ যুগ	৫০,০০০	
	৩৫,০০০	

সালে জার্মানির ডুসেল্ডর্ফের কাছাকাছি নিয়েনডারথাল নামক জায়গায়; এরা ৪০,০০০ বছর পুরোনো এবং বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, এমনকি গ্যালিলি সাগরের তীরে এত বেশি পরিমাণে অনুরূপ মানবাবশেষ পাওয়া গেছে যে, 'লিয়েনডালথাল মানব' নামে পুরো একটি জাতির কল্পনা করা হয় যারা আমাদের চল্লিশ সহস্রাব্দ পূর্বে পুরো ইউরোপ জুড়ে রাজত্ব করেছে। তারা ছিলো খর্বকায়, কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিলো ১৬০০ সিসি — যা আমাদের চে' ২০০ সিসি বেশি।

ইউরোপের প্রাচীন এ অধিবাসীরা বিশ হাজার বছর আগে ক্রো-ম্যাগ্লন্ নামে নতুন এক জাতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিলো; এর প্রমাণ মেলে দ: ফ্রান্সের ডের্ডনে ১৮৬৮ সালে ক্রো-ম্যাগনল নামে এক মানব-নির্মিত গুহায় পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে। একই শ্রেণীর এবং বয়সের প্রচুর নিদর্শন মেলে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ওয়েইল্সের বিভিন্ন জায়গায়। এরা ভয়ানক বলিষ্ঠ গঠনের এক জাতির আভাস দেয়, যারা লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি থেকে ছয় ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার এবং মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা ছিলো ১৫৯০—১৭১৪ সিসি। নিয়েনডারথালদের মত ক্রো-ম্যাগনলদেরকেও আমরা 'গুহা-মানব' হিসেবে জানি যেহেতু তাদের নিদর্শনগুলো গুহায় পাওয়া গেছে; কিন্তু এমন কোন শক্ত প্রমাণ নেই যে, শুধুমাত্র এগুলোই ছিলো তাদের বাসস্থান; আবারো এটি হয়তো কালের এক ঠাট্টা যে, যারা গুহায় বাস করতো এবং সেখানেই মারা গেছে, শুধু তাদের হাড়গোড়গুলোই প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে পৌঁছেছে। সমকালীন তত্ত্বমতে, এ চমৎকার জাতিটি মধ্য এশিয়া থেকে রওয়ানা করে আফ্রিকা হয়ে ইউরোপ এসেছে ইটালি ও স্পেনের সেতু পার হয়ে। এসব জীবাশ্মের বিলি-বণ্টন বা অবস্থান মনে হয়, ইউরোপের দখল নিয়ে নিয়েনডারথালের সঙ্গে এদের যুগ যুগ ধরে, এমনকি হতে পারে শতাব্দীভর যুদ্ধ হয়েছে; এতই পুরোনো জার্মানি ও ফ্রান্সের দ্বন্দ্ব। সর্বক্ষেত্রেই, নিয়েনডারথালদের অন্তর্ধান হয়েছে; ক্রো-ম্যাগ্নন্ টিকে ছিলো, আধুনিক পশ্চিম ইউরোপের আদি পুরুষ হিসেবে এবং যে সভ্যতা আজ আমরা বহন করছি, তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবে বলে।

এরকম এবং আদি প্রস্তর যুগের আরো যেসব ইউরোপীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাদের আদি-নুমনা বা বৃহত্তম নমুনার ভিত্তিতে তাদেরকে সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ বিভাজন করা হয়েছে অমসৃণ বা ঘষামাজাহীন পাথরের হাতিয়ার বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ভিত্তিতে। প্রথমে তিনটি ভাগ সম্পাদিত হয়েছে সম্ভাব্য তৃতীয় ও চতুর্থ বরফ-যুগের মধ্যবর্তী সময়ে।

১. প্রাক-চেলিয়ান সংস্কৃতি, ১,২৫,০০০ বছর পূর্বেকার : নিম্ন স্তরে পাওয়া এ পাথর খণ্ডগুলোর বেশিরভাগ কোন বাহ্যিক আকৃতিদানের প্রমাণ বহন করে না এবং এরা যদি আদৌ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে প্রকৃতিতে যেরূপে পাওয়া গেছে, সেরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু বেশ কিছু পাথর মুষ্টির মাপে মিলে গেছে, এবং খুব সামান্য পরিমাণে হয়তো ভেঙে ভেঙে চোখা করা হয়েছে, একে বলা হয় 'মুঠো মাপের পাথর' (ব্লো অব্ দ্য ফিস্ট), যার জন্য প্রাক্-চেলিয়ান মানুষকে ইউরোপের প্রথম প্রস্তর-মানবের সম্মাননা দেয়া হয়।

২. চেলিয়ান সংস্কৃতি, ১,০০,০০০ বছর পূর্বেকার : দু'পাশ ভেঙে চোখা করে তারা এ অস্ত্র বা পাথরটির আরেকটু উন্নয়ন করে কাঠ বাদামের আকৃতি দেয়, যাতে তা হাতে আরো ভালে করে ধরা যায়।

৩. অ্যাকিউলিয়ান সংস্কৃতি, ৭৫,০০০ বছর আগেকার : বিপুল পরিমাণ নিদর্শন রেখে গেছে ইউরোপ, গ্রিনল্যান্ড আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, আফ্রিকা,

আরব, ভারত ও চীনে; এটি 'মুঠো মাপের পাথরে'র ডগা বা আকারের উন্নতি করা ছাড়াও বিচিত্র সব হাতিয়ার বানিয়েছে— হাঁতুড়ি, নেহাই, চাঁছুনি, তীর ও বর্শার ফলা এবং ছুরি; ইতোমধ্যেই একজন ব্যস্ত শ্রমজীবীর চিত্র দেখা যাচ্ছে।

৪. মোস্‌টেরিয়ান সংস্কৃতি, সব মহাদেশে বিশেষত ৪০,০০০ বছর আগে নিয়েনডারথালদের সংসর্গে : মুঠো পাথরের সংখ্যা খুবই কম যেন এটি ইতোমধ্যে প্রাচীণ হয়ে গিয়েছে এবং অন্য কিছুর দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। হাতিয়ারগুলো বড় এক খণ্ড পাথর কেটে তৈরি, হাল্কা, অধিক ধারালো, আগের চে' একটু বেশী আকৃতিধারী এবং দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের বা মিস্ত্রিদের পাকা হাতের কাজ। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্লেইস্টোসিন শিলাস্তরের উপরের দিকে নিদর্শন মেলে।

৫. অরিগ্‌নেশিয়ান সংস্কৃতির, ২৭,০০০ বছর পুরোনো : হিমবাহ-পরবর্তী প্রথম এবং ক্রো-ম্যাগনন্‌দের প্রথম সংস্কৃতি। পাথরের সাথে হাড়ের অস্ত্র বা দ্রব্যাদির সংযোগ হয়— পিন, নেহাই, চাঁছুনি ইত্যাদি। পাথর খোদাই করা চারুশিল্পের উদ্ভব হয়; দেখা যায় পাথর-পৃষ্ঠে খোদাই করা প্রতিমা, মূলত নগ্ননারী। ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে আসে।

৬. সলুট্রিয়ান সংস্কৃতি, ২২,০০০ বছর পূর্বে, ফ্রান্স, স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ড : অরিগ্‌নেশিয়ান অস্ত্রাদির সাথে যোগ হলো কাঁটা, ড্রিল, করাত, বর্শা, বল্লম; হাড় থেকে সরু এবং ধারালো সুঁই তৈরি হলো; বল্‌গা-হরিণের শিং থেকে অনেক নতুন দ্রব্যাদি তৈরি হলো, শিং-এর উপর পশুর ছবি খোদাই করা হলো যা আগেকার সংস্কৃতি চে' উন্নততর। সবশেষে, ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ সংস্কৃতির শীর্ষে পৌঁছে এলো।

৭. ম্যাগ্‌জেলেনিয়ান সংস্কৃতি, ১৮,০০০ বছর আগে পুরো ইউরোপ জুড়ে : হাড়, শিং বা হাতির দাঁতে তৈরি ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিরাট এক ভান্ডার দিয়ে এ কালকে আলাদা করা হয়, যারা সাধারণ কিন্তু যথার্থ সুঁই ও পিন তৈরি করতে শিখেছিলো; চারুশিল্পে এটি ছিলো আলতামিরা চিত্রের যুগ, যা ছিলো ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌দের সবচে' নিখুঁত ও সূক্ষ্ম কাজ।

আদি প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিগুলো সেইসব হস্তশিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো যা শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত ইউরোপের শিল্প ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে বেঁচে ছিলো। প্রস্তর যুগের শিল্পের বিশ্বজোড়া বিস্তারের কারণে ক্রো-ম্যাগ্‌নন্ সংস্কৃতির অবদান প্রাগৈতিহাসিক ও আধুনিক সভ্যতা পর্যন্ত সহজে পৌঁছাতে পেরেছিলো। ১৯২১ সালে রোডেশিয়ায় পাওয়া মাথার খুলি ও গুহাচিত্র, ডি মর্গানের হাতে ১৮৯৬ সালে মিশরে আবিষ্কৃত পাথরের নিদর্শনগুলো, সোমালিল্যান্ডে সেটন্-কার-কর্তৃক আবিষ্কৃত আদি প্রস্তর যুগের নিদর্শনসমূহ, ফাইয়ূম (মধ্য নীলনদের পশ্চিমের এক মরুদ্যান) অববাহিকার তলায় খুঁজে পাওয়া আদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন এবং দঃ আফ্রিকার স্টিল্ উপসাগরীয় সংস্কৃতি ইঙ্গিত দেয় যে, 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' বা আফ্রিকাও প্রায় একই রকম প্রাগৈতিহাসিক উন্নয়নের পর্যায় পার করেছে যেমনটি আমরা ইউরোপে পাথরের ব্যবহারে ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি। বলা যায়, তিউনিস্ ও

আলজিয়ার্সে পাওয়া কিছুটা-অরিগ্‌নেশিয়ান নিদর্শনসমূহ এরকম-ই ইঙ্গিত করে যে, এখানেই ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌দের আফ্রিকা পর্বের সমাপ্তি ও ইউরোপ পর্বের সূত্রপাত। আদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন সিরিয়া, ভারত, চীন, সাইবেরিয়া এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও পাওয়া গেছে; এন্ড্রু এবং তার পূর্বসূরিরা মঙ্গোলিয়াতে এর সন্ধান পেয়েছে; প্যালেস্টাইনে প্রচুর পরিমাণে নিয়েনডারথাল কঙ্কাল এবং মোস্‌টেরিয়ান-অরিগনেশিয়ান প্রস্তর-নিদর্শন পাওয়া গেছে; এবং আমরা দেখেছি সর্বপ্রাচীন মানবাবশেষ এবং তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র পিকিং শহরের পাশে ইদানীংকালে আবিস্কৃত হয়েছে। নেব্রাস্কায় কিছু হাড়ের তৈরি হাতিয়ার মিলেছে যাকে কিছু দেশপ্রেমিক কর্তৃপক্ষ পাঁচ লক্ষ বছর পুরোনো বলে দাবি করেছে; ওক্‌লাহোমা এবং নিউ মেক্সিকোতে কিছু তীরের ফলা পাওয়া গেছে যাদেরকে খননকারীগণ সাড়ে তিন লক্ষ বছর পুরোনো বলে নিশ্চিৎ করেছেন। সুদীর্ঘ সেই সেতু—যার মাধ্যমে ইতিহাস-উত্তর মানুষের কাছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা সভ্যতার ভিতগুলো উপহার দিয়েছে।

৩. আদি প্রস্তর যুগের শিল্পসমূহ

হাতিয়ার—আগুন—চারুকলা—ভাস্কর্য

কল্পনাকে লাগামহীন ছেড়ে না দিয়ে বরং প্রস্তর যুগের সমস্ত হাতিয়ার বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদিকে যোগ করলে আমরা সে সময়কার জীবন সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মুঠোয় ধরা একটি পাথরই হবে আমাদের প্রথম অস্ত্র; অনেক প্রাণীই আছে যারা মানুষকে এটি শিখিয়ে থাকতে পারে। কাজেই 'মুঠোয় ধরা পাথর'-এক প্রান্তে ধারালো, অন্য প্রান্ত মুঠোর মাপে গোলাকার— এটিই ছিলো আদমি মানুষের হাঁতুড়ি, কুড়োল, বাটালি, চাঁছুনি, ছুরি বা করাত; এমনকি আজো হ্যামার (হাঁতুড়ি) শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পাথর। ক্রমান্বয়ে এই একটি আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট হাতিয়ারে : এর মাঝ বরাবর ছিদ্র করা হয়েছে হাতল বসানোর জন্য; এক পাশে দাঁত বসানো হয়েছে করাত বানাবার জন্য, শাখা কেটে বের করা হয়েছে তীর বা বর্শা বানাবার জন্য। চাঁছুনি, যা ছিলো ঝিনুকের খোলস আকৃতির, তাহয়ে গেলো বেলচা বা ঠেলা-নিড়ানি; পাথরের অমসৃণ ভাগ ব্যবহৃত হলো উখা হিসেবে; গুলিতি পাথর হয়ে উঠলো এমন এক অস্ত্র যা ঐতিহাসিক প্রাচীনকালেও টিকে ছিলো। হাড়, কাঠ, হাতির দাঁত ও পাথর পেয়ে আদি প্রস্তর যুগের মানুষ গড়ে তুললো হাতিয়ার ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদির এক বিশাল ভাণ্ডার : মসৃণকারক, গোলা, কুড়াল, র‍্যাঁদ্, তুরপুন, দিয়াশলাই, ছুরি, বাটালি, নেহাই, ছবি আঁকার সুঁই, খঞ্জর, বড়শি, হারপুন, কীলক, বেধনিকা, পিন এবং, সন্দেহ নেই, আরো অনেক কিছু। প্রতিদিন সে নতুন নতুন জ্ঞানের সাথে হোঁচট খেতো এবং কখনো কখনো ধীশক্তির প্রয়োগে দৈবাত আবিষ্কারকে উদ্দেশ্যমূলক উদ্ভাবনে রিণত করতে পারতো।

কিন্তু আগুন হচ্ছে তার সবচে' বড় অর্জন। ডারউইন দেখিয়েছেন, কীভাবে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা মানুষকে আগুন-শিল্পের শিক্ষা দিয়ে থাকতে পারে; এস্‌কিলাসের মতে, প্রমিথিউস্‌-ই প্রথম লেম্‌নস্‌ দ্বীপপুঞ্জে আগ্নেয়গিরির মুখে নারথেক্সের ডাল ছুঁড়ে মেরে আগুন জ্বালানো শিখিয়েছে। নিয়েনডারথাল ধ্বংসাবশেষে কয়লা এবং পুড়ে যাওয়া হাড় পাওয়া গেছে; তাহলে মানুষ অন্তত: ৪০,০০০ বছর আগে আগুন জ্বেলেছে। ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ মানুষ আগুন জ্বালানোর চর্বি রাখার জন্য পাথর ঘষে বাটি বানিয়েছিলো : তেলের প্রদীপেরও তাহলে যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আগুনই সম্ভবত ধেয়ে আসা হিমবাহের ঠান্ডার হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো; আগুনই তাকে রাতের বেলা ঘুমানোর সুযোগ করে দিয়েছে। এর ভয়ে পশুরাও আতঙ্কিত, মানুষও পুজো দিচ্ছে আদিকাল থেকে। আগুন অন্ধকার দূর করেছে, ভয় কমিয়েছে, নিরাপত্তাহীনতার অবসান করেছে যা ইতিহাসের কালো পঙ্কতির মধ্যে এক ঝলক সোনালি আলোর মত। আগুন রান্নার সূত্রপাত করেছে, যা আদি ও শ্রদ্ধাভাজন এক শিল্প, মানুষের খাদ্য তালিকায় হাজারটি নতুন পদের সংযোজন করেছে; আগুন সর্বোপরি ধাতুর গলন ও মিশ্রণের পথ দেখিয়েছে; এক অর্থে বলা যায়, এটিই হচ্ছে ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ থেকে শিল্পবিপ্লব পর্যন্ত একমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নতি।

এটা সত্যিই অদ্ভুত-যেন রাজা রাজ্যের চে' পুরোনো প্রবল এই শিল্পসম্বন্ধে গটিয়েরের লাইনগুলো সত্যি প্রমাণ করবার জন্যেই আদি প্রস্তর মানবের সবচে' শক্তিশালী পদচিহ্ন হচ্ছে তাদের চিত্রকলা*। ষাট বছর আগে সেনর মারসেলিনো ডি সাটুওলা তার উত্তর স্পেনের আলতামিরা এস্টেটে এক বিরাট গুহার সন্ধান পেলো। কোন এক অদ্ভুত কারণে পাহাড় ধসে পড়ে স্ট্যালেগ্‌মাইটের আবরণে গুহার মুখটি হাজার বছরের জন্য বন্ধ হয়ে ছিলো। নতুন কোন নির্মাণ পরিকল্পের বিস্ফোরণে দুর্ঘটনাবশত গুহার মুখটি খুলে যায়। তিন বছর পর সাটুওলা গুহার ভেতরটা দেখতে চাইলেন এবং দেয়ালে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক আঁকাআঁকি লক্ষ্য করলেন। একদিন তার ছোট মেয়েও সাথে গেলো। বাবার মত ঝুঁকে হাঁটতে হয়নি বলে গুহার ছাদটি সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলো। সেখানেই সে খুব অস্পষ্ট রেখায় এবং তীব্র রঙে আঁকা একটি বড় বাইসনের ছবি দেখতে পেলো। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ছাদে ও দেয়ালে আরো অনেক গুলো ছবির দেখা পাওয়া গেলো। ১৮৮০ সালে সাটুওলা যখন এ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করলো, তখন নৃতাত্ত্বিকেরা তাকে সন্দেহমিশ্রিত সহানুভূতির সাধুবাদ জানালো। এদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে সম্মান দেখিয়ে চিত্রগুলো দেখতে গেলো, তবে আসল উদ্দেশ্য ছিলো এদরেকে বোঁকাবাজের জালিয়াতি বলে প্রমাণ করা। পরবর্তী ত্রিশ বছর এক ধরনের অবিশ্বাস কাজ করেছে, যা একেবারে অযৌক্তিকও নয়। তারপর যখন

* যার গর্বে আমরা সভ্য, তা হয়তো আমাদের একার নয়।

অন্যান্য গুহাচিত্র প্রাগৈতিহাসিক বলে স্বীকৃত পাচ্ছিলো (তাতে অমসৃণ পাথর এবং মসৃণ হাড় ও হাতির দাঁতের ব্যবহার দেখে), তখন সাটুওলার বিচার সঠিক বলে মানা হলো; কিন্তু সাটুওলা তখন মৃত। ভূতাত্ত্বিকেরা আলতামিরায় গেলো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করলো যে, চিত্রগুলোর উপর স্ট্যালেগ্‌মাইটের আস্তরণটি আদি প্রস্তর যুগের। সাধারণ জনমত এখন দাবি করে যে, আলতামিরা গুহাচিত্রগুলো— এবং বেশিরভাগ প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা— ১৮,০০০ বছর আগেকার ম্যাগ্‌জেলনিয়ান সংস্কৃতির অংশ। এর কিছুকাল পরের,তবে আদি প্রস্তর যুগের, আরো কিছু চিত্রকলা পাওয়া গেছে ফ্রান্সের অন্যান্য গুহায়, যেমন— কম্বারেলেস্‌, লেস্‌ ইজিয়েস্‌, ফঁতে গাউম ইত্যাদি।

বেশিরভাগ সময়ই এসব চিত্রের বিষয়বস্তু হয় প্রাণীকুল— বল্‌গা হরিণ, ম্যামথ্‌, ঘোড়া, বোর্‌, ভালুক ইত্যাদি, এগুলো সম্ভবত খাদ্য তালিকার অংশ বলেই শিকারের প্রিয় বস্তু ছিলো। কখনো প্রাণীগুলোর তীরবিদ্ধ চিত্র আঁকা হতো; ফ্রেইজার ও রেইনারের মতে, এগুলো ছিলো জাদুটোনার ছবি যাতে প্রাণীগুলো তার আয়ত্তে আসে, তাকে ধরে খাওয়া যায়। এটি পরিষ্কার যে, এ চিত্রগুলো বড্ড সরল, সৃষ্টির নান্দনিক উল্লাসে আঁকা; এটাই হতে পারে সবচে' খারাপ সন্দেহ যে, ছবিগুলো জাদুমন্ত্রের উদ্দেশ্যে আঁকা, নয়তো কমনীয়তায়, সামর্থ্যে বা দক্ষতায় এরা কখনো কখনো এতটাই শক্তিশালী যে চারুশিল্প, নিদেনপক্ষে চিত্রকলা, মানবের এত লম্বা ইতিহাসে আসলে খুব একটা এগোয়নি। এখানে একটি বা দু'টি সাহসী রেখায় জীবন, কর্ম ও অভিজাত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ; এখানে একটি মাত্র রেখায় (নাকি বাকি রেখাগুলো বিবর্ণ হয়ে পড়েছে) ফুটে ওঠে তেড়ে আসা জ্যান্ত বুনো পশু। লিওনার্দোর লাস্ট সারার বা এল্‌ গ্রেকোর এ্যাজাম্‌প্‌শান কি বিশ হাজার বছর পর এসব ক্রো-ম্যাগ্‌নন্‌ চিত্রের মত টিকে থাকতে পারবে?

চিত্রকলা বড্ড জটিল এক শিল্প, বহু শতাব্দীর মানসিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফসল। যদি আমরা সমসাময়িক তত্ত্বটি মানতে চাই (যা সবসময়ই ভয়ানক এক কাজ), চিত্রকলার জন্ম হয়েছে শিলামূর্তি থেকে, খোদাই চিত্রের পথ ঘুরে অবয়বের রূপরেখা এবং রঙে এসে থেমেছে; চিত্রকলা হচ্ছে দ্বিমাত্রিক ভাস্কর্য। মধ্যবর্তী চেষ্টাগুলোর খুব চমৎকার এক প্রতিনিধি হচ্ছে এক তীরন্দাজের (বা এক বর্শা নিক্ষেপকারীর) রিলিফ বা খোদাই-করা চিত্র, যা ফ্রান্সের লসেলের এক গুহায় অরিগ্‌নেশিয়ান সময়ে করা। লুইস রেগুয়েন ফ্রান্সের অ্যারিজে এক গুহায় ম্যাগ্‌ডেলেনিয়ান সময়কার কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেন যেখানে বল্‌গা হরিণের শিং-কে কেটে কেটে চমৎকার অলংকরণ করা হয়েছে; এদের মধ্যে একটি নমুনা এতটাই পরিপক্ব এবং পাকা হাতের কাজ যেন কয়েক প্রজন্মের ঐতিহ্য এবং উন্নয়নের ফলাফল এতে ঢেলে দেয়া হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক ভূমধ্যসাগরের আশপাশে— মিশর, ক্রিট্‌, ইটালি, ফ্রান্স এবং স্পেনে মোটা ও খর্বকায় নারীর অসংখ্য মূর্তি পাওয়া গেছে, যার দ্বারা মাতৃপূজা কিংবা সৌন্দর্যের আফ্রিকা মহাদেশীয় সংস্করণের আভাস পাওয়া যায়। চেকোশ্লোভাকিয়াতে

পুরাকীর্তির স্তূপের মধ্যে একটি বন্য ঘোড়া, একটি বল্‌গা হরিণ ও একটি ম্যামথের পাথুরে মূর্তি পাওয়া গেছে, যাদের বয়স হতে পারে ৩০,০০০ বছর।

আদিম মানুষের জীবনের রূপ প্রকাশের মাধ্যমে— চিত্রকলার পর্যালোচনায় আমরা ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি, তা হয়তো তাদের সমগ্র কাজের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র, কারণ বারবার আমাদের অগ্রগতি হোঁচট খায় এদিক-ওদিক একটি মূর্তি, একটি রিলিফ বা একটি চিত্রকলার আবিষ্কারে। যত ধ্বংসাবশেষ এবং চিত্রকলার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনই পাওয়া যাচ্ছে, সবই মিলেছে গুহার ভেতর, যেখানে আসলে নিদর্শনগুলো অনেকটা সুরক্ষিত অবস্থায় থাকতে পেরেছে; কিন্তু এটি তো কখনোই যৌক্তিক হতে পারে না যে, আদিম মানুষ শুধুমাত্র গুহাবাসের সময়েই চিত্রকলার চর্চা করেছে। তারাও হয়তো অধ্যবসায়ী জাপানিদের মত যত্রতত্র খোদাই করেছে এবং গ্রিকদের মত ঢালাও হারে মূর্তি বানিয়েছে; তারা হয়তো শুধু গুহার গায়েই ছবি আঁকেনি, হয়তো পরিধেয় বস্ত্রাদি, কাঠ, সবকিছুর উপর— এমনকি নিজের গায়েও ছবি এঁকেছে। তারা হয়তো অনেক মাস্টারপিস্‌ও এঁকেছিলো যা টিকে থাকা অংশের তুলনায় অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। গুহার ভেতর বল্‌গা হরিণের শিং কেটে তৈরি করা একটি ফাঁপা নল পাওয়া গেছে যা রঞ্জকে ভরা ছিলো; আরেক গুহায় একটি পাথরের ইজেল পাওয়া গেছে যা দু'শ' শতাব্দী পার করেও লাল গিরিমাটির রঙে কাদাকাদা হয়ে আছে। দৃশ্যত আঠারো হাজার বছর আগে চিত্রকলা বেশ উন্নত ছিলো এবং সর্বত্র এর চর্চা হতো। হতে পারে, আদি প্রস্তর যুগের মানুষদের পেশাদারী চিত্রশিল্পীর একটি শ্রেণী ছিলো; হতে পারে, কিছু দরিদ্র ভবঘুরে জীর্ণশীর্ণ গুহার ভেতর অভুক্ত মরছিলো, আর সমৃদ্ধশালী বুর্জুয়াদের গাল দিতে দিতে এ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেবার ফন্দি করছিলো এবং ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য মায়ার পরবশে অ্যান্‌টিক বা গৌরবান্বিত অতীতের নিদর্শন ছেড়ে যাচ্ছিল।

৪. নব প্রস্তর যুগ

কিচেন মিডেন্‌স্ —হ্রদবাসী — চাষাবাদের আগমন — পশুকে পোষ মানানো — প্রযুক্তি — নব প্রস্তর যুগের বুননশিল্প — মৃৎশিল্প — স্থাপনা — পরিবহন — ধর্ম — বিজ্ঞান — সভ্যতার জন্য প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর সারসংক্ষেপ

গত একশ' বছরের বিভিন্ন সময় প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে ফ্যান্স, সার্ডিনিয়া, পর্তুগাল, ব্রাজিল, জাপান ও মাঞ্চুরিয়াতে এবং বিশেষত ডেনমার্কে, যেখানে তারা এই অদ্ভুত উপাধিখানি পেয়েছে— কিচেন মিডেন্‌স্ (রান্নাঘরের বর্জ্য) এবং এরকম সকল প্রাচীন বর্জ্যকে এখন এই নামেই ডাকা হয়। এসব বর্জ্যের স্তূপের মধ্যে আছে ঝিনুক, বিশেষত মাস্‌ল্, পেরিউইংক্‌ল্ এবং অয়েস্টারের খোলস্; স্থল ও জলের বিভিন্ন প্রাণীর হাড়, শিং, হাড় ও অমসৃণ পাথরের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও হাতিয়ার; ছাই, কয়লা এবং মৃৎশিল্পের ভাঙাচোরা টুকরো। এরূপ পাঁচ মিশালি বস্তুর অ-প্রক্রিয়াজাত মিশ্রণ

থেকে একটি সাদামাটা সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায় যার জন্ম হয়েছিলো খ্রিস্টের জন্মের ৮,০০০ বছর আগে— আদি প্রস্তর যুগের পরে, কিন্তু সত্যিকারের নব প্রস্তর যুগেও নয়, কারণ মসৃণকৃত পাথরের ব্যবহার তখনো শুরু হয়নি। যারা এ নিদর্শনগুলো ছেড়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি, শুধু তাদের গায়ের কিছুটা ক্যাথলিক গন্ধ ছাড়া। এর সাথে আকেরটু পুরোনো ফ্রান্সের মেজ্‌জাজিল সংস্কৃতিকে যোগ করলে মেসোলিথিক (মধ্য প্রস্তর যুগ) বা আদি ও নব প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী সময়টুকু সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

১৮৫৪ সালের শীতকালটি তুলনামূলক শুষ্ক হওয়াতে সুইস্ হ্রদের উচ্চতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিলো এবং আরেকটি প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়ের উন্মোচন হয়েছিলো। হ্রদের পাড়ে প্রায় দু'শ জায়গায় মাটির স্তূপ জেগে উঠেছিলো যা তিন থেকে সাত হাজার বছর ধরে সেখানে দাঁড়িয়েছিলো। মাটির স্তূপগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত ছিলো যে বোঝা যাচ্ছিল, এসব মাটির স্তূপে গড়ে উঠেছিলো কিছু গ্রাম, যারা সম্ভবত প্রতিরক্ষা বা নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের স্বার্থে হ্রদের উপর বাস করতে চেয়েছে; প্রত্যেকটি স্তূপ সরু এক ফালি রাস্তা দিয়ে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিলো যার কিছু কিছু এখনো টিকে আছে; কিছু কিছু ঘরবাড়ির দেয়ালও হ্রদের পানির শান্ত নড়াচড়ায় টিকে থাকতে পেরেছে। ফ্রান্স, ইটালি, স্কটল্যান্ড, রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা, ভারত ও অন্যান্য জায়গায় হ্রদবাসীদের এরকম আরো কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। বোর্নিও, সুমাত্রা, নিউগিনিতে এখনো এজাতীয় গ্রামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভেনিজুয়েলার নামের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র ভেনিস; ১৪৯৯ সালে অ্যালন্‌জো ডি ওজেডা ভেনিজুয়েলায় গিয়ে দেখেছে যে সেখানকার লোকেরা একই রকমভাবে মারাসেইবো হ্রদে বাস করতো।

হ্রদবাসীদের এ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হাড় ও মসৃণকৃত পাথরের জিনিসপত্র পাওয়া গেছে যার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একে নব প্রস্তর যুগ বলে সনাক্ত করেছেন, যা ১২,০০০ বছর আগে এশিয়াতে এবং ৭,০০০ বছর আগে ইউরোপে বিরাজ করছিলো। মিসিসিপি উপত্যকা ও তার শাখা নদীগুলোতে এক অদ্ভুত সংস্কৃতির গড়া কিছু সুউচ্চ মাটির ঢিবির অনুরূপ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় যাদের আমরা বলি 'মাউন্ড-বিল্ডারস্' সংস্কৃতি। তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি, শুধু বেদি সদৃশ এ ঢিবিগুলোর ভেতর বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি, টোটেম বা প্রাণীমূর্তি, পাথর, ঝিনুক, হাড় ও পেটানো ধাতুতে গড়া দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে, যার জন্য এ সংস্কৃতিকে নব প্রস্তর যুগের শেষভাগের বলে মনে করা হয়।

এজাতীয় সকল ধ্বংসাবশেষকে এক করলে নব-প্রস্তর যুগের যে চিত্রটি ফুটে ওটে, তাতে অবলীলায় আমরা এক চমক্‌প্রদ আবিষ্কারের গন্ধ পাই— চাষাবাদ। একভাবে বলা যায়, মানবের পুরো ইতিহাসকে দুটি কব্‌জায় ভাঁজ করা যায় : প্রথমটি হচ্ছে নব প্রস্তর যুগ, যা দিয়ে শিকারির জীবন থেকে চাষাবাদের জীবন আলাদা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আধুনিকতার যুগ, যার মাধ্যমে চাষাবাদের জীবন থেকে শিল্প ভিত্তিক জীবনের সূচনা হয়েছে; অন্য কোন বিশেষ বিন্দুই এতটা

মৌলিক এবং বাস্তব নয়। ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষণে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব হ্রদবাসীরা গম, মিলেট, রাই, বার্লি বা যব্ জাতীয় শস্যের পাশাপাশি একশ' বিশ রকমের ফল ও হরেক রকম বাদামে আহার সারতো। এসব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লাঙ্গলের দেখা পাওয়া যায় না এবং তা একারণে হতে পারে যে, প্রথম লাঙ্গলটি হয়তো ছিলো কাঠের লাঙ্গল— শক্ত গাছের গুঁড়ি এবং তার এক শাখায় পাথর বসানো; নব প্রস্তর যুগের এক খোদাই কর্মে নিশ্চিৎরূপে দেখা যায় যে, এক লোক দুই ষাঁড়ের কাঁধে লাঙ্গল টেনে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চাষাবাদ শুরু হবার আগে, পৃথিভী মাত্র দু'কোটি মানুষকে ধারণ করতে পারতো (স্যার আর্থার বেইসের তড়িৎ অনুমান), আবার এদের আয়ুষ্কালও ছিলো যুদ্ধ ও শিকারের কারণে অতি সংক্ষিপ্ত; চাষাবাদের দ্বারাই জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে এবং এ গ্রহটির উপর আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ইতোমধ্যে, নব প্রস্তর যুগের মানুষেরা সভ্যতার অন্য আরেকটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলো : পশুকে পোষ মানানো এবং অন্তর্প্রজননে তার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো। সন্দেহ নেই, এটি ছিলো দীর্ঘ এক প্রক্রিয়া, সম্ভবত নব প্রস্তর যুগের আগেই এর সূত্রপাত হয়েছে। মানুষ ও পশুর এ সংঘবদ্ধতার কারণ হতে পারে যে, সে হয়তো আদতেই সঙ্গীপ্রিয়; কারণ এখনো আমরা সহসাই দেখতে পাই, সমকালীন আদিমেরা বন্য প্রাণীদের পোষ মানাতে ভালোবাসে এবং বানর, টিয়া বা এরূপ সঙ্গীতে ঘর ভর্তি করে ফেলে। নব প্রস্তর যুগের সবচে' পুরোনো যে হাড় পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে কুকুরের হাড় (আনুমানিক ১০,০০০ বছর পুরোনো)— মানবজাতির সবচে' পুরোনো ও বিশ্বস্ত সঙ্গী। কিছুকাল পরেই (৮,০০০ বছর আগে) আসে ছাগল, ভেড়া, শূকর ও ষাঁড়। সবার শেষে ঘোড়া, গুহাচিত্রের বিচারে আদি প্রস্তর যুগে যা ছিলো শিকারের পশু; মানুষ একে তার ডেরায় নিয়ে গেছে, পোষ মানিয়েছে এবং বিশ্বস্ত দাসে রূপ দিয়েছে; তাকে হরেক রকম কাজে নিয়োগ দিয়ে মানুষ তার সম্পদ, অবসর বা ক্ষমতার বৃদ্ধি করেছে। ভূ-জগতের নতুন ঈশ্বর তখন শিকারের পাশাপাশি পশুপালনের মাধ্যমে খাদ্য ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটানো; এবং গরুর দুধের ব্যবহারও সম্ভবত একই সময়ে শুরু হয়েছিলো।

নব প্রস্তর যুগের উদ্ভাবকেরা ধীরে ধীরে তাদের যন্ত্রপাতির বাক্স এবং অস্ত্রাগারের উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হলো। তাদের ধ্বংসাবশেষগুলোতে কপিকল, লিভার, শানপাথর, বেধনিকা, সাঁড়াশি, কুড়াল, নিড়ানি, মই, বাটালি, ধুরা, তাঁতের চাকা, কাস্তে, করাত, বড়শি, হাঁটার স্কেট, সুঁই, কাপড়ের পিন, আলপিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। সর্বোপরি, এখানে চাকার আবির্ভাব হয়, যা মানবজাতির অন্যতম মৌলিক এক আবিষ্কার, শ্রমশিল্প ও সভ্যতার অন্যতম অপরিহার্যতা; নব প্রস্তর যুগে শেষ হবার আগেই এটি সাধারণ চাকতি এবং পাখি-অলা (স্পাক্) চাকতির জন্ম দেয়। সব ধরনের শিলা-ডাইওরাইট ও অব্‌সিডিয়ানের মত ভীষণ শক্তগুলোও— ভেঙে, ছিদ্র করে ব্যবহারযোগ্য আকৃতিতে আনা হয়েছে। বিপুল পরিমাণে চকমকি পাথর খনন করা হয়েছে।

ইংল্যান্ডের ব্রানডনের এক খনিতে নব প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আটটি হরিণের শিং পাওয়া গেছে যার ধুলোমায় শরীরে দশ হাজার বছর আগেকার শ্রমিকদের আঙুলের ছাপ দেখা গেছে। সে সময় বেলজিয়ামের এক খনিতে কর্মরত এক শ্রমিক আকস্মিক ভূমি ধসে জীবন্ত-জীবাশ্মে পরিণত হয়, এখনো হরিণের শিং-এ তৈরি কোদালটি তার হাতে ধরা আছে; শত শতাব্দীর দূরত্বের পরও তাকে আমাদেরই একজন বলে মনে হয় এবং আমরা তার আতঙ্ক ও তীব্র যন্ত্রণায় সমবেদনা জানাই। জানিনা কত শতাব্দী জুড়ে মানুষ এ পৃথিবীর পেট খুঁড়ে চলেছে এবং সভ্যতার খনিজ ভিত্তিগুলো বের করে আনছে!

কাপড়ের সুঁই আর উলের কাঁটা বানাবার পর মানুষ বুনতে শুরু করলো; অথবা বুনতে শেখার পরই সুঁই আর কাঁটা বানাবার কথা ভাবলো। পশুর চামড়া আর লোমে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়নি বলে সে ভেড়ার লোমে উল আর গাছের আঁশে দড়ি বানালো এবং এর সাহায্যে বস্ত্র বুনতে লাগলো যা থেকে এসেছে হিন্দুর শাড়ি, গ্রিকদের টোগা, মিশরীয়দের ঘাগড়া এবং অন্যান্য বস্ত্রাদি। গাছের রস বা মাটির খনিজ থেকে রং বানালো এবং রাজকীয় সকল পোশাকাদিতে রঙের ব্যবহার শুরু হলো। প্রথমে বোধহয় চুলের বিনুনি করবার মত এক দড়ির সাথে আরেক দড়ির প্যাঁচে কাপড় বোনা হলো; তারপর পশুর চামড়ার প্রান্তদেশ ছিদ্র করে চামড়াগুলো দড়ির বাঁধনে জোড়া দিয়ে বানানো হলো সেকালের অন্তর্বাস এবং আজকের জুতা; ক্রমান্বয়ে দড়িগুলো সূক্ষ্ম হতে হতে সুঁতোয় রূপ নিলো, এবং বুনন বা সেলাই শিল্প নারীর অন্যতম প্রধান শিল্পে পলিণত হলো। নব প্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া সুতো প্যাঁচানোর আঁটি আর সুতো কাটার ধুরা মানবশিল্পের অন্যতম এক উৎসের সন্ধান দেয়। এগুলোর মধ্যে আয়নারও সন্ধান পাওয়া গেছে; সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই তৈরি ছিলো।

আদি প্রস্তর যুগের কবরগুলোতে মৃৎশিল্পের কোন চিহ্ন ছিলো না; সামান্য কিছু প্রচেষ্টার দেখা পাওয়া যায় বেলজিয়ামের ম্যাগ্‌জেলেনিয়ান সংস্কৃতিতে, কিন্তু সত্যিকারের উন্নত মৃৎশিল্পের জন্য আমাদের মধ্য প্রস্তর যুগের কিচেন্-মিডেন্ পর্যন্ত অপেক্ষা কতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ শিল্পেরও উৎসটি অজানা। হতে পারে, কোন মনোযোগী বর্বর লক্ষ্য করেছে যে, পায়ের চাপে তৈরি হওয়া গর্ত দিয়ে পানি সহজে চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না; হতে পারে, ভেজা কাদার দলা পাশে থাকা আগুনে দৈবাৎ পুড়ে গিয়ে তাকে এ উদ্ভাবনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং তাকে এমন এক মাধ্যমের সম্ভাবনার কথা বলেছে যার পরিমাণ করা বোকামি, যাকে খুব সহজেই যে কোন আকৃতি দান করা যায় এবং যাকে রোদে বা আগুনে পুড়িয়ে কঠিন বানিয়ে তোলা যায়। মানুষ নিঃসন্দেহে হাজার বছর ধরে খাদ্য ও পানীয় লাউ, নারকেল বা ঝিনুকের মত প্রাকৃতিক আধারে বয়ে বেরিয়েছে; তারপর সে কাঠ ও পাথর কেটে চামচ, হাতা বা পেয়ালা বানিয়েছে, বেত ও খড় দিয়ে বানিয়েছে ঝুড়ি আর এবার বানালো কাঁদার পাত্র, যা মানব শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন। ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষায় যতটুকু বোঝা যায়, নব প্রস্তর যুগে মানুষ

মৃৎশিল্পীর চাকার কথা জানতো না; কিন্তু শুধু হাতের সাহায্যে সে কাঁদার পাত্রের এমন সব আকৃতি দাঁড় করিয়েছে, এমন সব ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে, ছোটখাটো নকশায় এমন করে সাজিয়েছে যে শুরু থেকেই এটি শ্রমশিল্প এবং চারুশিল্প উভয়দিকেই যাত্রা শুরু করেছে।

নব প্রস্তর যুগে আরো একটি শ্রমশিল্পের সূচনা হয়— স্থাপনাশিল্প। আদি প্রস্তর যুগের মানুষ গুহা ছাড়া অন্য কোন আবাসস্থলের প্রমাণ রেখে যায়নি। কিন্তু এখানে আমরা মই, কপিকল, লিভার ও কব্জার মত স্থাপনা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যাদির দেখা পাই। হ্রদবাসীরা ছিলো দক্ষ কাঠমিস্ত্রি; তারা পিলার ও বিমের জোড়া দিয়েছে ছিদ্রের মধ্যে কাঠি ঢুকিয়ে, মুখে মুখে ঘাট কেটে দু'টি কাঠকে জোড়া দিয়েছে, অথবা আড়াআড়ি ছোট কাঠের টুকরো বসিয়ে জোড়াটি শক্ত করেছে। গাছের বাকল, খড়, বেত বানল খাগড়ায় গড়েছে ছাদ; মেঝে ও দেয়ালে লাগিয়েছে কাদার প্রলেপ। চাকা ও কপিকলের সাহায্যে বাড়িঘরের সাজ-সরঞ্জাম দূর থেকে দূরে বয়ে নিয়ে গেছে, পুরো গ্রামের ভিত গড়েছে পাথর দিয়ে। পরিবহন ব্যবস্থাও পরিবহন শিল্পে রূপ নিয়েছে : ডিঙ্গি বানানো হয়েছে, নিশ্চয়ই পুরো হ্রদ জীবিত হয়ে উঠেছিলো সহস্র ডিঙ্গির চলাচলে; ব্যবসার বিস্তার ঘটেছিলো মহাদেশীয় দূরত্বে এবং পর্বতের উচ্চতায়। দূর দূরান্ত থেকে ইউরোপ আমদানি করেছে অ্যাম্বার, ডাই ও রাইট, জেডাইট ও অব্‌সিডিয়ান পাথর। একই রকম শব্দ, বর্ণ, লোককাহিনি, মৃৎশিল্প, নকশা থেকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন সমাজের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক কোন পার্থক্য ছিলো না।

তবে নব প্রস্তর যুগে মৃৎশিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্পের দেখা মেলে না, আদি প্রস্তর যুগের চিত্রকলা ও মূর্তিগুলোর সাথে তুলনা করবার মত কিছুই করেনি তারা। নব প্রস্তর সমাজের যত্রতত্র, ইংল্যান্ড থেকে চীন পর্যন্ত, আমরা দেখতে পাই ডোলেমন্ নামে পাথরের গোলাকার স্তূপ, মেন্‌হির নামের খাড়া করা প্রকাণ্ড এক পাথর, এবং বিশাল ক্রোমোলেক্-স্টোনহেঞ্জ বা মোরহিবানের মত পাথরের এক অদ্ভুত নির্মাণ যার কোন কারণ বা উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। সম্ভবত একরম এক-পাথরের গড়া প্রকান্ত স্তম্ভগুলোর কার্য বা কারণ সম্বন্ধে আমরা কখনোই জানতে পারবো না; এগুলো মন্দির বা বেদির ধ্বংসাবশেষ হতে পারে। নব প্রস্তর সমাজে ধর্ম ছিলো, সূর্যের দৈনিক বাঁচা মরার কাহিনি প্রচলিত ছিলো, মাটির মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গল্প চালু ছিলো এবং মেয়েদের উপর চন্দ্র-দেবের ঐশিক প্রভাব জারি ছিলো; তাদের এ অমোঘ বিশ্বাসের কূল-কিনারা করা সম্ভব নয় বা এসব কাহিনী বিশ্বাস করাও ঠিক নয়, যদি-না আমরা এসব প্রাগৈতিহাসিক স্থাপনা বা তাদের উৎসের সত্যতা যাচাই করতে পারি। হয়তোবা, পাথরগুলো এভাবে বসানো হয়েছে জ্যোতি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এবং শ্লাইডারের মতে, এখান থেকে বর্ষ পঞ্জিকার একটি আভাস হয়তো পাওয়া যেতো। কিছুটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নব প্রস্তর যুগের মানুষদের ছিলো, কারণ তখনকার কিছু খুলিতে ছিদ্র করার চিহ্ন রয়েছে এবং কিছু কঙ্কালের হাড়ে ভাঙাকে জোড়া দেবার চিহ্ন দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অর্জনগুলো সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নয়; একপক্ষে বলা যায়, আমাদের কল্পনা অনেক সময় তথ্য প্রমাণকে ছাপিয়ে যায়, আর অপরপক্ষে, সময়ের কবলে পড়ে অনেক চিহ্নই মুছে গেছে যা আদিম ও আধুনিকের তফাৎটুকু আরো কিছুটা সরু করতে পারতো। তারপরও, যেটুকু তথ্য প্রমাণ টিকে আছে, তাতে প্রস্তর যুগের অগ্রসরতা আমাদেরকে কম মুগ্ধ করে না : আদি প্রস্তর যুগের হাতিয়ার, আগুন ও চিত্রকলা, নব প্রস্তর যুগের চাষাবাদ, পশুপালন, বুনন, মৃৎশিল্প, স্থাপনা, যাতায়াত ও চিকিৎসা, আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রকৃতির উপর দৃষ্টান্তমূলক আধিপত্য। সকল ভিত্তিই স্থাপিত হয়ে গিয়েছিলো; ঐতিহাসিক সভ্যতার জন্য সবকিছুই প্রস্তুত করা হয়েছিলো শুধু (সম্ভবত) ধাতু, রাষ্ট্র ও লেখার আবিষ্কার ছাড়া। মানুষ এখন আর চিন্তা চেতনা ও অর্জনগুলো লিপিবদ্ধ করার একটি মাধ্যম খুঁজে পেলেই তা প্রজন্মান্তরে দৃঢ়তার সাথে ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং সভ্যতাও শুরু হতে পারবে।

৩. ইতিহাসে পদার্পণ

১. ধাতুর আগমন

তামা — ব্রোঞ্জ (তামা ও টিন) — লোহা

ধাতুর ব্যবহার কখন মানুষের হাতে এসেছে, এবং কীভাবে? আমরা আবারো এর কিছুই জানি না; আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি যে, এটি নিশ্চয়ই দৈবযোগে প্রাপ্ত এবং আগেকার ধ্বংসাবশেষে এর অনুপস্থিতির কারণে মনে করি যে, নব প্রস্তর যুগের শেষের দিকে এর সূচনা হয়েছে। এটি যদি ৬০০০ বছর আগের ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে একটি তুলনামূলক চিত্র দাঁড়ায় এমন— ধাতুর যুগ (এবং লেখা ও সভ্যতা) শুরু হয়েছে ৬০০০ বছর আগে, যেখানে প্রস্তর যুগ টিকে ছিলো ৪০,০০০ বছর এবং মানব যুগ শুরু হয়েছে ১০ লক্ষ বছর আগে (যদি পিকিং ম্যানকে আদি প্লাইস্টোমিন সময়কার বলে ধরে নিই)। আমাদের ইতিহাস বিষয়টি এতটাই নবীন!

মানুষ যে ধাতুটি সবার আগে ব্যবহার করা শুরু করেছে, তা হচ্ছে তামা। ৮০০০ বছর আগে সুইজারল্যান্ডের রুবেনহসেনের হ্রদবাসীকে এটি ব্যবাহর করতে দেখা যায়; ৬৫০০ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক মেসোপটেমিয়াতে; ৬০০০ বছর আগে মিশরের বাদারিয়ান কবরে; ৫১০০ বছর আগে ঊর নগরীর ধ্বংসাবশেষে; এবং বয়স না জানা উত্তর আমেরিকার মাউন্ড-বিল্ডারস্‌দের স্তম্ভগুলোতে। ধাতুর আবিষ্কার দিয়ে ধাতুর যুগ শুরু হয়নি, এটি শুরু হয়েছে আগুন পুড়িয়ে আকরিক থেকে আলাদা করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মধ্য দিয়ে। ধাতুবিদ্‌রা মনে করেন, আকরিক থেকে তামার আলাদা হয়ে পড়াটা ছিলো এক দৈব-ঘটনা যা আগুনের চারপাশে থাকা পাথর গলে আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসতে পারে; এরকম ঘটনা আমাদের জীবদ্দশাতেও অনেকবার ঘটেছে। সম্ভবত: এরকম ইঙ্গিতের বারংবার পুনাবৃত্তিতে পাথরের অসন্তুষ্ট আদিম মানুষ অবশেষে

নমনীয় এবং দীর্ঘস্থায়ী এ মাধ্যমটির কথা ভাবতে শিখেছে। এমনও হতে পারে যে, প্রকৃতিতে কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচা ধাতু দিয়েই এর ব্যবহার শুরু হয়েছে — প্রকৃতিতে ধাতু কখনো কখনো প্রায় খাদহীন, বেশিরভাগ সময় মিশ্রণ হিসেবে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে অনেক পরে— আনুমানিক ৫৫০০ বছর পূর্বে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে— মানুষ আকরিক গলিয়ে ধাতু বের করতে শিখেছে। তারপর, ৩৫০০ বছর আগে (যেমনটি আমরা মিশরের রেখ্-মারার কবরে পাওয়া রিলিফে দেখতে পাই) ধাতুকে ছাঁচে ঢালা হয়ছে : গলিত তামাকে কাঁদা বা মাটির পাত্রে ঢেলে তাকে ঠান্ডা করে যে কোন আকার দেয়া যেতো, তীরের ফলা বা কুড়াল বানানো যেতো। একবার উদ্ভাবনের পর এ পদ্ধতি বিভিন্নরকম ধাতুর উপর প্রয়োগ হতে লাগলো এবং তা মানুষকে সেসব বলিষ্ঠ যন্ত্রপাতির যোগান দিলো যার সাহায্যে সে তার শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলোর প্রতিষ্ঠা করলো, এবং মনুষকে পৃথিবী, জল ও বায়ুর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিলো। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তামায় সমৃদ্ধ বলেই হয়তো সে অঞ্চলে প্রভাবশালী সব সভ্যতা, যেমন— ইলাম, মেসোপটেমিয়া ও মিশরের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এবং সকল দিকে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বকে রূপান্তরিত করে ফেলেছে।

কিন্তু তামা বেশ নরম, কিছু কাজের জন্য ভয়ানক উপযোগী (তামা ছাড়া বৈদ্যুতিক যুগের কি যে হতো!), কিন্তু শান্তিরক্ষা বা যুদ্ধের মত ভারী কাজের জন্য বেশি নরম; একে শক্ত করবার জন্য খাদ মেশানোর দরকার ছিলো। প্রকৃতি যদিও অনেকবার পরামর্শ দিয়েছিলো, অনেক সময় তামার সাথে টিন বা দস্তার সংকরও পাওয়া যেতো— প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ব্রোঞ্জ বা পিতল কিন্তু মানুষ তার পরবর্তী পদক্ষেপটি নিতে অযথাই বহু শতাব্দী সময় নষ্ট করেছে— এক ধাতুর সাথে অন্য ধাতুর উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিশ্রণ ঘটাতে, যাতে তার প্রয়োজন মাফিক ধাতুর সৃষ্ট হয়। এ আবিষ্কার অন্তত ৫০০০ বছর পুরোনো, কারণ ব্রোঞ্জের দেখা পাওয়া যায় ৫০০০ বছর আগে ক্রেটান ধ্বংসাবশেষে, ৪৮০০ বছর আগে মিশরীয় ধ্বংসাবশেষে এবং ৪০০০ বছর আগে ট্রয়ের দ্বিতীয় নগরীতে। কাজেই 'ব্রোঞ্জের যুগ' পরিভাষাটির দ্বারা সুস্পষ্ট করে কোন যুগ নির্ধারণ করা যাবে না, কারণ ধাতু বিভিন্ন গোত্রের হাতে এসেছে বিভিন্ন সময়ে; কাজেই এরকম যুগের নামে সময়কালের কোন গুরুত্ব নেই; উপরন্তু, অনেক সংস্কৃতি, যেমন— ফিনল্যান্ড, উত্তর রাশিয়া, পলিনেশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান— ব্রোঞ্জের যুগ বাদ দিয়ে পাথর থেকে সরাসরি লোহায় চলে গেছে; এবং যেসব সংস্কৃতি ব্রোঞ্জ ব্যবহার করেছে তাদের মধ্যেও দেখা যায়, এর ভূমিকা ছিলো গৌণ কারণ শুধুমাত্র পুরোহিত, উচ্চ সমাজ এবং রাজারাই ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতো, সাধারণ জনগণ পাথরেই সন্তুষ্ট ছিলো। 'আদি প্রস্তর যুগ' এবং 'নব প্রস্তর যুগ' পরিভাষাগুলোও আপেক্ষিক, এবং তারা একটি সময়কালের চে' একটি সংস্কৃতির অবস্থাকেই বেশি বোঝায়; এখনো অনেক আদিম গোত্র (যেমন, এস্কিমো ও পলিনেশীয় দ্বীপবাসীরা) প্রস্তর যুগে পড়ে আছে, লোহাকে চেনে

পর্যটকের হাত ধরে আসা এক বিলাসী বস্তু হিসেবে। ১৭৭৮ সালে ক্যাপ্টেন কুক যখন নিউজিল্যান্ডে অবতরণ করেছিলো, সে একটি ছয় পেনির পেরেকের পরিবর্তে কয়েকটি শূকর কিনেছিলো; আরেকটি পর্যটক ডগ্ দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখেছে যে, "বিশেষত: লোহার জন্য এত লোলুপ্ত, যেন জাহাজের সবগুলো পেরেক খুলে নিয়ে যাবে।"

ব্রোঞ্জ শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু এর জন্য যে তামা ও টিনের প্রয়োজন, তা পরিমাণে ও খনিগত অবস্থানে সেরকম সহজলভ্য ছিলো না যে তা শিল্প বা যুদ্ধের জন্য সেরা বস্তু হতে পারে। আগে হোক্ পরে হোক্, লোহার আগমন ভবিতব্য ছিলো; এটি ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী ঘটনা যে, এতটা সহজলভ্য হবার পরও তামা বা ব্রোঞ্জের সময়কালে লোহার আবির্ভাব হয়নি। মাউন্ড-বিল্ডারদের মত অন্যান্য আদিমেরাও হয়তো প্রথমে ভূপাতিত উল্কার লোহা দিয়ে অস্ত্র বানিয়েছিলো, যা এখনো সমকালীন আদিমেরা করে থাকে; তারার তারা আকরিকের আগুনে গলিয়ে লোহা বের করেছে এবং তাকে পিটিয়ে কাঁচা লোহার উদ্ভাবন করেছে। মিশরে রাজশাসন শুরু হবার আগেকার কবরে উল্কাজাত লোহার দেখা পাওয়া যায়; ব্যাবিলনের পুঁথিপত্রে উল্লেখ আছে যে, হামুরাবি'র রাজধানীতে (খ্রি.পূ. ২১০০ সাল) লোহা ছিলো দামি দুর্লভ এক বস্তু। উত্তর রেডেশিয়াতে লোহার এক ঢালাইখানা পাওয়া গেছে যা আনুমানিক ৪০০০ বছর পুরোনো; দ: আফ্রিকার খনিশিল্প কোন আধুনিক উদ্ভাবন নয়। সন্ধান-পাওয়া সবচে' পুরোনো কাঁচা লোহা হচ্ছে প্যালেস্টাইনের গেরারে প্রাপ্ত কিছু ছুরি, যাদের বয়স পেট্রির মতে ৩৩০০ বছর। মিশরে লোহা এসেছে তার একশ' বছর পরে গ্রেট্ রেমেসিস—২ (তথাকথিত ফেরাউন)-এর শাসনামলে; এইজিয়ান অঞ্চলে পৌঁছেছে আরো একশ' বছর পরে। পশ্চিম ইউরোপে এর প্রথম সাক্ষাৎ পাই অস্ট্রিয়ার হাল্স্টাট্ নগরীতে, খ্রি.পূ. ২০০ সালে, আর সুইজারল্যান্ডের লা টিন ইন্ডাস্ট্রিতে খ্রি.পূ. ৫০০ সালে। এটি ভারতে পৌঁছেছে আলেকজান্ডারের হাতে, আমেরিকায় কলম্বাসের হাতে, আর ওশানিয়াতে কুকের হাতে। এভাবে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীর অন্তরে, লোহা পুরো পৃথিবীকে ধীরে ধীরে জয় করে নিয়েছে।

২. লেখা

মৃৎশিল্প ভিত্তিক সম্ভাব্য উৎস — "ভূমধ্যসাগরীয় চিহ্নমালা"—হায়রোগ্লিফিক্স্ — বর্ণমালা

কিন্তু লেখার আবিষ্কারই হচ্ছে সভ্যতার পথে নেয়া পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। নব প্রস্তর যুগের মৃৎশিল্পের কোন কোন নমুনায় কিছু রঙিন দাগ দেখা যায়, যাকে বেশ কিছু ছাত্র মৃৎশিল্পীদের স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু এর মধ্যে অনেক 'কিন্তু'-র অবকাশ আছে; যদি ও এটি অবশ্যই সম্ভব যে, বৃহদ্‌বিচারে মনের নির্দিষ্ট ভাবকে নকশায় প্রকাশ করাকেই যদি

লেখা ধরি তাহলে, নির্দিষ্ট মৃৎকর্মকে চেনার জন্য, তাকে কিছুটা শোভা দানের জন্য কাদা নরম থাকতেই তার গায়ে নখ বা আঙুলের সাহায্যে কিছু দাগ বসানোকেও লেখা বলা যায়, এবং এভাবে লেখার সূত্রপাত হতেই পারে। ইলামের মুসা নগরীতে প্রথমদিককার সুমেরীয় মৃৎকর্মের এক হায়রোগ্লিফের মধ্যে পাখির পিক্‌টোগ্রাফ বা চিত্রাক্ষর বোঝানো হয়েছে পাখি সদৃশ কিছু আঁকিবুকি নিয়ে; এবং মুসা বা সুমেরীয়রা শস্যপাত্রের জন্য যে সনাক্তকারী চিহ্ন ব্যবহার করতো, সেখান থেকেই শস্যের সর্বপ্রথম চিত্রাক্ষরটি অবিকল গ্রহণ করা হয়েছে। সুমেরিয়ার প্রথম রেখা-ভিত্তিক হস্তলিপি, যার আবির্ভাব হয় খ্রি.পূ. ৩৬০০ সালের, সেটি দৃশ্যত লোয়ার মেসোপটেমিয়া ও ইলামের আদিম মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত ছবি ও চিহ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ। চিত্রকলা বা ভাস্কর্যের মত, লেখার উৎসও হয়তো মৃৎশিল্প; এটি আবির্ভাব হয়েছে কাদার উপর নকশা আঁকা, ড্রয়িং বা এচিং-এর মাধ্যমে; এবং সেই কাদা, যা কুমোরকে দিয়েছে পাত্র, ভাস্করকে দিয়েছে মূর্তি, স্থপতিকে ইট নবিশ লেখককে সে দিয়েছে লেখার জন্য স্লেট্। মেসোপটেমিয়ার এই কীলক্ আকারের লেখা (বা কিউনিফরম্ রাইটিং) ক্রমান্বয়ে বোধগম্য ও যৌক্তিক এক উন্নতির পথে এগিয়েছে।

ফ্লিন্ডারস্ পেট্রি'র আবিস্কৃত নকশাচিহ্নগুলোই সবচে' পুরোনো, যা তিনি মিশর, স্পেন এবং নিকট-পুবের প্রাগৈতিহাসিক কবরগুলোতে পাওয়া পাথরের জিনিসপত্র ও মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলোর মধ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ উদারতায়, এদের বয়স তিনি নির্ধারণ করেছেন সাত হাজার বছর। এই 'ভূমধ্যসাগরীয় চিহ্নমালা' সংখ্যায় তিনশ'র মত; এদের বেশির ভাগই সকল অঞ্চলে একই রকম হতে দেখা যায়, যা খ্রি.পূ. ৫০০০ সালেও ভূমধ্যসাগরের এপার-ওপারের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনের ইঙ্গিত দেয়। এগুলো ঠিক চিত্র নয়, বাণিজ্যিক কর্মে ব্যবহৃত চিহ্ন উৎপাদনকারী, পরিমাণ, অঞ্চল বা অন্যান্য বাণিজ্যিক স্মারক; ব্যবসায়িক বুর্জুয়ারা এই ভেবে শান্তি পেতে পারে যে, সাহিত্যের জন্ম হয়েছে বিল্ আর লেডিং (বা সম্পদের মালিকানা পত্রে)। চিহ্নগুলোকে বর্ণ বলা যাবে না। কারণ একেকটি চিহ্ন একটি ভাব বা পুরো শব্দের নির্দেশ করতো। কিন্তু এদের মধ্যে অনেকগুলোই চমৎকারভাবে 'ফিনিশীয়' বর্ণের সাথে মিলে যায়। পেট্রি সমাপ্তি টেনেছে এভাবে যে, "সেসময় বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য ক্রমান্বয়ে বিরাট এক চিহ্ন ভাণ্ডারের আগমন ঘটেছিলো। এগুলো বাণিজ্যিক কারণে অদল-বদল হয়েছে এবং এক ভূখণ্ড থেকে আরেক ভূখন্ডে বিস্তার লাভ করেছে, ... যতদিনে কয়েক ডজন চিহ্নর বিজয় প্রতিষ্ঠা না হয়, এবং এরা একদল বাণিজ্য-সংঘের সাধারণ সম্পাদে পরিণত হয় এবং বাকিগুলোর আঞ্চলিক অস্তিত্ব ক্রমান্বয়ে নির্বাসনের একাকিত্বে হারিয়ে যায়।" এই চিহ্নমালাই বর্ণমালার উৎস, এরকম চমৎকার তত্ত্বটির একমাত্র দাবিদার হচ্ছেন প্রফেসর পেট্রি।

তবে একরম বাণিজ্যিক চিহ্নের ক্রমবিকাশ যেদিকেই যাক্, এদের পাশাপাশি আরেক ধরনের লেখাও জন্ম নিচ্ছিল, যা চিত্রকলা ও নকশা ভিত্তিক, যা চিত্রের সাহায্যে ভাবের প্রকাশ করে। সুপিরিয় হ্রদের পাশে এক পাথরে আঁকা কিছু ছবিতে ইন্ডিয়ানরা গর্বের সাথে তাদের বিজয় গাঁথা লিখে গেছে, অথবা তাদের প্রতিবেশীদের জানাবার জন্য লিখেছে যে, কীভাবে তারা এই শক্তিশালী হ্রদ পাড়ি দিয়েছে। নব প্রস্তর যুগের শেষের দিকে পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে এমন চিত্র-নির্ভর লেখালেখির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খ্রি.পূ. ৩৬০০ সালের মধ্যে নিশ্চিৎরূপে, অথবা হয়তো তারও আগে, ইলাম, সুমেরিয়া ও মিশরে এক ধরনের ভাব চিত্রের সূচনা হয় যার নাম 'হায়রোগ্লিফিক্স্', যেহেতু পুরোহিতেরাই এর ব্যবহার বেশি করতো। আনুমানিক খ্রি.পূ. ২৫০০ সালে অনুরূপ এক ব্যবস্থার চল্ আসে ক্রিটে। আমরা দেখতে পাই ভাব-প্রকাশক এই হায়রোগ্লিফ্, ব্যবহারের ত্রুটির কারণে, ধীরে ধীরে সিলেবলে (শব্দের ছান্দস্, ক্ষুদ্রতম একক) বিন্যস্ত ও বিভক্ত হয়ে পড়ে— কয়েকটি চিহ্নের সংযোগে একটি সিলেবল্‌কে বোঝানো; এবং শেষ পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে সিলেবল্ নয়, তার প্রারম্ভিক ধ্বনিকে প্রকাশ করা হতো এবং সেখান থেকেই বর্ণের আগমন। বর্ণমালায় লেখার প্রচলন হয়েছে মিশরে খ্রি.পূ. ৩০০ সালে এবং ক্রিটে খ্রি.পূ. ১৬০০ সালের দিকে। ফিনিশীয়রা বর্ণমালার উদ্ভাবন করেনি, তারা প্রচারণার কাজটুকু করেছে; মিশর এবং ক্রিট্ থেকে নিয়ে তারা এটিকে পিস্‌মিল্, টায়র্, সিডন্ ও বিব্লসে আদমানি করেছে এবং সকল ভূমধ্যসাগরীয় শহরগুলোতে রপ্তানি করেছে; তারা ছিলো বর্ণমালার বিতরণকারী। হোমারের সময়কালে গ্রিকরা ফিনিশীয় বর্ণমালার অথবা তার আরামাদয়িক সংস্করণের— অধিকার নিয়ে নিচ্ছিল এবং প্রথম দুটি বর্ণের সেমেটিক নামে ডাকতো— আল্‌ফা, বিটা; হিব্রু ভাষায় আলেফ, বেথ্।

লেখা সম্ভবত অর্থনীতির হাতিয়ার বা অর্থনীতির সৃষ্টি; এখানেও সংস্কৃতির দেখতে পাওয়া উচিৎ, সে বাণিজ্যের কছে কতটা ঋণী। পুরোহিতেরা যখন তাদের জাদুকরী মন্ত্র, চিকিৎসা-বিষয়ক বা অনুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলো লিখে রাখার জন্য চিত্র-নির্ভর এক লেখার উদ্ভব করছিলো, ইহজগৎ ঘরানার লোকজন, যাদের সাথে আগের পক্ষের সংঘাত সাধারণতঃ লেগেই থাকে, তারা এক মুহূর্তের জন্য এদের সাথে মিশে গিয়েছিলো এবং কথা বলতে শেখার পর ইতিহাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম উদ্ভাবনটি করতে যাচ্ছিল। লেখার উদ্ভাবনের কারণেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ হয়, তার প্রচার সম্ভব হয়, বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি জড় হতে থাকে, সাহিত্যকর্মের সমৃদ্ধি ঘটে, বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হবার পরও একক রাষ্ট্রের একভাষী নাগরিকদের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এভাবেই সভ্যতার আগমন নিশ্চিৎ হয়। সর্বদা পিছোতে থাকা সেই বিন্দুটিতে ইতিহাসের সূচনা হয় যেখানে প্রথম লেখার আবির্ভাব হয়।

Is the necessary to write something about state, kingdom or empire?

৩. হারানো সভ্যতা

পলিনেশিয়া — "আটলান্টিস্"

সভ্য জাতিদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের বোঝা উচিৎ যে, আমরা যেসব সংস্কৃতিকে নমুনা হিসেবে নির্বাচিত করি তার ইতিহাসের খুব সামান্যই আরোচনায় উঠে আসে এবং, সম্ভবত: পৃথিবীর বুকে যত শত সভ্যতার অদ্যোবধি এসেছে, তার খুব ক্ষুদ্র অংশের সম্বন্ধেই আমরা জানতে পেরেছি। যেসব বৃহৎ ও সংস্কৃতিবান সভ্যতা শুধুমাত্র প্রবাদ বা লোককাহিনিরূপে ইতিহাসের সাথে জুড়ে আছে, তারা হয়তো কোন চিহ্ন রেখে যাবার আগেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদেরকে উপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না; ক্রিট্, সুমেরিয়া এবং ইউকাতানের মত সভ্যতাগুলোর ইদানীংকালে আবিস্কৃত হওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে যে, অন্যান্য কাহিনী বা উপাখ্যানগুলো সত্যি হবার সম্ভাবনা আছে।

প্রশান্ত মহাসাগর হারিয়ে যাওয়া এসব সভ্যতার অন্তত একটির ধ্বংসাবশেষ ধারণ করে। ইস্টার দ্বীপের দানবীয় মূর্তিগুলো, বীর্যধারী যোদ্ধা এবং শক্তিশালী জাতিভিত্তিক পলিনেশীয় ঐতিহ্য যা সামোয়া ও তাহিতিকে একসময় অভিজাত করে তুলেছিলো, বর্তমান অধিবাসীদের শৈল্পিক দক্ষতা বা কাব্যিক সূক্ষ্মতাই ইঙ্গিত বহন করে যে, এক বিরাট গৌরব-মহিমার প্রস্থান হয়েছে, এরা সভ্যতার উন্নীত না হয়ে বরং এক উচ্চাসন থেকে নেমে পড়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের দৈর্ঘ্য বরাবর, আইস্ল্যান্ড থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সাগরের তলদেশ বেশ উঁচু যা প্লেটো বর্ণিত এক সভ্যতার সম্ভাবনার পক্ষে মত দেয়। পানির নিচে এ সামুদ্রিক মালভূমিটির গভীরতা ২—৩ কিলোমিটার, যা মধ্য আটলান্টিক বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার পূর্ব-পশ্চিম উভয় পার্শ্বের গভীরতা ৫—৬ কি.মি.। কথিত আছে, এ উন্নত সভ্যতাটি একসময় ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে এক দ্বীপ মহাদেশে বাস করতো; এবং এক আকস্মিক ভূমিকম্পে এ মহাদেশটি সাগরে তলিয়ে গেছে। ট্রয় নগরী খুঁজে পাওয়া শ্লিমান্ বিশ্বাস করে যে, ইউরোপ এবং দ: আমেরিকার ইউকাতান সভ্যতার মধ্যে সংযোগরূপে কাজ করেছে আটলান্টিস এবং এখান থেকেই মিশরীয় সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে। হয়তো আমেরিকাই ছিলো আটলান্টিস্*। হয়তো মায়ার আগেকার কোন সভ্যতা নব প্রস্তর যুগে আফ্রিকা ও ইউরোপের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলো। হতে পারে, সকল আবিষ্কারই পুনঃ আবিষ্কার।

তেমনটি হওয়া খুবই সম্ভব যেমনটি অ্যারিস্টেটল্ ভাবতো যে, বহু সভ্যতা এসেছে, অনেক বড় বড় উদ্ভাবন ও জৌলুসের প্রতিষ্ঠা করেছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং আমাদের স্মৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে। ইতিহাস হচ্ছে, বেকনের মতে, ডুবে যাওয়া জাহাজের ভেসে আসা তক্তার মত; যেটুকু উদ্ধার হয় তার চে' অনেক বেশি

* ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যবর্তী দ্বীপ মহাদেশে বলতে যা বোঝায়।

হারিয়ে যায়। আমরা নিজেদের এই ভেবে সান্ত্বনা দিই যে, প্রকৃতিস্থ থাকবার জন্যে অভিজ্ঞতার বেশিরভাগই যেহেতু ভুলে থাকতে হয়, একটি জাতিরও সে কারণে তার অর্জনের উজ্জ্বলতম অংশগুলো— নাকি ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করা গুলো?— সংরক্ষিত থাকে। যদি আমাদের জাতিগত সংস্কৃতি যা আছে তা পরিমাণে এর এক-দশমাংশও হতো, সেটিও কোন একক জাতির পক্ষে সর্বান্তে ধারণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাস বিচারে সে কথাই প্রমাণ হয়।

৪. সভ্যতার সূতিকাগারসমূহ

মধ্য এশিয়া — আনাউ — ছড়িয়ে পড়া রেখাসমূহ

এটি মোটেও বেমানান নয় যে, এ বইটির উত্তর না জানা সমস্ত প্রশ্নের শেষ হওয়া উচিৎ একটি মাত্র প্রশ্নে, "সভ্যতার শুরুটি কোথায়?"-এবং এরও কোন উত্তর নেই। যদি আমরা ভূতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস করতে চাই যারা প্রাগৈতিহাসিক রহস্য নিয়ে কাজ করে যা মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যর মতই বায়বীয়, তাহলে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক অঞ্চলটি একসময় আর্দ্র ও নমনীয় তাপমাত্রার ছিলো এবং ছিলো বিশাল হ্রদ ও অজস্র ঝরনাধারায় পরিপূর্ণ। বরফ যুগের সর্বশেষ প্রত্যাগমনে সেখানকার মাটিই সর্বপ্রথম বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে, যতক্ষণ পর্যন্ত কম বৃষ্টিপাতের কারণে নগর বা জনপদ আবার সে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। শহরের পর শহর ভেঙে পড়ে এবং মানুষ পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে পানির খোঁজে ছুটতে থাকে; ব্যাক্ট্রার মত ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর সেখানে মরুভূমির ধুলাতে অর্ধেক ডুবে আছে, যা তার বাইশ মাইল পরিধির ভেতর বিশাল এক জনসাগর ধারণ করতে পারার কথা।* ১৮৬৮ সালেও ৮০,০০০ অধিবাসী পশ্চিম তুর্কিস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো কারণ তাদের বসত বালির ঝড়ে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিলো। এমন অনেকেই আছে যারা মনে করে যে, এরকম মরতে বসা অঞ্চলগুলোই সর্বপ্রথম শৃংখলা ও সরবরাহের সমাবেশ, আচার-ব্যবহার ও নীতিবোধ, আরাম-আয়েশও সংস্কৃতির মত মৌলিক বিকাশগুলোর দেখা পেয়েছিলো, যা সভ্যতার সৃষ্টি করে।

পাম্পোনি ১৯০৭ সালে দক্ষিণ তুর্কিস্তানের আনাউ শহর খনন করে কিছু মৃৎশিল্প ও অন্যান্য নমুনার সন্ধান পান যা তার মতে, ১১০০০ বছর পুরোনো (নিম্নে ৭০০০ বছর পুরোনো)। এখানে আমরা গম, বার্লি ও মিলেট চাষের প্রমাণ পাই, তামার ব্যবহার, পশু পালন এবং মৃৎশিল্পের অলংকরণের এমন সব নমুনা পাই যার মধ্যে শৈল্পিক পটভূমি ও শতাব্দী পুরোনো ঐতিহ্যের ছাপ আছে। এটি স্পষ্টত: দৃশ্যমান যে, খ্রি.পূ ৫০০০ সালে তুর্কিস্তানের সংস্কৃতি রীতিমতো পুরোনো এবং পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। হয়তো, এদেরও ছিলো ইতিহাসবিদ্ যারা সভ্যতার

* নাকি আটলান্টিস ছিলো ইউরোপ ও এশিয়ার স্থলপথের মধ্যভাগে?

উৎসের খোঁজে বৃথাই অতীতের খনন করেছে এবং ছিলো দার্শনিক যারা ধ্বংসের পথে উন্নীত এক অধঃপতিত জাতির জন্য শোক প্রকাশ করেছে।

জ্ঞান যেখানে শেষ সেখানে যদি কল্পনার আশ্রয় নেয়া যায় তাহলে ধরা যাক্, বৃষ্টিহীন আকাশ ও শুষ্কতার কবলে পড়ে বিতাড়িত একদল লোক তাদের শিল্প ও সভ্যতা সাথে নিয়ে এই কেন্দ্রটি থেকে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জাতি যদি নিজে নাও পৌঁছতে পারে, তবু তার শিল্প ঠিকই পৌঁছেছিলো— পুবে চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত; দক্ষিণে উত্তর ভারত; পশ্চিমে ইলাম, সুমেরিয়া, মিশর, এমনকি ইটালি ও স্পেন পর্যন্ত। সুসা নগরীতে (বর্তমান পার্শ্বিয়া কিংবা আগেকার ইলাম) কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে যা আনাউ-এর ধ্বংসাবশেষের সাথে এতটাই সাদৃশ্যপূর্ণ যে, খ্রি.পূ. ৪০০০ সালে সভ্যতার প্রারম্ভে সুসা ও আনাউয়ের এ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থেকে আমাদের দৃশ্য পুনর্গঠনের কল্পনাটুকু পালে বাতাস পায়। প্রাথমিক শিল্পকলা ও দ্রব্যাদির মধ্যে অনুরূপ সম্পর্কের কারণে প্রাগৈতিহাসিক মেসোপটেমিয়া ও মিশরের মধ্যেও নিবিড় এক সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়।

আমরা কোনভাবেই নিশ্চিৎ হতে পারি না কোন সংস্কৃতিটি আগে এসেছে, এর খুব একটা দরকারও নেই; তারা আদতে একই উৎসের এবং একই শ্রেণীর। যদি আমরা ইলাম ও সুমেরিয়াকে মিশরের আগে বসাই এবং তাতে পূর্বদৃষ্টান্তের সম্মানকে অবমাননা করা হয়, তবে তা ভিন্ন ধরনের কিছু আবিষ্কারের অসদিচ্ছার কারণে নয়, তা শুধু এ কারণে যে, এদের সম্বন্ধে আমরা যত গভীরে প্রবেশ করতে পারছি, আফ্রিকা বা ইউরোপের তুলনায় এই এশিয়াভিত্তিক সভ্যতাগুলোর বয়স ততই বেড়ে যাচ্ছে। নীলনদের তীরে শতাব্দীর খননের পর প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদাল যখন সুয়েজ পেরিয়ে আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের ব্লকে পড়ে, বছর বছর জমা হওয়া গবেষণাতে এটাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে, সভ্যতার ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম দৃশ্যগুলো মেসোপটেমিয়ার উর্বর অববাহিকাতেই দৃশ্যায়িত হয়েছে।

Should write something in between!

পরিশিষ্ট : সভ্যতার প্রাচ্যদেশীয় উত্তরাধিকার

সর্ববৃহৎ মহাদেশেরসমৃদ্ধ সভ্যতাগুলোর চার হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায় যে, এ সভ্যতাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পারা বা তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, কীভাবে একজন মানুষ, তার এক জীবনে, একটি জাতির পুরো ঐতিহ্য উপলব্ধি করবে বা এর মূল্য নির্ধারণ করবে, সকল বিধান, প্রথা, শিল্পকলা বা নীতিবোধের সৃষ্টি হয় সে জাতির অসংখ্য গ্রহণ-বর্জনের পরীক্ষা এবং বহু প্রজন্মের জমাকৃত অভিজ্ঞতার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে; কোন এক দার্শনিকের বুদ্ধিতে বা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের মেধায় এর গভীরতা মাপা সম্ভব নয়, এর গুরুত্ব বিচার করবার কথা বাদই দেয়া

যায়। ইউরোপ আর আমেরিকা হচ্ছে এশিয়ার বখে যাওয়া প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তান, এবং এরা আসলে কখনোই তাদের প্রাক্-গ্রিক ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকারকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। কিন্তু এখন যদি আমরা পশ্চিমে পুবের অবদানগুলো একত্রে যোগ করি, অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যেসব আবিষ্কার বা উপাদান পুবে প্রথম এসেছে তাদের লিপিবদ্ধ করি তাহলে দেখা যাবে, মনের অজান্তে আমাদের এ সভ্যতার এক রূপরেখাই আমরা টানছি।

সভ্যতার প্রথম উপাদান হচ্ছে শ্রম-চাষবাদ, শ্রমশিল্প, পরিবহন এবং ব্যবসা। মিশর এবং এশিয়াতেই আমরা চাষাবাদের শুরু হতে দেখি; প্রথম সেচ-ব্যবস্থা এবং সেসব উদ্দীপক পানীয়ের উৎপাদন হতে দেখি, যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা হয়তো টিকতোই না— বিয়ার, ওয়াইন এবং চা। মোজেসের আগমনের পূর্বেই মিশরে হস্তশিল্প, প্রযুক্তি বা প্রকৌশলবিদ্যা এমন জায়গায় পৌঁছেছিলো, যেমনটি ইউরোপে ছিলো ভল্‌টেয়ারের সময়কালে। ইটের তৈরি দালানের বয়স কম করে হলেও প্রথম সারগনের সমান; কুমোরের চাকা বা গাড়ির চাকা প্রথম এসেছে ইলামে, সুতী বস্ত্র বা কাঁচ এসেছে মিশরে, পশম বা বারুদ এসেছে চীনে। মধ্য এশিয়ার ঘোড়া গিয়ে পৌঁছেছে মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং ইউরোপে; পেরিক্লিসের সময়ের আগেই ফিনিশীয় জাহাজ পুরো আফ্রিকা ঘুরে এসেছে; চীনের কম্পাস ইউরোপে এসে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রথম ব্যবসায়িক দলিল লেখা হয় সুমেরিয়াতে, প্রথম ধারে লেনদেন, মূল্য নির্ধারণী হিসেবে প্রথম স্বর্ণ ও রুপার ব্যবহার এবং চীনেই প্রথম সোনা-রুপার পরিবর্তে কাগজের টাকার বিস্ময়কর ব্যবহার শুরু হয়।

সভ্যতার দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে শাসনব্যবস্থা— বংশ ও পরিবার, আইন ও রাষ্ট্রের দ্বারা মানুষের জীবন ও সমাজকে সংঘবদ্ধ করা ও রক্ষা করা। গ্রাম সমাজের পত্তন হয়েছে ভারতে, নগর-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সুমেরিয়া ও আসিরিয়াতে। প্রথম আদমশুমারি হয় মিশরে, আয়ের উপর কর আরোপের বুদ্ধিটিও মিশরের; এরা নামমাত্র বল প্রয়োগে বহু শতাব্দী ধরে অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলো। উর্-এনগুর এবং হামুরাবিই আইনের প্রথম বিধান লিপিবদ্ধ করে, এবং রাজকীয় সৈন্যদল এবং পদবির দ্বারা সম্রাট দারিয়ুস্ শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

সভ্যতার তৃতীয় উপাদান হচ্ছে নীতিবোধ— প্রথা, আচার-ব্যবহার, বিবেক বা বদান্যতা; এ হচ্ছে আত্মার ভেতর এক নিয়মতান্ত্রিকতার জাগরণ, যা মানুষকে ভালো মন্দের বিচার শেখায়, মনের ইচ্ছাগুলোকে শৃংখলায় বেঁধে ফেলে, যা ছাড়া সমাজ ভেঙে পড়ে ব্যক্তিতে এবং রাষ্ট্র তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারায়। শিষ্টাচারের জন্ম হয়েছে মেসোপটেমিয়া এবং পার্শিয়ার বিচারালয় থেকে; আজো সুদূর-পুবের কাছ থেকে রূঢ়, অস্থিরমতি পশ্চিম আদব-কায়দা ও গাম্ভীর্যের শিক্ষা নিতে পারে। এক গামিতার সূচনা হয়েছে মিশরে, এবং এশিয়ার বহুগামীতার সাথে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্য তাকে দীর্ঘ যুদ্ধে জড়াতে হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রথম

ডাক আসে মিশর থেকে, প্রথম ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়ায় জুড়িয়া, যা ছিলো মানবজাতির নৈতিক জাগরণের প্রথম ডাক।

সভ্যতার চতুর্থ উপাদান হচ্ছে ধর্ম— দুর্ভোগ থেকে মুক্তি, ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়ন এবং সমাজবদ্ধ কর্মকাণ্ড বা শৃংখলার প্রয়োজনে মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের পরোক্ষ ব্যবহার। ইউরোপের সবচে' সযত্নে লালিত বাহিনী বা লোকাচারগুলো এসেছে সুমেরিয়া, ব্যাবিলনীয়া ও জুড়িয়া থেকে; প্রাচ্যেই জন্মেছে সৃষ্টি ও মহাপ্লাবনের গল্প, পতন ও পুনরুত্থানের গল্প; অনেক ভূদেবীর শেষে স্বয়ং ঈশ্বরের মাতা মেরী এসেছে, হেইনের ভাষায়— "সকল কাব্যের সবচে' সুন্দর ফুল"। একেশ্বরবাদের জন্ম হয়েছে প্যালেস্টাইনে, সবচে' সুন্দর সাহিত্য এবং প্রেমের গান, এবং ইতিহাসের সবচে' একাকী, সবচে' বেশী ঘৃণিত এবং সবচে' আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্মও এখানেই।

সভ্যতার পঞ্চম উপাদান হচ্ছে বিজ্ঞান— স্বচ্ছ দৃষ্টি, অবিকল লিপিবদ্ধকরণ, পক্ষপাতহীন পরীক্ষা এবং বস্তুগত জ্ঞান পুঞ্জীভূত করা, যার দ্বারা কোন কিছু ধারণ করা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। গণিত ও জ্যামিতির আবিষ্কার এবং বর্ষপঞ্জিকার সৃষ্টি হয়েছে মিশরে; মিশরীয় পুরোহিত ও চিকিৎসকেরা ঔষধ ব্যবহার করেছে, রোগব্যাধিকে রোগব্যাধির দৃষ্টিতে দেখেছে, শল্যবিদ্যার শ'খানেক পন্থা প্রয়োগ করেছে, নৈতিক ও পেশাগত আচরণবিধি মেনে চলার হিপক্রেটিক্ শপথ নিয়েছে। ব্যাবিলনীয়রা নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ করেছে, জোডিয়াক্ বেল্ট চিহ্নিত করেছে, মাসকে চার সপ্তাহে, ঘড়িকে বারো ঘণ্টায়, ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে এবং মিনিটকে ষাট সেকেন্ডে ভাগ করেছে। আরবদের মাধ্যমে ভারত তার সাধারণ সংখ্যাগুলো এবং জাদুকরী দশমিকের ব্যবহার ছড়িয়ে দিয়েছে, ইউরোপকে শিখিয়েছে সম্মোহনের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং টিকা দেবার পদ্ধতি।

সভ্যতার ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছে দর্শন— সর্বদৃষ্টি, যা মানুষ তার নিরহংকার সময়ে উপলব্ধি করতে পারে যে, এটি শুধু অনন্ততার পক্ষেই ধারণ করা সম্ভব, তার কিছু অংশ ধারণের চেষ্টা; সকল বস্তু বা কর্মের কারণ বা উৎস এবং তার পরম তাৎপর্যকে বোঝার অর্থহীন, সাহসী প্রচেষ্টা; আদর্শ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের গুণাগুণ ও ন্যায় পরায়ণতা এবং তাদের সততা ও সৌন্দর্যের বিবেচনা করার নামই দর্শন। এর সবই প্রাচ্যে এসেছে ইউরোপের কিছুকাল পূর্বে : মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা মানব প্রকৃতি ও গন্তব্যের চিন্তা করেছে, ইহুদিরা জীবন ও মৃত্যুর উপর অমরবাণী লিখে গেছে, যখন ইউরোপ তার মুখে বর্বরতার চুনকালি মেখে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো; হিন্দুরা যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানের দর্শন নিয়ে ভাবতে বসেছে নিদেনপক্ষে পারমেনিডেস্ ও ইলিয়ার জেনোর সময়কালে; সক্রেটিসের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই উপনিষদ অধিবিদ্যার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে, আর বুদ্ধ উপস্থাপন করেছে এক আধুনিক মনস্তত্ত্বের। আর ভারত যদি দর্শনকে ধর্মের সাথে গোলাতে শুরু করে এবং যুক্তিকে আবেগ থেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, চীন তাহলে তার চিন্তাভাবনাকে দৃঢ়তার সাথে ইহজাগতিক করে রাখে এবং (আবারো সক্রেটিসের পূর্বে) এমন

এক চিন্তাবিদের জন্ম দেয়, আমাদের সমসাময়িক জীবনে নেতৃত্ব দেবার জন্য যার বিচক্ষণতায় আর কোন পরিবর্তন আনার দরকার নেই, এবং যে শ্রদ্ধাভাজন রাষ্ট্রনায়কদের আদর্শ হবার যোগ্যতা রাখে।

সভ্যতার সপ্তম উপাদান হলো বর্ণমালা—ভাষার প্রবর্তন, নবীনদের শিক্ষাদান, লেখার আবিষ্কার, কাব্য ও নাট্যকলার সৃষ্টি, উদ্দীপক প্রেমকাহিনী, অতীত স্মৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবিবরণী যার ফসল। জনামতে, সবচে' পুরোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে মিশর ও মেসোপটেমিয়া; এমনকি, সবচে' পুরোনো সরকারি বিদ্যালয়ও মিশরীয়। লেখার আবিষ্কার দৃশ্যত হয়েছে এশিয়াতে; মিশরে বর্ণমালা, কাগজ ও কালি; চীনে ছাপাখানা। প্রথম ব্যাকরণ, অভিধান এবং প্রথম পাঠাগারের কৃতিত্ব ব্যাবিলনের; এমনটিও হতে পারে যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে প্লেটোর একাডেমিরও পূর্বে। ঘটনাপঞ্জিকে ইতিহাসে রূপান্তর করেছে আসিরিয়া; মিশরীয়রা সেই ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে মহাকাব্যে, আর বিশ্বের ভাণ্ডারে সুদূর-পুবের উপহার হচ্ছে সেসব কাব্য যার মধ্যে মুহূর্তকালীন কল্পনার অন্তর্দৃষ্টির ছাপ আছে। যে নবোনিদাস্ ও অশুর বানিপালের বিজয়গাঁথা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ইদানীং উদ্ধার করেছে, তারা নিজেরাও ছিলো প্রত্নতাত্ত্বিক; যেসব পৌরাণিক কাহিনি আমাদের সন্তানদের বিমোহিত করে তাদের মধ্যে অনেকগুলোর উৎসই হচ্ছে প্রাচীন ভারত।

সভ্যতার অষ্টম উপাদান শিল্পকলা—জীবনকে বর্ণে, ছন্দে ও বিন্যাসে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করা। এর সরলতম সংস্করণ হচ্ছে, শারীরিক সাজসজ্জা—মিশর, সুমেরিয়া ও ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই চমৎকার সব বস্ত্রাদি, সুনিপুণ অলংকার এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রসাধনীর ব্যবহার। মিশরের কবরগুলো চমৎকার সব আসবাবপত্র, সাবলীল হাতে গড়া মৃৎশিল্প এবং হাতির দাঁত ও কাঠের কাজের সুনিপুণ নমুনায় ঠাসা। গ্রিকরা তাদের চিত্রকলা, খোদাই-কার্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পে দক্ষতার জন্য শুধুমাত্র ক্রিট্ বা এশিয়ার কাছেই ঋণী নয়, এতে কিছুটা হলেও তৎকালীন নীলনদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গ্রিকদের ডরিক্ স্তম্ভগুলো মিশর ও মেসোপটেমিয়ার অনুকরণে করা; আর্চ, ধনুক আকারের খিলান, গির্জার ছাদ এবং গম্বুজ আকৃতির প্রাসাদগুলোও একই ভূমির ফসল; আজকের আমেরিকার স্থাপত্য রীতিতে নিকট-পুবের প্রাচীনকালের জিগুরাতগুলোর কিছুটা অংশীদারিত্ব আছে বলে মনে হয়। চীনের চিত্রকলা ও জাপানের ছাপ্‌শিল্প উনিশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পকলার ধরন পাল্টে দিয়েছে; চীনের পোরসেলিনের জোরে ইউরোপে এখন উৎকর্ষের জোয়ার বইছে। নির্বাসিত ইহুদিদের সিনাগগের খুরগুলো থেকেই কালের আবর্তে গ্রোগরিয়ান প্রার্থনাসঙ্গীতের জন্ম।

এগুলো সভ্যতার অনেক উপাদানের কিছু অংশ, যার জন্য পুবের কাছে পশ্চিম ঋণী।

এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের পরও ক্লাসিক্যাল বা গ্রিক্ সময়কালীন বিশ্বের এর সাথে অনেক কিছু সংযোজনের বাকি ছিলো। ক্রিট্‌রা আকেরটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটায় যা মিশরের প্রায় সমসাময়িক এবং তাদের সভ্যতাটি এশিয়া, আফ্রিকা ও

গ্রিসের সংস্কৃতির মিশ্রণে সহায়তা করেছে। গ্রিকরা শিল্পকলার বিবর্ধন নয়, নিখুঁত করাতে মনোযোগ দিয়েছিলো; তারা মিশরের মূর্তিগুলোর পৌরুষের সাথে নারীর কমনীয়তা ও লাবণ্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছে এবং শিল্পকলার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের উপহার দিয়েছে। সাহিত্যের সর্বস্তরে মুক্তমনের উচ্ছ্বাস ঢেলে দিয়েছে; ইউরোপীয় বর্ণ-সম্ভারে জটিল সব মহাকাব্য, বলিষ্ঠ ট্র্যাজেডি, হাস্যোজ্জ্বল কমেডি এবং মুগ্ধকর ইতিহাসের যোগ করেছে। এরা বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত করেছে এবং ইহজাগতিক স্বাধীনতার চরমতম অবস্থা নিশ্চিৎ করেছে; মিশর ও পুব থেকে পাওয়া গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রকে যে কোন পূর্বসূরির চে' অধিক পরিমাণে এগিয়ে নিয়ে গেছে; এরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক জীবনের সূচনা করেছে এবং মানুষের প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করেছে; দর্শনকে শৃংখলাবদ্ধ করে চেতনায় প্রোথিত করেছে, জীবনের সমস্যাগুলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করেছে; . ক্ত সমাজকে কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধত্বের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে এবং আধ্যাত্মিকতামুক্ত নীতিবোধের জন্ম দিয়েছে। মানুষকে প্রজা নয়, নাগরিক ভাবার শিক্ষা দিয়েছে; নাগরিকদের অধিকার, রাজনৈতিক ও নীতিগত স্বাধীনতা নিশ্চিৎ করেছে; গণতন্ত্রের আবিষ্কার করেছে এবং একক ব্যক্তির উদ্ভাবন করেছে।

তারপর রোম এসে এই সাংস্কৃতিক প্রাচুর্যকে ধারণ করে এবং পুরো ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়, অর্ধব-সহস্রাব্দ সময় একে বর্বরোচিত হামলার হাত থেকে রক্ষা করে এবং রোমান সাহিত্য ও ল্যাটিন ভাষায় উত্তর ইউরোপে রপ্তানি করে; নারীকে ক্ষমতায় বসায় এবং এর ফলে তার মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক জাগরণ ঘটে যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি; ইউরোপকে নতুন এক বর্ষপঞ্জিকা উপহার দেয়, সামাজিক সুরক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান দেয়; নিবন্ধিত আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা করে যা শতাব্দীব্যাপী দারিদ্র্য, বিশৃংখলা ও কুসংস্কারের সময়েও পুরো মহাদেশটিকে একীভূত রাখতে সাহায্য করে।

এদিকে, গ্রিস ও রোমের বাণিজ্য ও চিন্তাভাবনার দ্বারা নিকট-পুব ও মিশরে সমৃদ্ধির পুনরাগমন ঘটে। সিডন্ ও টায়ারের জৌলুশের পুরুদ্ধার করে কার্থেজ; বিক্ষিপ্ত ইহুদিরা ট্যালমুড্ সংকলন করে; আলেকজান্দ্রিয়ায় বিজ্ঞান ও দর্শনের বিকাশ ঘটে এবং ইউরোপ ও প্রাচ্যের সংস্কৃতির মিশ্রণ থেকে এক ধর্মের জন্ম হয় যা কালক্রমে গ্রিস ও রোমের সভ্যতাকে একদিকে যেমন ধ্বংস করে, অন্যদিকে তার সংরক্ষণ ও বর্ধনও করে। ক্লাসিক্যাল বা পূর্ব-মধ্যযুগের উন্নতির জন্য সবকিছু তৈরি ছিলো : পেরিক্লিসের অধীনে তৈরি ছিলো এথেন্স, অগাস্টাসের অধীনে রোম এবং হেরডের সময়ে জেরুজালেম। মঞ্চ তৈরি করা ছিলো প্লেটো, সিজার ও যিশু অভিনীত ত্রয়ী নাটকের জন্য।

Introduction to Story of Civilization
by Will Durrant
a BANGLAYAN publication
printed by Totem Academy
ISBN 984 70085 302 4
9 789848 600191
প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল